# গন্তব্য

# স্মার্ট বাংলাদেশ

স্মার্ট সোসাইটি ← স্মার্ট গভর্নমেন্ট ← স্মার্ট ইকোনমি ← স্মার্ট সিটিজেন

দারিদ্র্যমোচন ← গড় আয়ু ← মাথাপিছু আয় ← প্রবৃদ্ধি

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

# গন্তব্য স্মার্ট বাংলাদেশ

ফিচার সংকলন-২

# গন্তব্য স্মার্ট বাংলাদেশ

তথ্য অধিদফতর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

**গন্তব্য স্মার্ট বাংলাদেশ**

**প্রকাশকাল**

জুন ২০২৩

স্বত্ব © তথ্য অধিদফতর

**প্রধান সম্পাদক**

মো. শাহেনুর মিয়া, প্রধান তথ্য অফিসার

**সম্পাদক**

পরীক্ষিৎ চৌধুরী, সিনিয়র তথ্য অফিসার

**সম্পাদনা পরিষদ**

এ এম ইমদাদুল ইসলাম, সিনিয়র তথ্য অফিসার

মুহম্মদ জসীম উদ্দিন

সেলিনা আক্তার

মো. শাহীন শিকদার

**সম্পাদনা সহকারী**

মো. জামিন মিয়া

এহতেশামুল মুলক

মো. মাহবুব সরকার

মো. রোকনুজ্জামান

মো. রেদোয়ান আল করিম

**প্রচ্ছদ**

মোমেন উদ্দীন খালেদ

**ব্যবস্থাপনা সহযোগী**

মো. শাহআলম সরকার

**গ্রাফিক্স**

মো. কামরুজ্জামান

**মুদ্রণ**

মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

**মূল্য** : ৬০০.০০ টাকা

**Gontobbo Smart Bangladesh**

Published by Press Information Department (PID)

Ministry of Information and Broadcasting

Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Phone : 55100811, 55100242,

Email : piddhaka@gmail.com

**Price** : TK. 600.00

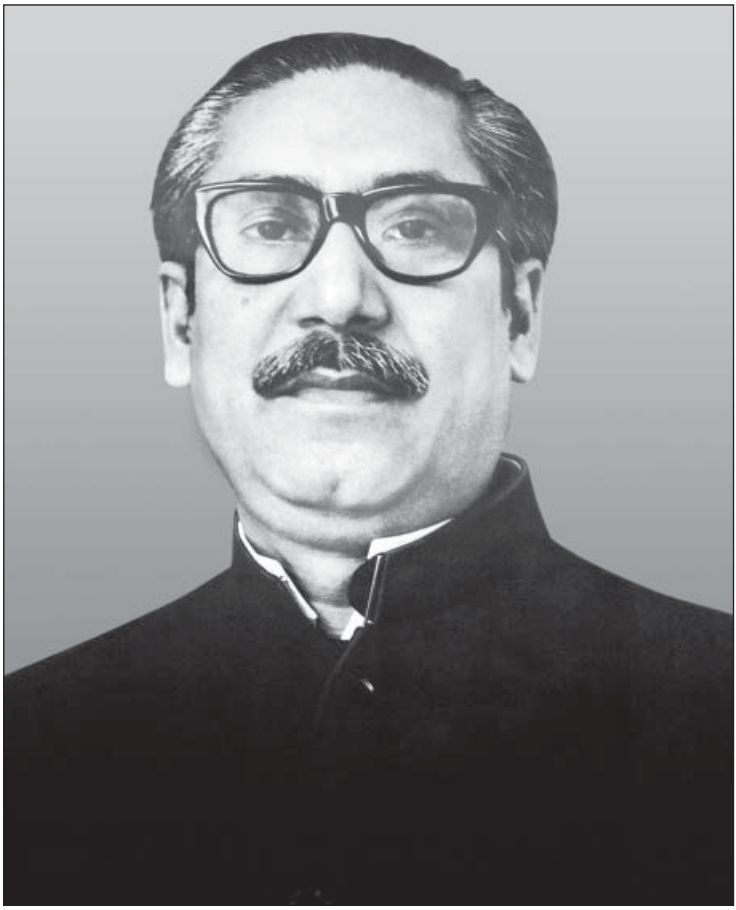

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

# ভূমিকা

২০০৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেখানো রূপকল্পের পথ ধরে আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। দেশের আর্থসামাজিক অবকাঠামো আজ মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ২০০৬-০৭ সালে যে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.০৪%, বর্তমানে তা ৭.৫%। মাথাপিছু আয় ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে ২,৮২৪ মার্কিন ডলার। অন্যান্য সূচকের প্রসঙ্গে না গিয়ে ডিজিটাল বিপ্লবের চিত্রে চোখ বুলালে দেখতে পারবো তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রপ্তানি আয় শূন্য থেকে আজ ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার। উন্নত বিশ্বের জন্য যা ছিল সহজলভ্য, সেই 'ডিজিটাল সেবা' ১৪ বছর আগেও বাংলাদেশের মানুষের কাছে ছিল পরম আরাধ্য। ইন্টারনেট প্রসারের কারণে আজ জনগণ সহজেই ৩৫৯টি 'ডিজিটাল সেবা' পাচ্ছে। সারাদেশের গ্রামে গ্রামে ৮,৮১২ টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে যেকোন ব্যক্তি এই সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারছেন। ১৪ বছর আগেও যা ছিল কল্পনার অতীত, সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ সূর্যের আলোর মতো ঝকঝকে বাস্তবতা।

বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। স্বাধীনতার ৫২ বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশের অনেক অর্জনই তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর জন্য রোলমডেল। বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ বর্তমান বাংলাদেশকে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে বিবেচনা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এবারের স্বপ্ন- 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। এখন আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। একটি জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী জাতি গড়ে তুলে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করাই এর লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জনগণের জন্য সবধরনের সেবা প্রক্রিয়াকে স্মার্ট করে তুলতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে প্রস্তুত করতে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'- এর কোনো বিকল্প নাই। আমরা মেট্রোরেল যুগে প্রবেশ করেছি। এই মেট্রোরেল বাংলাদেশের অগ্রগতির দূরন্ত ছুটে চলারই প্রতীক- যার গন্তব্য স্মার্ট বাংলাদেশ।

সাম্প্রতিককালে তথ্য অধিদফতর থেকে প্রেরিত নানান বৈচিত্রের ফিচার, যেগুলো বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মূলভাব স্মার্ট বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই। এরমধ্যে সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের চিত্র যেমন উঠে এসেছে, পাশাপাশি জনগণকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন করে 'স্মার্ট' নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসও সুস্পষ্ট। ২০২২ সালের জুলাই-ডিসেম্বরে প্রকাশিত তথ্য অধিদফতরের ফিচারগুলো থেকে বাছাই করা কিছু ফিচার নিয়ে এবারের সংকলন 'গন্তব্য স্মার্ট বাংলাদেশ'।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার মহোদয়ের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় আমাদের এ প্রয়াস আলোর মুখ দেখেছে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকল বিশিষ্ট লেখককে, যাঁরা এই উদ্যোগকে সমৃদ্ধ ও সার্থক করেছেন। সম্পাদনা পরিষদসহ সংকলনটি প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

# সূচিপত্র


জাতিসংঘে জাতির জনক ॥ ১৩
তোফায়েল আহমেদ

ভুবনজোড়া শেখ হাসিনার আসনখানি ॥ ১৯
জাফর ওয়াজেদ

কারাগারেও যখন জীবন নিরাপদ ছিল না ॥ ২২
অজয় দাশগুপ্ত

সীমাহীন মূল্যে কেনা স্বাধীনতার বিজয়, জানতে হবে, জানাতে হবে নিরন্তর ॥ ২৬
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

সুপার স্পেশালাইজ হাসপাতালের সেবা পাবে জনগণ ॥ ৩১
অধ্যাপক ডা.মো. শারফুদ্দিন আহমেদ

বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতা ॥ ৩৩
নাছিমা বেগম

বাবার হাতে পাচঁ আর মেয়ের হাতে পাঁচশ'র গল্প ॥ ৪১
ডা. সামন্ত লাল

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও গ্রাম ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ॥ ৪৪
হরিদাস ঠাকুর

সার্বজনীন পেনশন ॥ ৫০
ড. শাহাদাৎ হোসেন সিদ্দিকী

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ ॥ ৫৩
মোহাম্মাদ আশরাফ উদ্দিন

Dangerous Drug LSD ॥ ৫৬
D. Sabbir Harun

প্রতিনিয়ত কী যেন সরিয়ে ফেলা হচ্ছে ॥ ৫৯
ইলিয়াস কাঞ্চন

বাংলাদেশের ক্রীড়ার বর্তমান অবস্থাঃ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সুপারিশ ॥ ৬২
নাজমুল আবেদিন ফাহিম

জেলহত্যা দিবসের স্মৃতিকথা ॥ ৭২
তোফায়েল আহমেদ

শুভকর্মপথে ধর নির্ভয় গান ॥ ৬৬
নাসিমুন আরা হক (মিনু)

গণমাধ্যমে শেখ হাসিনা ॥ ৭৮
জাফর ওয়াজেদ

সুপার ফুড ॥ ৬৯
নাফিসা শারমিন

মাদকমুক্ত সমাজ নিশ্চিত করে উজ্জ্বল ভবিষ্যত ॥ ৮২
ড. হুমায়ুন কবির

অকালে ঝরে যাওয়া এক সম্ভাবনা ॥ ৮৫
লাকী ইনাম

মানব সম্পদ উন্নয়ন ॥ ৮৭
কাজী তামান্না ইসলাম

কাজী নজরুল যেভাবে বাংলাদেশের হলেন ॥ ৯১
ইয়াকুব আলী

স্মার্ট বাংলাদেশ ॥ ৯৭
তাসনিম রিদওয়ান

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আমাদের অর্থনীতি ॥ ১০১
জাহিদ মুরাদ

মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা, আদর্শ বাংলাদেশের প্রেরণা ॥ ১০৫
মুহা. শিপলু জামান

Shipbuilding Industry for Blue Economy ॥ ১০৭
A H M Masum Billah

১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড, উলটো রথে বাংলাদেশকে চড়িয়ে দেওয়ার নীলনকশা ॥ ১১১
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ॥ ১১৬
শামীম আযাদ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ॥ ১১৯
জাহিদ হোসেন

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জনগণকে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে ॥ ১২৩
ইমদাদ ইসলাম

খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রস্তুতি ॥ ১২৭
কামাল হোসেন

জাজ্জ্বল্যমান জ্বালানি নিরাপত্তায় পিতা থেকে তনয়া ॥ ১৩১
আফরোজা নাইচ রিমা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, আমাদের করণীয় ॥ ১৩৫
ড.এম সুয়াইব

প্রসব পরবর্তী বিষণ্নতা ও করণীয় ॥ ১৩৮
ডা. সিরাজুম মুনিরা

Noise Pollution and its Probable Impact on Public Health ॥ ১৪২
Sharmeen Jahan

গুজব যখন হাতিয়ার ॥ ১৪৭
নাসরীন মুস্তাফা

পরিবেশ ও সুরক্ষা ॥ ১৫১
মো. মাসুদুর রহমান

রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম ॥ ১৫৪
এম এ খালেক

চা-শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ॥ ১৫৮
সেলিম মাসুদ

Padma Bridge and Fulfilling Vision 2041: Pearspective Realizing SDGs ॥ ১৬১
Md. Jahangir Alam

উন্নয়নে নারী শিক্ষা ॥ ১৬৪
সেলিনা আক্তার

অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে নারী ॥ ১৬৮
ফারজানা ইয়াসমীন

বাংলাদেশে প্রসবজনিত ফিস্টুলা নির্মূলে করণীয় ॥ ১৭২
ডা. সিরাজুম মুনিরা

সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পদ্মা সেতু বিশ্বের জন্য অনুকরনীয় ॥ ১৭৬
মোতাহার হোসেন

হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনালঃ আকাশ পথে আধুনিকতার ছোঁয়া ॥ ১৭৯
মু. জসীম উদ্দিন

বদলে গেছে আবাসন খাত ॥ ১৮২
রেজাউল করিম সিদ্দিকী

অটিজম ॥ ১৮৬
সেলিনা আক্তার

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ২০২২ (COP-27) নিয়ে প্রত্যাশা ॥ ১৯১
ড. মো. সাইফুর রহমান

ভিশন-২০৪১ ॥ ১৯৫
মোস্তফা মোর্শেদ

# জাতিসংঘে জাতির জনক

## তোফায়েল আহমেদ

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ৪৮ বছর পূর্ণ হয়েছে এ বছর। এই উপলক্ষ্যে মনে পড়ছে ১৯৭৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বরের কথা। যেদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জাতিসংঘে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক অনন্য ও মহত্তর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জাতির জনকের সফরসঙ্গী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯-তম অধিবেশনে যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বছর ঘুরে দিনটি এলে অনুপম সেই স্মৃতিময় দিনগুলির কথা মানস পটে ভেসে ওঠে। আমাদের জাতীয় জীবনে এদিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতির জনকের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ইতোমধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করেছেন, এবারও ২৩ সেপ্টেম্বর ৭৭তম অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি আমাদের এই প্রগাঢ় ভালোবাসার ফলেই ১৯৫২-এ সংঘটিত মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি-বিজড়িত শহীদ দিবস হিসেবে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' ১৯৯৯ সন থেকে বিশ্বজুড়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে উদযাপিত হয়। এর শুভ উদ্বোধনটি হয়েছিল মূলত মানব জাতির সর্বোচ্চ ফোরাম জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণের মধ্য দিয়ে।

আজ থেকে ৪৮ বছর আগে ১৯৭৪-এর ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার, ঐতিহাসিক এই দিনটির সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৬-তম সদস্য রাষ্ট্ররূপে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণাটি শোনার অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'আমি সুখী হয়েছি যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘে তার ন্যায্য আসন লাভ করেছে। জাতি আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে যারা বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সেই শহীদদের কথা জাতি আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।' স্বাধীন বাংলাদেশের এই অর্জন মূলত বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্যেরই প্রতিশ্রুতি। এই শুভসন্ধিক্ষণকে সামনে রেখেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে বঙ্গবন্ধুর সফরসূচি ঠিক করা হয়। সেই হিসেবে ২৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশ বিমানের লন্ডন ফ্লাইটে আমরা ঢাকা ত্যাগ করি। সর্বমোট ২৪ সদস্যের সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. নুরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. নূরুল ইসলাম, গ্যাস ও ওয়েল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ড. হাবিবুর রহমান,

এম আর সিদ্দিকী এমপি, আসাদুজ্জামান খান এমপি, দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং আরও অনেকে। লন্ডনে যাত্রাবিরতির পর ঐদিন রাতে প্যান অ্যামের নিউইয়র্ক ফ্লাইটে স্থানীয় সময় রাত সাড়ে আটটায় আমরা কেনেডি বিমান বন্দরে অবতরণ করি। বিমান বন্দর থেকে আমাদের হোটেল 'ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়াচ্ছ' নিয়ে যাওয়া হয়।

'ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়াচ্ছ' বঙ্গবন্ধুর হোটেল কক্ষে দর্শণার্থীদের আগমন ছিল চোখে পড়ার মতো। অধিবেশনে আগত প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ লোকজনও বঙ্গবন্ধুর দর্শনপ্রার্থী ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার হোটেল কক্ষে এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর আসে প্রতীক্ষিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সদ্য সদস্যপদপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা। বক্তৃতা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর নাম যখন ঘোষিত হয়, তখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মুহুর্মুহু করতালিতে চারদিক মুখরিত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে চতুর্দিকে তাকিয়ে পরিষদে সমাগত বিশ্বনেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সর্বোচ্চ সংস্থা জাতিসংঘকে 'মানব জাতির মহান পার্লামেন্ট' উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃ তা করেন। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'শান্তি ও ন্যায়ের জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিমূর্ত হয়ে উঠবে এমন এক নয়া বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ আজ পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'জাতিসংঘের সনদে যেসব মহান আদর্শ উৎকীর্ণ রয়েছে তারই জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে।' সেদিন সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন, আলজেরিয়ার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল আজিজ বুতাফ্লিকা। তাঁকে আমি ইতোপূর্বেই কাছ থেকে দেখেছিলাম। বঙ্গবন্ধুকে ওআইসি সম্মেলনে নেওয়ার জন্য '৭৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারি আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারে বুমেদিনের বিশেষ বিমান নিয়ে যে পাঁচজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। বক্তা হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণার সাথে সাথে পরিষদের সভাপতি স্বীয় আসন থেকে উঠে এসে বঙ্গবন্ধুকে মঞ্চে তুলে নিয়েছিলেন। পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৪৫ মিনিট বক্তৃতার শেষে সভাপতি নিজেই যখন দাঁড়িয়ে করতালি দিচ্ছেন, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ বিপুলভাবে করতালি দিয়ে আলিঙ্গন করে অভিনন্দিত করেছেন বঙ্গবন্ধুকে। অভাবনীয় সেই দৃশ্য। নিজ চোখে না দেখলে লিখে বোঝানো সম্ভবপর নয়। বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির হিমালয়সম উচ্চতায় আসীন ছিলেন তিনি। আমার মনে পড়ে, অধিবেশনে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ আমাদের কাছে এসে বলেছিলেন, 'সত্যিই তোমরা গর্বিত জাতি। তোমরা এমন এক নেতার জন্ম

দিয়েছো, যিনি শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, এশিয়ার নেতা নন; তিনি সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা।'

বঙ্গবন্ধুকে প্রথমেই অনুরোধ করা হয়েছিল, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি ইংরেজীতে বক্তৃতা করবেন।' কিন্তু প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার প্রতি সুগভীর দরদ ও মমত্ববোধ থেকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করতে চাই।' সিদ্ধান্তটি তিনি আগেই নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলা বক্তৃতার ইংরেজি ভাষান্তর করার গুরু দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছিল জনাব ফারুক চৌধুরীর (প্রয়াত) উপর। তিনি ছিলেন লন্ডনে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার। পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন। ছুটিতে তিনি দেশে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ, 'ফারুক, তোমার ছুটি নাই। তোমাকে এখানে কাজ করতে হবে।' কাজগুলি হচ্ছে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর আসন্ন বাংলাদেশ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ; বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) সাথে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করতে প্রতিনিধি দল নিয়ে বার্মায় গমন। বার্মা থেকে ফেরার পর বঙ্গবন্ধু ফারুক চৌধুরীকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমার লন্ডন যাওয়া চলবে না। তুমি আমার সাথে নিউইয়র্ক যাবে এবং জাতিসংঘে আমি বাংলায় যে বক্তৃতাটি করবো, তাৎক্ষণিকভাবে তুমি সেই বক্তৃতার ইংরেজী ভাষান্তর করবে।' ফারুক ভাই সুন্দর ইংরেজী বলেন ও লিখেন। প্রথমে ফারুক ভাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তখন পরিস্থিতি সহজ করতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'রিহার্সাল দাও। বক্তৃতা ভাষান্তরের সময় ভাববে যেন তুমিই প্রধানমন্ত্রী। তবে, পরে কিন্তু তা ভুলে যেও।'

মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা প্রদানের বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্তটি ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক পরিণতি। সেদিন বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হয়েছে, তিনি যেন বহুযুগ ধরে এমন একটি দিনের অপেক্ষায় নিজকে প্রস্তুত করেছিলেন। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ, ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু মুজিব ছিলেন সর্বাগ্রে। তাঁর নেতৃত্বেই সেদিন অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ সফল ধর্মঘট পালন করেছিল। এরপর '৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি, মহান ভাষা আন্দোলনের ২য় পর্বে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তিনি কারাগারে বন্দি অবস্থাতেই আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে '৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, '১৯৪৮ সালে ছাত্ররাই এককভাবে বাংলা ভাষার দাবির জন্য সংগ্রাম করেছিল। এবার আমার বিশ্বাস ছিল, জনগণ এগিয়ে আসবে। কারণ জনগণ বুঝতে শুরু করেছে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করতে পারলে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল আবার পরতে হবে।' (পৃষ্ঠা-১৯৭)। সংগ্রামী এই বোধ থেকে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু মুজিব মাতৃভাষার শৃঙ্খল মোচনে অনশনরত অবস্থায় দৃপ্ত অঙ্গীকারে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করে লিখেছেন, 'ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব, হয় আমি জ্যান্ত অবস্থায়

না হয় মৃত অবস্থায় যাব। Either I will go out of the jail or my dead body will go. (পৃষ্ঠা-১৯৭)। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় এমনি মরণপণ অঙ্গীকার ছিল তাঁর। এই প্রতীজ্ঞার বলে বলবান হয়েই জাতিসংঘের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন নিজ ইচ্ছার কথা তথা মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা প্রদানের কথা।

মাতৃভাষায় বঙ্গবন্ধু মুজিবের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর অধিবেশনে আগত পাঁচটি মহাদেশের প্রতিনিধি এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুল পঠিত জাতিসংঘের 'ডেলিগেট বুলেটিন' বঙ্গবন্ধুকে 'কিংবদন্তীর নায়ক মুজিব' বলে আখ্যায়িত করে। বুলেটিনটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের প্রদত্ত মন্তব্য-প্রতিক্রিয়া পত্রস্থ করা হয়। বুলেটিনের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, 'এযাবৎ আমরা কিংবদন্তীর নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের নাম শুনেছি। এখন আমরা তাঁকে কাজের মধ্যে দেখতে পাবো।' জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্পর্কে বলা হয়, 'বক্তৃতায় ধ্বনিত হয়েছে মুজিবের মহৎকণ্ঠ।' জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম তাৎক্ষণিক এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় আমি আনন্দিত ও গর্বিত। বক্তৃতাটি ছিল সহজ, গঠনমূলক এবং অর্থবহ।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করে বুলেটিনটির ভাষ্য ছিল, 'অতীতের অনগ্রসরতা, যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রতিকূল বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভয়াবহ ফলশ্রুতি হিসেবে যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে তা বাংলাদেশের নেতা মুজিব তাঁর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।' বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস কালাহান তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব তাকে মুগ্ধ করেছে। বাস্তবিকই তিনি এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব।' বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যান এল স্লেন্ড বলেন, 'শেখ মুজিবের মহৎকণ্ঠ আমি গভীর আবেগ ভরে শুনেছি।' যুগোশ্লাভিয়ার উপ-রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. মিনিক জাতির জনকের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে, 'অতীতের অনগ্রসরতা, যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রতিকূল বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভয়াবহ ফলশ্রুতি হিসেবে যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তা বিশেষ গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে।'

এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্যা এবং বাংলাদেশে সর্বনাশা বন্যার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জাতিসংঘের মহাসচিবের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অংশগ্রহণের। কাছ থেকে দেখেছি অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞায় জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে স্বদেশের প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার পর জাতিসংঘ বাংলাদেশের ত্রাণকার্যে ৭০ লাখ ডলার সহায়তা প্রদান করেছিল এবং উপ-মহাসচিব ড. ভিক্টর উমব্রাইখটকে বাংলাদেশের সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সম্মানে নিউইয়র্ক সিটি হলে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় নিউইয়র্কের মেয়র বঙ্গবন্ধুকে

নগরীর চাবি উপহার দেন এবং বলেন, 'এই উপহার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও জনগণের প্রতি আমেরিকার জনগণের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের নিদর্শন।' প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মদান করেছেন সেইসব শহীদের আর সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পক্ষ থেকে এই চাবি গ্রহণ করে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন।' বক্তৃতায় তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকার জনগণ যেভাবে সমর্থন যুগিয়েছিলো আমি চিরকাল তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো।' নিউইর্য়ক নগরীর মেয়রের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'নিউইর্য়ক নগরীতে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত বিধায় এই নগরীর বিশ্বের সকল দেশের প্রতি এক বিশেষ দায়িত্ব আছে।'

তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত বৈঠকে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অক্টোবরের ১ তারিখ সকাল ১০টায় আমরা নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনের এন্ড্রুজ বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করি। ওয়াশিংটনে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতির অতিথিশালা ব্লেয়ার হাউজে। সকাল ১১টায় ব্লেয়ার হাউসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম স্যাক্সবি। বিকাল ৩টায় বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সাথে হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেন। প্রায় দেড় ঘন্টা স্থায়ী উভয়পক্ষের সফল বৈঠকের পর বিকাল সাড়ে ৪টায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। বিকাল ৫টায় সাক্ষাৎ করেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা। পরদিন অক্টোবরের ২ তারিখ সকালে সিনেটর কেনেডী ও জর্জ ম্যাকভার্ন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পৃথক পৃথক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। বিকাল ৪টায় বঙ্গবন্ধুর সম্মানে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির পক্ষে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর এই সফর ছিল অসংখ্য কর্মসূচিতে ঠাসা। সদ্য-স্বাধীন একটি দেশের জাতির জনকের আগমনকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্ক নগরীর বিদ্যুৎ সমাজে বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। মনে পড়ে, হোটেল 'ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া'র রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছি। আমার সামনেই উপবিষ্ট একটি পরিবার। পরিচয়ের শুরুতেই তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কোন দেশ থেকে এসেছো?' আমি বললাম, বাংলাদেশ থেকে। আমাকে অবাক করে দিয়ে তখন তাদের মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি কথাই উচ্চারিত হয়, 'ও, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব! তিনি একজন মহান নেতা।' পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি তাঁর পলিটিকাল সেক্রেটারি। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে পারলেন না। আমার মতো অল্পবয়সি একজন কী করে বিশ্বখ্যাত নেতা শেখ মুজিবের পলিটিকাল সেক্রেটারি হতে পারে! কেবল বললেন, 'আর ইউ শিওর?' আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। তখন তারা বলেছিলেন, 'আমরা মুজিবকে শ্রদ্ধা করি।' তারপরে যখন বঙ্গবন্ধুকে আমি ঘটনাটি ব্যক্ত করি তিনি বললেন, 'তাদেরকে নিয়ে এসো।' তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর

কাছে নিয়ে এলাম। অপার বিস্ময়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপে মগ্ন হলেন। শুধু বাঙালিদের কাছে নয়, বিদেশিদের কাছেও বঙ্গবন্ধু পরম শ্রদ্ধার আসনে আসীন। যে নেতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না; সব রকমের ভয়-ভীতি লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে জীবনের-যৌবনের ১৩টি বছর যিনি কারান্তরালে কাটিয়েছেন; বাঙালির জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে যিনি কোনোদিন আপোশ করেননি; ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন; বারবার বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমি আমার মানুষের অধিকার চাই'; যিনি সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত-শোষিত মানুষের মহান নেতা, তাঁকে বিশ্বনেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখবেন এটাই স্বাভাবিক। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ৪৮ বছর পূর্তির এই বছরটিতে পেছন পানে চাইলে দেখি কেবল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই নয়, সেইসাথে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন একটি দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শতাধিক দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে তথা জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ, ওআইসি এবং মানবজাতির সর্বোচ্চ পার্লামেন্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ও সদস্যপদ অর্জনে বঙ্গবন্ধুর নিরলস কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

লেখক ঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

# ভুবনজোড়া শেখ হাসিনার আসনখানি

## জাফর ওয়াজেদ

ভূগোলের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি নিজেকে প্রসারিত করেছেন বিশ্ব ভাবনায়। দেশজ ভাবনার সীমারেখা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশ্বভাবনাকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত জানাতেও পিছপা নন। বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ, হানাহানি, সংঘাত, সংঘর্ষ, অস্ত্র ও বারুদের ঝনাৎকারের বিপরীতে শান্তিবার্তা তিনি ছড়িয়ে দিতে চান। তাই দেখা যায়, স্বদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রটি সম্প্রসারণ করেছেন। তেমনি ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও থেকেছেন সচেষ্ট। বিভিন্ন সময়ে মতামত তুলে ধরে তিনি দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। এমনকি দেশে দেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলেরও তিনি ঘোর বিরোধী। বিশ্ব দরবারে এর বিরুদ্ধে নিজস্ব অবস্থানও তুলে ধরেছেন। এমনকী নিজ দেশের সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্তও করেছেন। দেখতে পাই, বিশ শতকের শেষে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তাদের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর সংহতির কথা তুলে ধরেছিলেন। যা এখনো অব্যাহত রেখেছেন। বিশ্বের সামরিক জান্তা শাসকরা যেমন পাকিস্তানে তখন ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তা শাসক পারভেজ মোশাররফ এ বক্তব্যকে ভালোভাবে নেয়নি। বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসবে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেন নি। নিজ দেশের সামরিক জান্তাদের দুঃশাসনে জনজীবন কীভাবে পদপিষ্ট হয়েছে তা শেখ হাসিনার জানা। তাই নিজ দেশের সংবিধানেও সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বলবৎ করেছেন। মূলত শান্তির সম্প্রীতিকামী শেখ হাসিনা সব সময় হিংসাকে পরিহার করে এসেছেন। প্রতিশোধের মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে নিজেকে নির্মমতার প্রতীক করে তোলেন নি কোনোভাবেই। হিংস্রতার বিপরীতে শান্তির বার্তাই তিনি প্রচার করে আসছেন। হিংসাকে জয় করতে সবসময় তিনি সচেষ্ট। মানুষকে ভালোবাসার মধ্যেই রয়েছে হিংসার মুক্তি। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'বাংলা অভিধান ছাড়া আর কোনো ভাষার অভিধানে পরশ্রীকাতর শব্দটি নেই।' আর শেখ হাসিনা চাইছেন বাংলা অভিধান থেকেও যেন মুছে যায় এই শব্দটি। কিন্তু যে সমাজ বিদ্যমান, সেখান থেকে এসব ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সহজ নয় যদিও। রবীন্দ্রানুরাগী শেখ হাসিনা কবিগুরুর মতো বিশ্বাস করেন, 'পৃথিবীজুড়ে একটি দেশ, পৃথিবীর সব মানুষ মিলে একটি জাতি-এটি মেনে নিলে পৃথিবীর সব মানুষই এক দেশের, এক জাতির মানুষ হবে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বৈরিতা থাকবে না।' অবশ্য শেখ হাসিনা এটাও জানেন, এ কথা শুনতে যতো সহজ, কাজে ততো নয়। খুব উঁচুদরের শিক্ষা-সংস্কৃতি থাকলেই তবে লোকে এ কথার মর্ম বুঝবে।

দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি 'দেশীকোত্তম গ্রহণকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে

দেশে কালে কালে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়ে তোলার জন্য নিবেদিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। রাষ্ট্রনায়কোচিত আচরণের বহি:প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে নিজেকে সমাসীন করার জন্য পর্ব সমাপন করে সম্মুখে শান্তি পারাবার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। গত দেড়দশক ধরে বিশ্বের গণমাধ্যমে তিনি একটি প্রশংসিত নাম। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর জোটেও তিনি সমাসীন হয়ে আসছেন। আর গণমাধ্যমজুড়ে তিনি একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নত হবার পথ পরিক্রমাকে সামনে তুলে ধরছেন।

শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান এবং তা বাস্তবায়নও করেন। তাই বিশ্ব গণমাধ্যম অনায়াসে তুলে আনে সেই দৃশ্যপট বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে। শুধু দেখা নয়, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পথ নির্দেশিকা এবং সঠিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যাত্রাপথ মসৃণ না হলেও, স্বপ্নপূরণের পালায় চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে উন্নতির অগ্রযাত্রায়। বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার চৌহদ্দি স্বদেশ ছাড়িয়ে এখন বিশ্বসভায় পৌঁছে গেছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক সূচকে 'উন্নয়ন বিশ্বময়' হিসেবে সত্যিকারার্থেই উত্থান ঘটেছে দেশটির। তাই দেখা যায়, উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে পরিচিত পেয়েছে বাংলাদেশ। আর দেশটির এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বিশ্ব নেতৃত্বের কাছেই শুধু নয়, দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে একজন আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে নিজস্ব ইমেজ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। হতদরিদ্র অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল দেশের পথে আজ বাংলাদেশ। বিশ্ব উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ তার অবস্থানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা অভাবনীয় মনে হয়েছে অনেক দেশি-বিদেশি গণমাধমের কাছে। অবিশ্বাসও একটি পশ্চাদপদ দেশকে উন্নয়নের কাতের শামিল করার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা যে অবস্থানে পৌঁছেছেন, বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদগুলো গত এক দশক ধরে তা অবলোকন করে আসছে। এমনকী নানা প্রতিবেদনও ছেপেছেন।

দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের কাছে শেখ হাসিনা গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছেন তার 'ক্যারিশমাটিক' ভূমিকার কারণে। মিলেছে একের পর এক সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কার। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব দায়িত্বশীল পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক ডিগ্রি পুরস্কার সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র পেয়েছে। টাইম সাময়িকীর বিবেচনার শেখ হাসিনা বিশ্বের প্রভাবশালী দশনারী নেত্রীর একজন মনোনীত হয়েছিলেন। বিশ্ব সততার জরিপে তিনি ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সততার শীর্ষের তিন নেতার একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন 'পিপলস এন্ড পলিটিক্সের গবেষণা প্রতিবেদনে। যা গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে, সেখানও দেখা গেছে বেতন ছাড়া শেখ হাসিনার সম্পদের স্থিতিতে কোনো সংযুক্তি নেই। গোপন সম্পদও নেই। দেশের ৭৮ ভাগ মানুষ মনে করেন তিনি সৎ এবং ব্যক্তিগত লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল লিখেছিল ২০১৭ সালে অংসান সুচি পশ্চিমা বিশ্বে অধিক পরিচিত একজন ব্যক্তি। তিনি শান্তিতে নোবেলও পেয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি সারাবিশ্বে নিন্দিত এবং তারই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাবিশ্বে প্রশংসিত।

রোহিঙ্গা ইস্যুর ধকল পোহাচ্ছে বাংলাদেশ। গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছিল ২০১৭ সালের আগস্টে, 'রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বিশাল মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিরল। তিনি যে একজন হৃদয়বান রাষ্ট্রনায়ক তা তিনি আগেও প্রমাণ করেছেন, এবারও প্রমাণ করলেন।' নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়-খাদ্য দিয়ে শেখ হাসিনা বিশ্বনন্দিত হয়েছেন। বিশ্বের সব গণমাধ্যম শেখ হাসিনার মানবিক ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতার জননী বা মাদার অব হিউম্যানিটি আখ্যায়িত করেছে কয়েকটি ব্রিটিশ গণমাধ্যম। ইন্ডিয়া টুডের অনলাইন প্রতিবেদনে বলা হয় 'শেখ হাসিনার হৃদয় বঙ্গোপসাগরের চাইতেও বিশাল। যেখানে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ে কার্পণ্য নেই। 'আর্থসামাজিক উন্নয়ন, গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং বিশ্বশান্তি স্থাপনে অবদান রাখার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রভাবশালী বিজনেস সাময়িকী 'ফোবর্স' অভিহিত করেছে 'লেডিস অব ঢাকা।' সংযুক্ত আরব আমিরাতের পত্রিকা খালিদ টাইমস উপাধি দিয়েছে 'প্রাচ্যের নতুন তারকা।' শ্রীলঙ্কার গার্ডিয়ান পত্রিকা উল্লেখ করেছে, 'জোয়ান অব আর্ক।' রাষ্ট্র পরিচালনায় বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়ে অনন্য ঈর্ষণীয় অবস্থান তৈরি করেছেন শেখ হাসিনা। বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বের দৃঢ়তা দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে নতুন যুগে পা রেখেছে। তার হাত ধরে কূটনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের মতো সব ক্ষেত্রেই সফলতার সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধন তৈরি করেছেন বিশ্ববাসী। অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নজরকাড়া সাফল্য হিসেবে দেখা দিয়েছে পদ্মা সেতু। অথচ এই সেতু নিয়ে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমকে সরগরম করে তুলেছিল বিশ্বব্যাংক। নানা অভিযোগে অর্থায়ন বন্ধ, মোড়লদের চোখ রাঙানি সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক সক্ষমতাকে প্রমাণ করেছে। তাঁর পরিকল্পনাতেই বাংলাদেশ এখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ডিজিটাল। পাওয়া যাচ্ছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ। প্রযুক্তিবান্ধব কৃষিনীতির কারণেই বাংলাদেশ ইতোমধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পর রপ্তানির সক্ষমতাও অর্জন করেছে। যে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে সরে গিয়েছিল, সেই বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে এসে দারিদ্র্যমোচনে বিশ্বকে বাংলাদেশ থেকে শিখতে বলেছিলেন। একুশ শতকে এসে শেখ হাসিনা দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকলেও বিশ শতকে তাঁর যাত্রাপথ মসৃণ ছিল না। গত চল্লিশ বছরের বেশি তিনি রাজনীতিতে শুধু নন, আওয়ামী লীগের সভানেত্রীও। এমন বিরল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশ্বে বিরল। দেশী গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গত এক দশকের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকাকালে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করেছেন। দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন মিডিয়ার বিকাশ ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, পিআইবি।

# কারাগারেও যখন জীবন নিরাপদ ছিল না

## অজয় দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর বাসভবনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যারা চায়নি- দেশের ভেতরে এবং বাইরে, তারাই এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজের বাসভবনে নিরাপদ ছিলেন না। অধিকতর নিরাপদ স্থান গণভবনে তাঁকে বসবাসের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু রাজি হননি। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, গণভবনে যেতে শাশুড়িও রাজি ছিলেন না। এর কারণ হিসেবে বললেন- সরকারি ভবনের আরাম-আয়েশে প্রতিপালিত হলে তাঁর ছেলেমেয়েদের মনমানসিকতা ও আচার-আচরণে অহমিকাবোধ ও উন্নাসিক ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হবে। [পৃষ্ঠা ১৭৪]

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি এখন জাদুঘর। ১৫ আগস্ট যেমন ছিল তেমনটিই রাখা হয়েছে। ওই বাসভবনে কোনো এসি মেসিন বা কার্পেট ছিল না, সোফাসেটও না। বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের রান্না ঘরে এখনও রয়েছে তাঁর ব্যবহার করা হারিকেন। সে সময় বিদ্যুৎ সংকট প্রকট ছিল। রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আর সব মানুষের সঙ্গে এ দুর্ভোগ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। তিনি সম্মতি দিলে সর্বক্ষণ বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যেত, জেনারেটরও রাখা যেত। কিন্তু তিনি হারিকেনের আলো বেছে নিয়েছেন।

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড থেকে নারী-শিশু কেউ রেহাই পাননি। ১০ বছরের শিশু রাসেলকে পিতামাতার শয়নকক্ষেই হত্যা করা হয়েছে। নববিবাহিত দুই তরুণীকে তাদের স্বামী বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ও শেখ জামালের সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে। শিশু আরিফ সেরনিয়াবাত ও সুকান্ত বাবুকেও নিজেদের বাড়িতে হত্যা করা হয়েছে। ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম কামারুজ্জামানকে। তাঁরা জেলখানাতেও নিরাপদ ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরপরই জাতীয় চার নেতা ছাড়াও আবদুস সামাদ আজাদ, কোরবান আলী, শেখ আবদুল আজিজ, জিল্লুর রহমান, আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদসহ শত শত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে বন্দি করা হয়। কিন্তু জেলাখানাতেও জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। স্বাধীনতার সরকার পরিচালিত দৈনিক বাংলায় নির্মল সেন লিখেছিলেন 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' শিরোনামের একটি উপসম্পাদকীয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বোঝানোর জন্য বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত কুচক্রী মহল এ লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অথচ ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর গভীর রাতে স্বাধীনতা

সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী মহান নেতারা এমনকি নিজ বাসভবন কিংবা কারাগারেও নিরাপদ ছিলেন না! নারী-শিশুরাও নিরাপদ থাকলেন না! এ সব হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হতে পারে সে জন্য খন্দকার মোশতাক আহমদ ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৭৫) জারি করে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। কিন্তু জিয়াউর রহমান (যাকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ২৪ আগস্ট নিয়োগ দেয় সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে। বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মিলিটারি মানে সেনাবাহিনী। আর মিলিটারি বা সেনাবাহিনীর শাসন মানে সেনাপ্রধানের নেতৃত্ব) জানত- আইনে পরিণত না হলে অধ্যাদেশের কার্যকারিতা থাকে না। তাই ১৯৭৯ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিএনপি বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে যখন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, তখন এই কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ রাখার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চালানো হয়। জিয়াউর রহমান এবং তার দল বিএনপি এ দায় কী করে এড়াবে?

'বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ' গ্রন্থে অ্যান্থনি মাসকারেনহাস লিখেছেন- বঙ্গবন্ধুর খুনে সরাসরি সংশ্লিষ্ট রিসালদার মোসলেহউদ্দিন তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার নেতাকে হত্যার জন্য হাজির হয়। কারা কর্তৃপক্ষ তাদের বাধা দিলে বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে খন্দকার মোশতাকের নির্দেশ যায়- ওরা যা করতে চায়, করতে দাও। তাজউদ্দিনের সেলে চার নেতাকে খুব কাছ থেকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। সে সময় সুপ্রিম কোর্টের তিনজন বিচারপতি সমন্বয়ে জেলহত্যার তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করলেও জেনারেল জিয়াউর রহমান তার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে ওই তদন্ত কমিশনকে কাজ করতে সম্মতি দেয়নি। [পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮]

জিয়াউর রহমানের শাসনামল কিংবা পরবর্তী সময় এইচ এম এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে কেন বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে দেওয়া হয়নি? এর কারণ বুঝতে আমাদের সমস্যা হয় না- ২১ বছরে অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় থাকা অপশক্তির ভয় ছিল- তাদের মুখোশ খুলে পড়বে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসন জারি হয়। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস 'বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জেনারেল জিয়া তাঁর দল বিএনপিতে সকল দল ও মতাদর্শের লোকদের একত্রে জমায়েত করে। অসময়ে শেখ মুজিবের মৃত্যুতে সবচেয়ে লাভবান হয় বিএনপি। জিয়াউর রহমানের দল বিএনপি পাকিস্তানি দালালদের জন্য তার সবগুলো সদর দরজা খুলে দিয়েছিল। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি থেকে পদপ্রার্থীদের মধ্যে ২৫০ জনই ছিল ওই দালাল গোত্রের রাজনীতিবিদ। তাদের অধিকাংশই শেখ মুজিবের আমলে পাকিস্তানি শাসকচক্র ও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং সাজা ভোগ করে।' ['বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ', পৃষ্ঠা ১৬৩]

জিয়াউর রহমান কীভাবে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের কাছ থেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ কেড়ে নেয়, তার বিবরণ রয়েছে 'বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ' গ্রন্থে। এতে অ্যান্থনি মাসকারেনহাস লিখেছেন- 'জিয়া ২৮ নভেম্বর (১৯৭৬) সিদ্ধান্ত নেয়- প্রেসিডেন্ট সায়েমকে একসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বে রাখা তাঁর জন্য বিপজ্জনক। সে ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল এইচ এম এরশাদ, চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবুল মঞ্জুর, নবম ডিভিশনের কমান্ডার জেনারেল মীর শওকত আলী, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান এবং বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে নিয়ে বঙ্গভবনে গিয়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটি তার কাছে ছেড়ে দিতে বলে। রাষ্ট্রপতি সায়েম এতে রাজি ছিলেন না। এক পর্যায়ে বিচারপতি সাত্তার বলেন- ভাই, জিয়া যখন সিএমএলএ পদটি চাইছে, পদটি আপনি তাকে দিয়ে দিন। রাত ১ টার দিকে বিচারপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ হস্তান্তরের কাগজে সই করেন।' [পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬]

বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম তাঁর 'বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি' গ্রন্থে বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, 'আমি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ছেড়ে দিই উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের হাতে। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল তার হাতেই ছেড়ে দিই রাষ্ট্রপতির পদ।' [পৃষ্ঠা ৩৫]

এ গ্রন্থেই বিচারপতি সায়েম জিয়াউর রহমানকে তুলনা করেছেন বাংলাদেশে গণহত্যার প্রধান হোতা জেনালের ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে। কারণ দু'জনেই একইসঙ্গে সেনাবহিনী প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিল। [পৃষ্ঠা ২২]

জিয়াউর রহমান ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার পর বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেছিল।

বন্দুক-মেসিনগান-ট্যাংকের দাপট দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করে রাখা জিয়াউর রহমান তার পূর্বসূরি পাকিস্তানের আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের মতোই সরকারবিরোধী সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। ন্যায়ের পক্ষে কেউ দাঁড়াতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন 'সংগ্রামী ছাত্রসমাজ'-এর ব্যানারে ৪ নভেম্বর (১৯৭৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে শোক মিছিল নিয়ে যায়। পরদিন ঢাকায় হরতাল আহ্বান করা হয় জেল হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবি করা হয়। কিন্তু যত প্রতিবাদ হোক সামরিক শাসনের নিষ্ঠুর যাতাকলে তা সংবাদপত্র বা বেতার-টেলিভিশনে প্রকাশ-প্রচারের সুযোগ নেই। এখন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বেতার-টিভি-সংবাদপত্রের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। সবার রয়েছে মতপ্রকাশের সুবিধা। এ সুবিধার অপব্যবহার

হতেও আমরা দেখি। কিন্তু জিয়াউর রহমান বা এইচ এম এরশাদের শাসনামলে 'কেউ কিছু বলতে পারবে না- মুখ বুঝে সহ্য কর' নীতি অনুসরণ করা হতো। জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছিল। পাকিস্তান আমলে এ ভূখণ্ড শোষণ করেছিল কারা, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল কোন অপশক্তির বিরুদ্ধে- এ সব প্রশ্নে পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ বেতারের নাম বদল করে পাকিস্তান আমলের কায়দায় রেডিও বাংলাদেশ রাখা হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা-ধর্ষণ-লুটপাটে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী দল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, কারাগারে বন্দি গণহত্যার নিষ্ঠুর অপরাধে জড়িত রাজাকার-আলবদরদের মুক্তি দেয়। পাকিস্তান ও সৌদি আরবে পালিয়ে থাকা একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বাংলাদেশে ফেরত এনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অধিকার প্রদান করে। তার এবং পরবর্তী শাসকদের দুঃশাসনের আমলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে যায়।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার করেছেন। কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং আরও অনেকে বিচারের অপেক্ষায়। যুদ্ধাপরাধ কখনও তামাদি হয় না- আবারও প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কুশিলব কারা, এ ভয়ঙ্কর অপরাধের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল কারা তার অনেক কিছুই এখনও দেশবাসীর অজানা। একটি উপযুক্ত কমিশন এ প্রশ্নের নিরসন করতে পারে, এমন অভিমত রয়েছে। সরকার এ পথে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এমন প্রত্যাশা থাকল।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

# সীমাহীন মূল্যে কেনা স্বাধীনতার বিজয়, জানতে হবে, জানাতেও হবে নিরন্তর

## মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস পৃথিবীর আর সব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ এবং জাতিসমূহ থেকে নানা বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে আবশ্যকীয় পাঠ্য। এটি একটি রক্তাক্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা। এর শুরুর ইতিহাস দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি পরাধীনতার আমলকেও ছাড়িয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অন্তত ১০০ বছরের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে। তবে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার রক্তাক্ত অধ্যায় আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের রাজনৈতিক সহায়ক শক্তিসমূহ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আমাদেরকে উচ্চারণ করতে হয়েছিলো "আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন'... বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই অপারেশন সার্চলাইট নামে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এবং শাসকগোষ্ঠী নিরস্ত্র মানুষের ওপর ট্যাংক, কামান, বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো হত্যার উদ্দেশ্যে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠী অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই। পাকিস্তান যে পূর্ব বাংলার মানুষকে কোনোভাবেই সহ্য করতে রাজি ছিলো না তার প্রমাণ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই তারা একের পর এক দিয়ে যাচ্ছিলো। অথচ পূর্ব বাংলার জনগণ একদিন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র লাভের জন্য আন্দোলন করেছিলো। সেই পাকিস্তানেই পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের মর্যাদাকর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হতে থাকে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম, ত্যাগ, তীতিক্ষা, দেশপ্রেম এবং আত্মমর্যাদার অধিকার অর্জনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন ছিলো তা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বৃহত্তর জনগণ করতে শিখেছে।

৬ দফা প্রদান করে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাকামী জনগণের সম্মুখে মুক্তির সনদ উপস্থাপন করেন। নিজে এবং সহকর্মীরাসহ সকলেই পাকিস্তানিদের রোষানলে পড়েন। জেলে যান, বছর বছর কারারুদ্ধ থাকেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ওঠার অপেক্ষায় ছিলেন। সেখান থেকেই মানুষ প্রিয় নেতাকে মুক্ত করার জন্য গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ভেঙ্গে দেয় পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরব্যবস্থাকে। তখন সাধারণ নির্বাচন দিতে পাকিস্তান বাধ্য হয়। সেই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ যে ম্যান্ডেট প্রদান করেছিলো তাতে হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা বাঙালির দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামে বেড়ে ওঠা নেতা শেখ মুজিবের

হাতে দিতে হবে নতুবা স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনমানসের এমন পরিবর্তনশীলতার সামান্যতম উপলব্ধি করতে পারেনি। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি জনগণের এই প্রস্তুতি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে যা ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে দ্রুততর হতে থাকে।

১৯৭০ এর নির্বাচনের পর স্বাধীনতার বাস্তবতা যেমন তৈরি হতে থাকে, মানুষের মধ্যে মানসিকতাও দ্রুত বেগবান হতে থাকে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'- অনেকটাই তখন জানান দিয়ে গেলো আমরা স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে এবার প্রয়োজনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেবো। পাকিস্তানিরা মনে করেছিলো অপারেশন সার্চলাইট নামিয়ে আমাদের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে পোড়ামাটি নীতি বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু পাকিস্তানিদের সেই কাল্পনিক হিসাব শুরু থেকেই ব্যর্থ হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের পর তার ঘোষিত স্বাধীনতার বাণী মানুষের কানে পৌঁছাতে দেরি হয়নি। মানুষ পাকিস্তানিদের প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখনো আমাদের প্রতিরোধের কোনো আয়োজনই ছিলো না। কিন্তু প্রতিটি মানুষ বুক চিতিয়ে হাতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মুখে জয় বাংলার স্লোগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে নিরস্ত্র জনগণের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য। বঙ্গবন্ধুর সহযোগী রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বল্প সময়ের মধ্যেই একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে বৈধ উপায়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে থাকে। ১৯৭১ এর ১০ এপ্রিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ জাতির জীবনে উপস্থিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে একটি বৈধ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ছিলো এক অন্যন্য অসাধারণ ও বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। আমাদের একটি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠনেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। একইসঙ্গে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও প্রচারিত হয়। জনগণ এসব আয়োজনের খবর শুনে গ্রাম থেকে নদী, মাঠ, পাহাড়, সীমান্ত অতিক্রম করে ছুটে যায় স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্য। ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথ তলায় এক অনাড়ম্বর অথচ তেজদীপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণ এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করা হয় সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রিয় আবাসভূমি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত করার কথা।

বাংলাদেশ এক চরম অনিশ্চিত অবস্থা থেকে কীভাবে দেশপ্রেম, মেধা, মনন ও সৃজনশীল রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে একদিকে প্রস্তুতি গ্রহণ,

অন্যদিকে মানুষকে সম্পৃক্ত করা আন্তর্জাতিকভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া জাতির পক্ষে টানতে থাকে। এ এক চুম্বক আকর্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ সূচনা করেছিলো যার প্রতি ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ সমর্থন জানাতে থাকে। তবে সামরিক পাকিস্তানি শক্তির পক্ষে পৃথিবীর দুই পরাশক্তি এবং কিছু আরব রাষ্ট্র সমর্থন জানালেও পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও লড়াই করতে নেমে পড়েছিলো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, লুটপাট, নারী ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ, গণহত্যা , পুল, কালভার্ট, ব্রিজ ধ্বংস করেও মানুষকে স্তব্ধ করতে পারেনি। এক শ্রেণির রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং পাকিস্তানি অনুগত বাহিনী সৃষ্টি করেও নিজেদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে পারেনি। দিন যতো এগুচ্ছিলো মুক্তিযুদ্ধ তত সুসংগঠিত হচ্ছিলো, ততো শ্রেণি, পেশা ও বাহিনীর মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের যুক্ত করে রণাঙ্গনকে সুসজ্জিত করতে থাকে। কমাস আগেও যে কৃষকের হাতে ছিলো লাঙল, জোয়াল আর চাষের গরু, তার হাতে এখন স্টেনগান, গ্রেনেড বোমা যা সে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলো। যে শ্রমিক আগে কলে কারখানায় কাজ করতো সেও একইভাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলো। যে ছাত্রের হাতে বই পুস্তক ছিলো তার হাতেও স্বাধীনতার অস্ত্র তখন শোভা পাচ্ছিলো। যে শিক্ষক ক্লাসে পড়াতেন তিনিও চলে গেলেন যুদ্ধে আর বিদেশে জনমত গঠনে।

যে শিল্পী দেশে কোনো প্রকারে শিল্পচর্চা করে জীবন কাটাতেন তিনিও সীমান্ত পাড়ি দিয়ে গণসংগীত আর স্বাধীন বাংলা বেতারে মানুষকে উজ্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদেশে অবস্থানরত যে বাঙালি কর্মকর্তা মোটামুটি সুখেই ছিলেন তিনিও দেশের স্বাধীনতার জন্য চাকরি ছেড়ে বিশ্ব জনমত গঠনে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করলেন। যে সাংবাদিক একদা পত্রিকায় সংবাদ লেখতেন তিনিও স্বাধীনতার পক্ষে দেশে বিদেশে লেখালেখি শুরু করলেন। বিদেশীরাও যুক্ত হলেন আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে কোথাও বা কনসার্ট আয়োজনে, কোথাওবা জনমত ও অর্থ সংগ্রহে। বিদেশী প্রেস, মিডিয়া সর্বত্র তখন বাংলাদেশ এক স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার আর্তনাদ ব্যক্ত করছিলো। ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার দেশে বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলো। এমনকি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কিংবা প্রবাসে অবস্থানরতরাও মুক্তিকামী বাঙালির পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি। বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে তখন ছোটো বড়ো অসংখ্য উদ্যোগ এই বাংলাদেশকে ঘিরে চলেছিলো। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানিদের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, যুদ্ধ, আক্রমণ, সীমান্তের ওপাড়ে আশ্রয় শিবিরে ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, স্বাধীনতায় নেতৃত্বদানকারী সরকারের নির্ঘুম রাত, নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ষড়যন্ত্র মোকাবেলা, ভারতের নানা গোষ্ঠী, পেশার মানুষের প্রসারিত হাত

বাংলাদেশের পক্ষে নানা বক্তৃতা বিবৃতি, সাহায্য, সহযোগিতা এসব প্রতিদিন শক্তি সঞ্চয় করছিলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে। চরম অনিশ্চয়তা ধীরে ধীরে নিশ্চয়তার ভিত্তি তৈরি করতে থাকে।

পাকিস্তানিরা তখন কারাগারের অন্তরালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র আটতে থাকে। এর বিরুদ্ধেও জনমত বিশ্বে উচ্চারিত হতে থাকে। পাকিস্তানে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ বাঙালি যে যেদিকে পারছিলো পালিয়ে আসার চেষ্টা করছিলো। আবার অনেকে বন্দিত্ব জীবনে আটকে পড়ে গিয়েছিলো। এ এক সীমাহীন বিচিত্র যন্ত্রণাদায়ক কষ্টকর মৃত্যুর মুখোমুখি দিনাতিপাত করার অভিজ্ঞতা। এরপরও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তখনো মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। বিশ্বের রাজনীতি বিভক্ত হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো প্রদান করে। বোঝা গেলো বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে আর বন্ধুহীন নয়। জাতিসংঘেও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পক্ষে জোরালো যুক্তি উত্থাপিত হতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী আরও সাহসী হয়ে উঠতে থাকে। গ্রামেগঞ্জে তখন সুসংগঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ পাকিস্তানিদেরকে হটিয়ে দিতে থাকে। নভেম্বরের ২১ তারিখে ৩ বাহিনীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠিত হয়। এই সেনাবাহিনীর চরিত্রেই ছিলো মুক্তিযুদ্ধ। গঠিত সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনী গঠন করে। আর তাতেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মাথায় রক্ত টগবগিয়ে উঠে। ৩ ডিসেম্বর তারা ভারত আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের সরকার ভারতের নিকট স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বৈধ উপায়ে প্রদানের দাবি করে। ৬ ডিসেম্বর ভারত এবং ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের যৌথ নেতৃত্বে পাকিস্তানিদের হটানোর জন্য প্রবেশ করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যৌথবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি। চারদিক থেকে সব ঢাকা অভিমুখে পালাতে থাকে। পথে পথে প্রতিরোধের মুখে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। নিরস্ত্র জনতার মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কতটা অসহায় হয়ে পড়েছিলো সেটি সেই সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। পাকিস্তানিরা যখন লেজ গুটিয়ে আসতে থাকে তখন আলবদর, আলশামস বাহিনী ১০ তারিখ থেকে নতুন করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে থাকে। পরাজয়ের পূর্বমুহূর্তে এই অপশক্তি বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধনে গুপ্তঘাতকের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তাতেও বাংলাদেশের বিজয় আর পাকিস্তানের পরাজয় ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। ১৬ই ডিসেম্বর বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য হয়। রচিত হয় বিজয় দিবস। ২৬ মার্চ যে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিলো অজানা এক গন্তব্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটলো বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে তাই এক নয় দুটি দিন ইতিহাসের গৌরবে স্থান করে নিলো। এমনটি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে স্বাধীনতার সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার এই সংগ্রাম এক দীর্ঘ ঐতিহ্যমণ্ডিত উপাখ্যানে ভরপুর। এই ইতিহাস এখনো অনেকের কাছেই অজানা। অনেক লিখিত দলিল পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমাদের অজান্তেই এখনো রয়ে গেছে। দেশেও প্রতিটি ঘরে, গ্রামে, অঞ্চলে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সীমাহীন দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা আর গৌরবময় ঘটনা অনেকেই তুলে ধরতে পারেননি। দীর্ঘদিন দেশের রাজনীতিতে মুখে স্বাধীনতার পক্ষের কথা বললেও অন্তরে স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজত্ব কায়েম ছিলো। রাজনীতি, সমাজ ও জনমানসের এক হীনমনস্ক গোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয়ের ইতিহাসকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছিলো। কয়েকটি প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাস পড়ে বা শুনে দেশকে ভুলভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখেছে। কিন্তু সময় এসেছে নতুন খবর শোনার। এ খবর নতুন নয়, একাত্তরেরই নানা ঘটনার খবর যা এতদিন চাপা পড়েছিলো। এখন দেশে দেশে, এখানে সেখানে হাতে তুলে নিতে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে সেই সব পক্ষ বিপক্ষ শক্তির নানা কথা ও ঘটনার বর্ণনা। নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে এই তথ্য উপাত্তে আমরা যতো বেশি তুলে ধরতে পারবো ততোবেশি নতুন প্রজন্ম জাতীয় শৌর্য, বীর্য ও ঐতিহ্যে চেতনা ও প্রেরণার সঙ্গী হবে। ইতিহাস অতীতের মহৎকে ধারণ করেই বর্তমানকে ভবিষ্যতের পথে চলার শিক্ষা দেয়। স্বাধীনতার ইতিহাস বিজয়ের এই মাসে যে বিশাল সমৃদ্ধি নিয়ে আমাদের সম্মুখে অপেক্ষা করছে, আমাদের তরুণদের হাতে ও চেতনায় তার এই ঢালা তুলে দিতে হবে। তবেই এই মহান ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে থাকবে।

লেখকঃ অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ও গবেষক।

# সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের সেবা পাবে জনগণ

## অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চালু হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম সেন্টার ভিত্তিক ৭৫০ শয্যার সুপার স্পেশাইলজড হাসপাতাল। এরই মধ্যে ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণসহ হাসপাতালের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। হাসপাতালটি দ্রুত উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিম বু-কিয়ামের উপস্থিতিতে হাসপাতালটি উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে এই সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল। এটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ করা হচ্ছে। এদেশের সাধারণ মানুষকে চিকিৎসার জন্য যাতে বিদেশে যেতে না হয় সে লক্ষ্যেই নির্মিত হচ্ছে এই হাসপাতাল। হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন সেবা নিতে পারবে ৫ থেকে ৮ হাজার রোগী। তাদের জন্য মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করতে ৩শ' চিকিৎকসহ মোট ১ হাজার ৫শ' জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এরই মধ্যে তিন দফায় চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আরও প্রশিক্ষণ পাবেন ১৪০ জন। এর মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি উন্নত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের দিগন্ত প্রসারিত হবে। কিডনি ও লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সুবিধা থাকবে এই হাসপাতালে। এ লক্ষ্যে ৮০ জন চিকিৎসক ৩০ জন নার্স ও ১০ জন কর্মকর্তার বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬১০ জন স্বাস্থ্যকর্মীকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

হাসপাতালটির কার্যক্রম চলবে ৬টি বিশেষায়িত সেন্টারের মাধ্যমে। কার্যক্রম চালু হলে এসব সেন্টারে ২ বছরের জন্য নিয়োজিত থাকবেন ৬ জন কোরিয়ান ইঞ্জিনিয়ার ও ৫০ জন কোরিয়ান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। এদেশীয় জনবলকে প্রশিক্ষিত করতে তারা ভূমিকা রাখবেন। এছাড়াও চিকিৎসা খাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের দেশীয় দক্ষ জনশক্তিকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে এই হাসপাতালে নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশেষায়িত সব ধরনের সেবা নিয়ে বাংলাদেশে এটিই প্রথম সেন্টার ভিত্তিক হাসপাতাল। দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের অর্থায়নে হাসপাতালটির ২টি বেসমেন্টসহ ১৩তলা ভবনে থাকবে বিশ্বমানের সব ধরনের সেবা কার্যক্রম। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে থাকবে ১৪টি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, ১০০ শয্যার আইসিইউ, জরুরি বিভাগে থাকবে ১শ'টি শয্যা, ভিভিআইপি কেবিন ৬টি, ভিআইপি কেবিন ২২টি এবং ডিলাক্স শয্যা থাকবে ২৫টি। সেন্টার ভিত্তিক প্রতিটি ওয়ার্ডে স্থাপন করা হচ্ছে ৮টি করে শয্যা। গুণগতমান বজায় রাখতে ফার্নিচার ও অন্যান্য সরঞ্জাম দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আনা হয়েছে।

নবনির্মিত হাসপাতাল ভবনের প্রথম পর্যায়ে থাকবে- স্পেশালাইজড অটিজম সেন্টারসহ মেটারনাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার, ইমার্জেন্সি মেডিকেল কেয়ার সেন্টার, হেপাটোবিলিয়ারি ও গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সেন্টার, কার্ডিও ও সেরিব্রো ভাসকুলার সেন্টার এবং কিডনি সেন্টার। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে- রেসপিরেটরি মেডিসিন সেন্টার, জেনারেল সার্জারি সেন্টার, অপথালমোলজি, ডেন্টিস্ট্রি, ডার্মাটোলজি সেন্টার এবং ফিজিক্যাল মেডিসিন বা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার।

এই হাসপাতালকে বিশ্বমানের মডেল হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তুলতে রাখা হচ্ছে সর্বাধুনিক সব ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি। এর মধ্যে রয়েছে বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন, রোবোটিক অপারেশন, জিন থেরাপির ব্যবস্থা। চিকিৎসক, নার্স ও কর্মকর্তাদের জন্য রাখা হচ্ছে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও মৌলিক গবেষণার জন্য আলাদা সেন্টার। রোগীবান্ধব এই হাসপাতালে থাকবে সানকেন গার্ডেন, রুফটপ গার্ডেন ও বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব সুযোগ-সুবিধা। থাকবে উন্নতমানের আধুনিক ব্যবস্থাপনার বহির্বিভাগ ও ইনফো ডেস্ক ও ডিজিটাল ইনফরমেশন সেন্টার।

এরই মধ্যে ভবনের স্ট্রাকচারাল, আর্কিটেকচারাল ও সিভিল ওয়ার্ক কাজ প্রায় শেষ। এছাড়া মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল, ইনফরমেশন সিস্টেমসহ (এইচআইএস) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহসহ যাবতীয় কাজ দ্রুত শেষ করা হচ্ছে। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ১ হাজার ৩শ' কোটি টাকা। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার দিয়েছে ১ হাজার কোটি টাকা; যা ৪০ বছর মেয়াদি। তবে এর প্রথম ১৫ বছর কোনো টাকা পরিশোধ করতে হবে না। তারপর থেকে ০.১ শতাংশ সুদে এই ঋণ শোধ দেওয়া শুরু করবে সরকার।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্সি পরিণত করার উদ্যোগ নেন। সেই লক্ষ্যে ২০১২ সালে হাসপাতাল সংলগ্ন পাশের প্রায় ১২ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরে ২০১৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জনগণের জন্য বিশেষায়িত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপনের প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়। পরে দক্ষিণ কোরিয়া প্রকল্পটির সরকারের ইডিসিএফের অর্থায়নে ১ হাজার ৪৭ কোটি টাকা ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্পটি ২০১৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হাসপাতালটির কার্যক্রম চালু হলে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমানো রোগীদের সংখ্যা অনেকাংশেই কমে আসবে বলে মনে করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও আমাদের দেশের চিকিৎসাসেবায় নবদিগন্তের উন্মেস ঘটবে।

লেখক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য।

# বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতা

## নাছিমা বেগম

বেগম রোকেয়ার সামগ্রিক জীবন পর্যালোচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষ। তিনি ভারতবর্ষের পিছিয়ে থাকা নারী-পুরুষের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর চিন্তায় কেবল নারীর জাগরণ ছিল না, ছিল নারী-পুরুষের সমান জাগরণ। বেগম রোকেয়ার জীবন সাধনায় আমরা একদিকে যেমন পাই তাঁর নিঃস্বার্থ কর্মোদ্যোগ, অপরদিকে পাই নিজ লেখনির মাধ্যমে কুসংস্কার ও সামাজিক অবক্ষয়রোধের নিরন্তর প্রয়াস।

আমরা জানি একজন আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চিন্তায় ও চেতনায় আধুনিক হওয়া। একজন মানুষ যখন চিন্তা ও চেতনায় আধুনিক হয়ে ওঠেন, তখন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে যুক্তিবাদিতা। আর বিজ্ঞানমনস্কতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যবহারিক জীবনে যুক্তিপ্রবণ হওয়া। ব্যবহারিক জীবনে কোনো মানুষ যুক্তিবাদী হলেই অবধারিতভাবেই তিনি বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির কাছে কুসংস্কারের অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়, তেমনি ভ্রান্ত ধারণার খোলসও খসে যায়। একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কখনো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আবেগতাড়িত হয় না; বরং যুক্তির মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী চিন্তার মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক সুব্রত বড়ুয়া 'বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞান চিন্তা' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসাই হলো বিজ্ঞানচিন্তার মূল বিষয়। বেগম রোকেয়ার রচনায় এই দুটি বিষয় বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। রোকেয়ার বিজ্ঞানচিন্তার মধ্যে যে বিষয়টি প্রধান তা বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ ও উপস্থাপন নয়, বরং বৈজ্ঞানিক যুক্তি শৃঙ্খলার মাধ্যমে নির্মোহভাবে তিনি সত্যানুসন্ধান করেছেন। তাঁর রচনায় একদিকে যেমন তীব্র শ্লেষ ও সমালোচনা রয়েছে, তেমনি তার বক্তব্যের অন্তরালে রয়েছে কুসংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী, পরিচ্ছন্ন জীবনসন্ধানী সচেতন একটি মন। রোকেয়ার অবরোধবাসিনী কেবল পর্দার অন্তরালের অবরোধবাসিনী নয়, বাইরের অবরোধের চেয়ে ভেতরের তথা মানসিকতার অবরোধ যে অনেক বেশি কঠিন। সে বিষয়টি তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আলস্য, কুসংস্কার, কুশিক্ষা, অশিক্ষা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম সফল করতে তিনি অযৌক্তিকতার অবরোধ অতিক্রম করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তব্য ও চিন্তা ভাবনা তার সমকালীন সমাজকে কেন্দ্র করে বিবৃত হয়েছে। তিনি তাঁর যুক্তি, শানিত ভাষা এবং প্রসঙ্গ বিষয়াদি উপস্থাপন করেছেন অন্তরের অবরোধকে কেন্দ্র করে। অন্তরের অবরোধ অতিক্রম করাই ছিল তাঁর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে সুব্রত বড়ুয়া উল্লেখ করেছেন, উনিশ শতকে সূচিত পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার ধারা এদেশের সমাজ জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযোগী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আনার ব্যবস্থা নেয়া হয়। জ্যোর্তিবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, রসায়ন ও যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি ১৮২৩ সালের এপ্রিলে কলকাতায় এসে পৌঁছায়। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই রচনা ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরফলে সূচনা লগ্ন থেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রয়াস বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়। বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু(১৮৫৮-১৯৩৭), আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) প্রমুখ ও বিজ্ঞানীর রচনা শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেগম রোকেয়ার অনুসন্ধিৎসু মন আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার এই আয়োজন ও উপকরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি নিজের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে তা আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন।

বেগম রোকেয়ার রচনা সমগ্র পাঠে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার বিভিন্ন উপকরণ বিভিন্ন গল্প ও প্রবন্ধে পরিলক্ষিত হয়। তিনি কখনো রূপক অর্থে আবার কখনো সরাসরি বিজ্ঞানের ব্যবহার ও শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট রোকেয়া গবেষক মুহম্মদ শামসুল আলমের মতে, 'পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের প্রগাঢ় প্রভাব রোকেয়ার বিভিন্ন রচনায় লক্ষণীয়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, তাঁর সমসাময়িক কোনো লেখিকার মধ্যে তো নয়, পুরুষদের লেখাতেও এমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার তেমন নিদর্শন তখন দেখা যায় নি। 'সুলতানা'র স্বপ্ন', 'সৌরজগৎ', 'পদ্মরাগ', 'সুগৃহিনী', 'শিশু পালন' প্রভৃতিতে প্রচুর বিজ্ঞান প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বিজ্ঞানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, 'Sultana's Dream' -এ'' (৩) এছাড়া তাঁর রচিত 'এণ্ডিশিল্প', 'বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল' গল্প রচনায়ও বিজ্ঞানের প্রচুর প্রভাব দেখা যায়।

বেগম রোকেয়া 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে গৃহিনীর ডাক্তারি ও রসায়ন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা চাই। কোনো খাদ্যের কী গুণ, কোনো বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন ব্যক্তির কিরূপ আহার প্রয়োজন এসব বিষয়ে গৃহিনীর জ্ঞান না থাকলে যথাযথভাবে শরীরের পুষ্টি লাভ হয়না। কালাইবিহীন তামার পাত্রে কেউ দধি দিয়ে কোরমা রান্না করলে তা খাওয়ার উপযোগী থাকে না; তা বিষাক্ত খাবারে পরিণত হয়। তেমনি রোগাক্রান্ত পশুপাখির মাংস খেলে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। টাটকা শাক সবজি খাওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি গৃহিণীদের নিজ আঙ্গিনায় শিম, লাউ, শশা, কুমড়া রোপণের সবজি বাগান প্রস্তুতের জন্য

Horticulture সম্পর্কে জানার কথা বলেছেন। কোন্ মাটিতে কোন্ সবজি ভালো হয়, তা জানা না থাকলে ভালো ফলন আশা করা যায় না। রান্না শেখার ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপ তত্ত্ব শেখার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাধারণ। তিনি উল্লেখ করেছেন, পরিবারের কেহ অসুস্থ হলে গৃহিণীকেই প্রথমে রোগীর প্রাথমিক সেবা দিতে হয়। এ বিষয়ে তার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা চাই। অনেক সময় না জেনে ভুল ঔষধ সেবন, যেখানে সেখানে ঔষধ রেখে শিশুদের জন্য বিপদ ডেকে আনা, রোগী ঘুমিয়ে থাকলে তাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ঔষধ সেবন করা, একবারের স্থলে তিন চারবার ঔষধ সেবন করানোর ক্ষতিকর দিকগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বের কথা বলি। রোকেয়া অত্যন্ত সুনিপুণভাবে 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধে গৃহিণীদের মানসিক উন্নতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

'শিশু পালন' প্রবন্ধেও রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। আঁতুড়ঘরে শিশু মৃত্যুর কারণ কী? তা তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এজন্য তিনি মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক মায়ের গর্ভে শিশুর জন্ম এবং যথাযথ পরিচর্যার অভাবে শিশুর মৃত্যু ঘটে। শিশুর সামান্য অসুখ হলেও যত্ন করা, শিশুদের পরিপাক অর্থাৎ হজম ঠিক হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য রাখা। কাঁদলেই দুধ না খাইয়ে অন্য কোনো অসুবিধা আছে কি না তারও খেয়াল করা। ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেছেন। তাঁর মতে এ শিশু মহামারির আর একটা বিশেষ কারণ আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ। এই প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া ডাক্তার ভারতচন্দ্রের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, 'মায়ের কর্তব্য না শিখে কেউ যেন মা না হয়। সে নিজেই ১২-১৩ বছরের বালিকা, সে আর কর্তব্য শিখতে সময় পেল কখন?' উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের মতে কুড়ি বছর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ দিতে নাই। মেয়েদের শরীর যাতে ভালো থাকে সেদিকেও নজর রাখার দরকার। রোকেয়া আরও উল্লেখ করেছেন, বালিকা স্কুলে মেয়েদের শরীর ভালো রাখার জন্য ব্যায়াম করার ব্যবস্থা থাকলেও ছাত্রীদের মা -বাবা ড্রিল করতে বারণ করেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বও তারা উপলব্ধি করেন না। বেগম রোকেয়া 'শিশু-পালন' নিবন্ধে শিশু লালন-পালনের বিভিন্ন উপায়ের বিস্তৃত বর্ণনাসহ শিশু সুরক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ মায়েদের রক্ষা করার বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং ভবিষ্যত জননীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তাদের খাওয়া দাওয়ার বিশেষ যত্ন নেওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন।

'এন্ডি শিল্প' গল্পে বেগম রোকেয়া উল্লেখ করেন এন্ডিগুটি প্রধানতঃ আসাম অঞ্চল এবং রংপুরে আবাদ হতো। এন্ডি পোকার গুটি থেকে রেশম উৎপন্ন হয়। এন্ডি পোকার প্রধান খাদ্য এরন্ড পাতা। সম্ভবত এরন্ড পাতা খায় বলে এই রেশমের নাম এন্ডি। রংপুরের সকল এলাকাতেই প্রচুর এরন্ড গাছ জন্মানোর ফলে প্রকৃতিগতভাবেই

এরন্ডের জঙ্গল হয়। ফলে এরন্ড গাছ খুবই কম মূল্যে পাওয়া যায় বিধায় এন্ডিগুটি চাষে তেমন মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এটি চাষে তেমন পরিশ্রমও নেই।

এন্ডি কাপড়ের বৈশিষ্ট্য হলো নতুন অবস্থায় এটি দেখতে ভালো লাগে না বিধায় এটি ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তবে এ কাপড় যত ধোয়া হয় বা যত পুরাতন হয় ততই সুশ্রী এবং ব্যবহারে আরামদায়ক, মসৃণ ও দেখতে চিকচিকে হয়।

বেগম রোকেয়া রীতিমতো অংক কষিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে এন্ডিশিল্প ধরে রাখলে রংপুরের মানুষ লাভবান হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কৃষক রমণীদের পোকা-পোষণ করায় উৎসাহ দেবার কোনো লোক রংপুরে নেই। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছেন, রংপুরের এন্ডি শিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এই গল্প পাঠে দেখা যায়, রোকেয়া কী সুনিপুণতার সাথে ১১টি ধাপে এন্ডি গুটি আবাদের প্রণালী থেকে শুরু করে এন্ডিসুতা প্রস্তুত প্রণালীর বিশ্লেষণ করেছেন। এতে মনে হয় এবিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ কীটতত্ত্ববিদ।

বেগম রোকেয়ার 'সৌরজগৎ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আধুনিকমনস্ক গওহর আলী। তাঁর নয় কন্যা। এই কন্যাদের কয়েকজনের নামও রাখা হয় সৌরজগতের গ্রহের নামানুসারে। যেমন - মুশতরী, জোহরা, সুরেয়া যা নামের ক্রমানুসারে বৃহস্পতি, শুক্র এবং কৃত্তিকা। প্রত্যেহ সন্ধ্যায় গওহর কন্যাদের পাঠদান করেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি বিজ্ঞানের নানাদিক আলোচনা করতেন। একদিন তিনি কন্যাদের বিজ্ঞান বই পাঠের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন বায়ু কী? বায়ুর শৈত্য, উষ্ণতা, লঘুত্ব, গুরুত্ব; বায়ুতে কয় প্রকার গ্যাস আছে; কিরূপে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাষ্প, মেঘ, সলিল এবং শীতল তুষারে পরিণত হয়। এভাবে নিয়মিত তাদের বিজ্ঞান চর্চা হতো।

বেগম রোকেয়ার এই গল্পের আরেক চরিত্র গওহর আলীর শ্যালক জাফর। তিনি অত্যন্ত নেতিবাচক চরিত্রের একজন মানুষ; নারীকে অবদমন করে রাখতে পছন্দ করেন। তিনি নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। একদিন পারিবারিক কথোপকথনের সময় মেয়েদের লেখাপড়াকে কেন্দ্র করে জাফর, গওহর আলীকে বিদ্রুপ করে বলেন, "কন্যাগুলি অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হইবে! সাধে কি তোমাদের সৌরজগৎ বলি। তোমার দুহিতা কয়টি গ্রহ, আর তুমি সূর্য্য!" মুশতরী, জোহরা, সুরেয়া - এই তারকাদের নামে গওহরের তিন কন্যার নামের ব্যঙ্গ করে জাফর বলেন, "তবে কেবল মঙ্গল, বুধ, শনি এ নামগুলো বাধ দেওয়া হইয়াছে কেন?"

অপর এক সন্ধ্যায় গওহর আলী কন্যাদের নিয়ে সৌরজগৎ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এসময় তিনি কন্যাদের ভালো করেই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, প্রত্যেক গ্রহই সূর্যকে নিয়মিত প্রদক্ষিণ করে। তিনি উল্লেখ করেন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা যেমন গ্রহদের কর্তব্য, তেমনি তাদের প্রত্যেককে আলো দান ও যথাবিধি আকর্ষণ করা এবং এর সাথে নিজের মেরুদন্ডের উপর ঘোরাও সূর্যের কর্তব্য। এই সৃষ্টি জগতের

প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য পালন করছে। কারো কর্তব্য সাধনে ত্রুটি হলে সমষ্টির বিশাল বিশৃঙ্খলা ঘটে। এ বিষয়ে তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, মনে কর প্রত্যেক লোকের গৃহই একটি সৌরজগৎ এবং গৃহস্থের আত্মীয়-স্বজনেরাও পরিবারের এক একটি গ্রহ। পরিবারের সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থের অবস্থানুসারে তারই মনোনীত পথে চলা। এবং গৃহস্থেরও কর্তব্য পরিবারস্থ লোকদের স্নেহরশ্মি দ্বারা আকর্ষণ করা, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা। এমনকি অভাবের কারণে খাদ্যের সংকট হলে, প্রথমে শিশুদের, অতঃপর আশ্রিত পোষ্যবর্গকে আহার করিয়ে সর্বশেষে নিজেদের আহার করা উচিত। যদি এই পরিবারের একটি লোকও স্বীয় কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তবে বিশৃঙ্খলা ঘটে পরিবারটি নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করে। গওহর তাঁর এই কথার স্বপক্ষে সৌরজগতের কক্ষপথ পরিক্রমার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, যেমন- কোনো গ্রহ যদি আপন কক্ষকে অতিক্রম করে দূরে সরে যায়, তবে সূর্যের আকর্ষণ বিমুক্ত হলে সে অন্য কোনো গ্রহের সাথে টক্কর খেয়ে নিজে চূর্ণ হবে এবং অপর গ্রহকেও বিপদগ্রস্ত করবে। সুতরাং যার যে কক্ষ তাকে সে কক্ষে থেকে স্বীয় কর্তব্য পালন করে চলতে হবে।

গওহর কন্যাদের সৌরজগৎ সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, সূর্যের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতে বুধের প্রায় তিন মাস, শুক্রের আট মাস, বৃহস্পতির ১২ বছর এবং শনির ৩০ বছর সময় লাগে। এটাই গ্রহগুলোর ব্যক্তিগত পার্থক্য বা স্বাধীনতা। শনি গ্রহকে কেউ রক্তচক্ষে আদেশ করতে পারে না যে, তোমাকেও বুধের মত ৩ মাসেই সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরতে হবে। এইরূপ মানবের সৌরপরিবারেরও পরস্পরের মধ্যে কতগুলো সাদৃশ্য এবং কতগুলো বৈসাদৃশ্য আছে। এই গল্প পাঠে বিস্মিত হতে হয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কী পরিমাণ চর্চা বেগম রোকেয়া করেছেন! কত দিক তিনি জেনেছেন এবং কত সহজে মানুষের চরিত্রের সাথে তা যৌক্তিকভাবে মিলিয়ে দেখাতে পেরেছেন! যেমন সৌরজগতের চতুর্দিক প্রদক্ষিণের বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে এর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের সঙ্গে 'গওহর এবং জাফরের' কথোপকথনের তুলনা করে মানব-পরিবারের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'বায়ুজানে পঞ্চাশ মাইল' গল্পটি একটি সত্য ঘটনার উপরে রচিত। বেগম রোকেয়া ১৯০৫ সালে যখন 'সুলতানার স্বপ্ন' লিখেছিলেন সেটি ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তখন এরোপ্লেন বা জেপেলিনের কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। এমনকি সে সময় ভারতবর্ষে মোটর কারও আসেনি। বৈদ্যুতিক আলোক এবং বৈদ্যুতিক পাখা কল্পনারও অতীত ছিল। অন্তত তিনি তখন সেসব কিছুই দেখেননি বলে গল্পে উল্লেখ করেছেন। 'সুলতানার স্বপ্ন' লেখার প্রায় ছয় বছর পরে ১৯১১ সালে তিনি প্রথম হাওয়াই জাহাজ শুন্যে উড়তে দেখেন। কিন্তু কখনো উড়োজাহাজে উঠতে পারবেন এরূপ আশা তিনি কখনও করেননি। তবে তার উড়োজাহাজে চড়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুলতানের স্বপ্ন রচনার ২৫ বছর পর ১৯৩০ সালের ৩১ শে নভেম্বর রোকেয়ার জীবনে আকাশ

ভ্রমণের সুযোগ আসে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি প্রথম মুসলিম পাইলট মিসেস রাসাদের ছেলে মোরাদের সঙ্গে প্লেনে চড়েন। ৩০০০ (তিন হাজার) ফিট উঁচুতে উঠে রোকেয়া জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন দক্ষিনে সূর্য, বামে ১১ই রজবের দ্বাদশীর পূর্ণ চন্দ্র। নীচে তাকিয়ে দেখেন কলকাতার পাকা বাড়ি, দালান-কোঠা-ইমারত, সব যেনো ইটের স্তূপ। হাবড়ার পুল'কে একটি খেলনা, আর হুগলি নদী একটা জলের রেখার মতো দেখাচ্ছিল। পঞ্চাশ মাইল চক্কর দিয়ে তাঁরা নীচে নেমে আসেন। বিমান-বীর মোরাদের সৎ সাহসের তিনি প্রশংসা করেন। কারণ এর মাত্র দুই মাস পূর্বে "আর ১০১' নামক বৃহৎ এরোপ্লেন ধ্বংস হয়ে ৪৫ জন হতভাগ্য যাত্রীর প্রত্যেকেই দগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতির কারণে আতঙ্কগ্রস্ত অনেকেই সে সময় বিমানে চড়তে চাইতেন না। রোকেয়ার নিজেরও সাহস কম ছিল না। এইরকম একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা জানার পরও তিনি বিমান ভ্রমণ করে তাঁর অপার সাহসিকতার প্রমান দেন। বেগম রোকেয়া বিমানে চড়ার যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন, গল্পটিতে সে অভিজ্ঞতা, বিমান থেকে বহির্দৃশ্য দেখার অপরূপ সৌন্দর্য এবং ধরণীকে সরাতুল্য গণ্য করে এর বর্ণনা যেভাবে তুলে ধরেছেন তা একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছাড়া অসম্ভব।

বেগম রোকেয়ার সবচেয়ে বেশি আলোচিত গ্রন্থ 'সুলতানার স্বপ্ন'। এই রচনায়, নারীমুক্তির উপায় হিসেবে তিনি নারীর শিক্ষা; সাহসিকতা; বিজ্ঞানসচেতনতা; নারীর মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধির ব্যবহার এবং সর্বোপরি দেশের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরে বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে তাঁর কল্পনায় গল্পের আকারে সাজিয়েছেন। গল্পের মূল চরিত্র নারী স্থানের ভগিনী সারা এবং সুলতানার কথোপকথনের মাধ্যমে রোকেয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে তথ্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা ছিল তার যুগের চিন্তার চেয়ে অনেক অগ্রগামী।

এই গল্পে নারীস্থানের মহারানি একজন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শাসক। তিনি শৈশব থেকেই বিজ্ঞান চর্চা করতে ভালোবাসতেন। তিনি নারী শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে নিয়ে তাঁর রাজ্যের সকল নারীকে সুশিক্ষিত করতে চান। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আইন প্রণয়ন করে তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। তাঁর রাজত্বে ২১ বছরের পূর্বে কোনো কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। নারীস্থানে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; যেখানে ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতো। তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে স্বপ্ন-কল্পনা বলে পুরুষের উপহাস বিদ্রুপ শুনলেও উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপালদ্বয় মুখে এর কোনো জবাব না দিয়ে কার্য্য দ্বারা উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

একসময় সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন সকল কাজের জন্য বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু দিনের পর দিন অনাবৃষ্টির কারণে তাঁরা হতাশায় ভুগছিলেন। এঅবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিমতী লেডি প্রিন্সিপাল অভিনব এক বেলুন আবিষ্কার করেন। এই বেলুনে কতকগুলো

নল সংযোগ করে বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করেন। তিনি এই বেলুনের মাধ্যমে বায়ুর আদ্রতা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেন। এরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা বৃষ্টির জল করায়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এই বেলুনের সাহায্যে তাঁরা বারো মাসের জন্যই পর্যাপ্ত পানি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারতেন। তখন সকলেই প্রয়োজন মতো ঐ বেলুনের পানি সকল কাজে ব্যবহার করতো। জলধর বেলুনে নল লাগিয়ে তাঁরা প্রয়োজন মতো শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করতো। এতে দশ এগারো বৎসর সেখানে অনাবৃষ্টির কারণে চাষাবাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার নিরসন ঘটে। বেলুনের মাধ্যমে আকাশ থেকে পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকায় মেঘমালা আকাশকে আচ্ছন্ন করতে পারতো না। এরফলে সেখানে প্রাকৃতিক বৃষ্টি, ঝর-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত হতো না; জলপ্লাবনের উপদ্রবও তাদের ভোগ করতে হতো না। তাঁদের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার, কোথাও কাদা-পানি নেই।

ভগিনী সারা, সুলতানাকে আরও জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জলধর বেলুনের সফলতা দেখে অপর নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের মনেও অসাধারণ কিছু আবিষ্কারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। অল্পকালের মধ্যে তাঁরাও গবেষণা করে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার দ্বারা সূর্যের তাপ সংগ্রহ করে রাখা যায়। শুধু তাই নয় এই যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ সংগ্রহ করে রাখতে যেমন পারতো; তেমনি ইচ্ছে মতো যেখানে ইচ্ছে বিতরণ করতে পারতো। যেমন তাঁরা এই সৌরতাপ একটি নলের মাধ্যমে রান্নাঘরে সংযোগের ব্যবস্থা করে। এতে সূর্যোতাপে তাঁরা সহজেই রান্নাবান্নার কাজ করতে পারতো। এছাড়া গ্রীষ্মকালে তাঁরা ইচ্ছেমতো জলধরের শীতল ফোয়ারায় ধরণী সিক্ত করে বাড়িঘর ঠান্ডা রাখতে পারতো। আবার শীতকালে সূর্য্যোত্তাপে তাদের ঘরবাড়ি ঈষৎ উষ্ণ করে রাখতে পারতো। তাঁর ফলে অতি-ঠান্ডা, অতি-গরমে তাদের কষ্ট করতে হতো না। (১৩)

ভগিনী সারা সুলতানাকে আরও জানান তাদের দেশ একবার শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তখন এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা দেশের সম্ভ্রম রক্ষায় এগিয়ে আসে। তাঁরা সৌর তাপের সাহায্যে ভয়ানক উত্তাপ সংবলিত সার্চলাইট তৈরি করে। প্রস্তুতকৃত এই লাইটের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত উত্তাপ-রশ্মী শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করে। সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণের সময় তাঁরা নিজেরা যাতে কোনো দুর্ঘটনার না পরেন, সেজন্য তাঁদের সুরক্ষায় জলধর বেলুনও রেখেছিলেন। প্রচন্ড সৌর উত্তাপ এবং তীব্র আলোক সহ্য করতে না পেরে শত্রুপক্ষ দিক-বিদিকে জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করে। এভাবে বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিনা রক্তপাতে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। এরপর তাদের নারীস্থান আর কখনো কারো দ্বারা আক্রান্ত হয়নি।

নারীস্থানে 'চপলা' অর্থাৎ বিদ্যুতের সাহায্যে চাষাবাদ করা হতো। বিদ্যুতের সাহায্যে তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ করেন। ভারি বোঝা উত্তোলন ও ব্যবহার কার্য্যেও বিদ্যুতের ব্যবহার করতো। নারীস্থানে রেল-পথ বা পাকা বাঁধা সড়ক ছিল

না। তাঁরা পায়ে হেঁটে চলাচল করতো বিধায় তাঁদের কোনো সড়কদুর্ঘটনা ঘটতো না। দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতে তাঁরা আকাশ পথ ব্যবহার করতো। বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত 'বায়ু-শকট' অর্থাৎ আকাশ যানের মাধ্যমে ভগিনী সারার সাথে সুলতানা আকাশ পথ ভ্রমণ করেন।

এভাবে প্রতিটি গল্পের পরতে পরতে বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার উপস্থিতি দেখা যায়। নারীশিক্ষার প্রভাবে অন্তঃপুরের নারীরা অবরোধপ্রথা ভেঙ্গে বর্হিজগতে প্রবেশ করে নিজেদের স্থান অধিকারে সক্ষম হয়। শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানমনস্ক নারীসমাজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে অল্প সময় ব্যয় করেই পরিচালনা করতে সক্ষম তার প্রমাণ দেন। রোকেয়ার স্বপ্নরাজ্যের নারীস্থানে নারীরা বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে 'জলধর বেলুন' আবিষ্কার করে 'জলধরকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা বৃষ্টির পানি করায়ত্ত, করেন। এই জলধর বেলুন ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকাজের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। ভাবতে অবাক লাগে বিদ্যুৎ যখন কেবল আবিষ্কার হয়েছে। এর ব্যবহার তখনো সকলের কাছে পৌঁছেনি। এসময় রোকেয়া এই বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়ার চিন্তা করেছেন। নারী বিজ্ঞানীরা সূর্যতাপ সংগ্রহ করার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন এবং সেই জ্বালানি প্রয়োজনমতো ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। ১৯০৫ সালেই বেগম রোকেয়া সৌরশক্তি সংগ্রহ করা এবং কৃত্রিম মেঘ তৈরি করা যে সম্ভব, সে কথা কল্পনা করেছিলেন, ভাবলেও আমাদের বিস্মিত হতে হয়!

উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার দিক থেকে বেগম রোকেয়া যুগের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী ছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে একনিষ্ঠ আগ্রহ এবং অন্বেষা তাঁর চিন্তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। তাঁর বহু রচনায় বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা স্পষ্ট স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। বেগম রোকেয়া এ সব কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে শিখেছেন, কীভাবে আয়ত্ত করেছেন, এর উৎস পথ আমাদের জানা নেই। তিনি কখনো রূপক অর্থে আবার কখনো সরাসরি বিজ্ঞানের ব্যবহার ও শিক্ষার কথা তাঁর বিভিন্ন গল্প ও প্রবন্ধের পরতে পরতে উল্লেখ করেছেন। আনন্দের বিষয় হলো রোকেয়ার অনুসারী নারীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। নারীরা আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপন দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। নারীর এই অগ্রযাত্রা কোনো অপশক্তির পক্ষেই আর রুখে দেওয়া সম্ভব নয়।

লেখক: মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান

# বাবার হাতে পাঁচ আর মেয়ের হাতে পাঁচশ'র গল্প

## ডাঃ সামন্ত লাল সেন

বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি এখন আমাদের দেশে অনেক আলোচিত একটা বিষয়। কিন্তু একটা সময় ছিলো যখন এই প্লাস্টিক সার্জারির সেবাটিই বাংলাদেশে ছিলো না। স্বাধীনতাযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা যখন পঙ্গুত্ব বা অঙ্গহানীর কোনো সমাধান পাচ্ছিলেন না সে রকম এক সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাবেক পঙ্গু হাসপাতালে যান তাদের দেখতে। সেই সময়েই উনি অনুভব করেন দেশে প্লাস্টিক সার্জনের প্রয়োজনীয়তা। অতি অল্প সময়েই তিনি আমেরিকা থেকে ডাঃ আর যে গ্রাস্ট সাহেবকে নিয়ে আসেন মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য। এভাবেই তাঁর হাত থেকে শুরু হয় এই দেশে প্লাস্টিক সার্জারির ইতিহাস। এখন যেই ইন্সটিটিউট এর নাম জাতীয় ট্রমা ও অর্থোপেডিক পুর্নবাসন ইন্সটিটিউট বা সংক্ষেপে নিটোর। মাত্র পাঁচ বেড দিয়ে শুরু বাংলাদেশের প্লাস্টিক সার্জারি।

এরপরের গল্প আরও অভিনব। আর যে গ্রাস্ট সাহেব ইন্ডিয়ান একজন প্লাস্টিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাঃ পারভেজ বেজলিল কে আনেন এই দেশে প্লাস্টিক সার্জারির সেবা সম্প্রসারণ করতে। তার সাথে আমি এবং ডাঃ মাজেদ মিলে কাজ শুরু করি। এরপর ১৯৮১ সালে ইংল্যান্ড থেকে অধ্যাপক ডাঃ শহীদুল্লাহ স্যার বাংলাদেশ ফিরে আসেন এবং ঢাকা মেডিকেল এ কাজ শুরু করেন। আমি সেই সময়ে ১৯৮৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাজ শুরু করি এবং অধ্যাপক শহীদুল্লাহ তিনিই প্রথম বাংলাদেশে একটা স্বতন্ত্র বার্ন ইউনিট এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উনি তা দেখে যেতে পারেন নি। সেই সময় গুলোতে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারির রোগীদের খুব দুরবস্থা ছিলো। কোনো আলাদা ওয়ার্ড না থাকায় দিনের পর দিন রোগীরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের বারান্দায় থাকতো, নির্দিষ্ট কোনো প্রটোকল অনুসরণ করে তাদের কোনো সেবা দেওয়া যেতো না, অপারেশন এর শিডিউল ও পাওয়া যেতো না। এইরকম সময়গুলোতেই একদিন বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই অগ্নিদগ্ধ রোগী দেখতে আসেন এবং তাদের দুর্দশা দেখে আমাকে বলেন, " সামন্ত এদের জন্য আলাদা জায়গা খোঁজ"

অবশেষে ঢাকা মেডিকেল এর প্রাঙ্গণের সাথেই বস্তি ছিলো, সেটাকে অন্যত্র সরিয়ে একটা ৫০ বেডের হাসপাতাল শুরু করা হয় ২০০৩ সালে। পরবর্তীতে রোগীর চাপে খুব দ্রুতই সেটিকে ১০০ বেডে রূপান্তরিত করতে হয়। তবুও হিমসিম খেতে

হয়, এতো পোড়া রোগীর দেশে। আর হবেই বা না কেন, সারা বাংলাদেশ থেকে এই সব রোগী পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। এরই মাঝে ২০০৯ সালে ঘটে নিমতলির ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনা। সীমিত লোকবল আর সামর্থ্য দিয়ে আমরা যুদ্ধ করে গেলাম। অন্যদিকে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারির রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। রোগীর জায়গা দেওয়ার বেড ফাঁকা থাকে না। একই বিল্ডিংয়ের আনাচে কানাচে রোগী রেখে এটাকেই আমরা তিনশ বেডে রূপান্তর করলাম। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। ৫০০ এর নীচে রোগী কখনোই নামে না। এরই মাঝে আবার ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষী হয় বাংলাদেশ। ২০১৪-২০১৫ সালের স্মরণকালের সেই নিষ্ঠুরতার অগ্নিসন্ত্রাস। সাধারণ অসহায় মানুষ দগ্ধ হয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল বার্ন ইউনিটে। আবারও আমরা আমাদের সীমিত লোকবল দিয়ে এই বিশাল সংখ্যক রোগীকে সামাল দিলাম, চিকিৎসা দিলাম। এরই মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নজরে আসলো যে এই ইউনিটটি যথেষ্ট নয় এতো পোড়ারোগীদের চিকিৎসার জন্য।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্লাস্টিক সার্জারির আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উদ্বোধন করতে আসেন। প্লাস্টিক সার্জারির কাজের পরিধির উপর একটা বৈজ্ঞানিক প্রেজেন্টেশন দেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেন যে বাংলাদেশে আসলে এখন একটা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটের খুব প্রয়োজন। কারণ প্লাস্টিক সার্জারি মানে শুধু বার্নের রোগীই না বরং জন্মগত ত্রুটি, ক্যান্সার দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীদের জীবন ও অঙ্গ ফিরিয়ে দিতে পারে, বিচ্ছিন্ন হওয়া অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে। তারই আলোকে উনি দিকনির্দেশনা দেন যাতে বাংলাদেশ এ একটা বিশ্বমানের ইন্সটিটিউট স্থাপন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি আমরা। উনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমরা সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশের বুকে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে। একমাত্র চায়না তে আছে ৪৫০ শয্যা বিশিষ্ট প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট। আর আমাদের শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক একটা হাসপাতাল যেখানে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি রোগীদের সমান ভাগে ভাগ করে সেবা দেওয়া হয়। এই ইন্সটিটিউট এ আছে পোড়া রোগীদের জন্য অত্যাধুনিক সব সুবিধা।

আন্তর্জাতিক মানের বার্ন ট্যাংক, ৪০ শয্যার আইসি ইউও, এইচ ডি ইও, আলাদা ওটি কমপ্লেক্স। এর পাশাপাশি আছে প্লাস্টিক সার্জারির আলাদা ওটি কমপ্লেক্স , উন্ড কেয়ার সেন্টার, লেজার সেন্টার, হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার। আছে ক্যাডাভারিক স্কিন ল্যাব, প্লাস্টিক সার্জনদের উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য স্কিল ল্যাব, ট্রেনিং সেন্টার। এই আঠারো তলা ইন্সটিটিউটের শীর্ষে আছে হেলিপ্যাড সুবিধা যার মাধ্যমে জরুরি

রোগীর দ্রুত পরিবহণ নিশ্চিত করা যাবে। আমি স্বপ্ন দেখি এই হেলিপ্যাড এ অদূর ভবিষ্যতে রোগী আসবে বর্হিবিশ্ব থেকে আর আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বিশ্বে। পরিপূর্ণ হবে প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্ন।

আমরা বলতে পারবো আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি বিশ্বমানের ইন্সটিটিউট। আর পরিশেষে, যেই কথা না বললেই নয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাত দিয়ে যেই পাঁচ বেডের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ আজ ২০১৮ সালে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে ৫০০ বেডের ইন্সটিটিউট রূপান্তরিত হয়েছে। এই হচ্ছে প্লাস্টিক সার্জারির "বাবার হাতে পাঁচ আর মেয়ের হাতে পাঁচশ'র গল্প" জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এ এই গল্পটা সবার জানা থাকা প্রয়োজন।

লেখক: জাতীয় সমন্বয়ক বার্ন ইউনিটসমূহ, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

# বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও গ্রামভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

## হরিদাস ঠাকুর

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারীত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন: বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি। আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহিদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।

দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা। তিনি বলেন ''ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাঁদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।' ছোটো ছোটো চাষিদের কথাও তিনি বিস্মৃত হননি। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষ্যে বেতার-টেলিভিশনে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'ছোটো

ছোটো চাষিদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষিরা কেবল আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।'

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না, সংশিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত হবে না। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বন্টন ও সরবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১ মে ১৯৭২ সালে শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি তাই বলেন:

আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদনকে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোল কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষিদের দশ কোটি টাকার তাকাবি ঋণ, এক লক্ষ নব্বই হাজার টন সার, দু'লাখ মণ বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। তিনি আরও বলেন ''আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেওয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বন্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ-আদর্শ সমাজ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দুর্নীতির কথা জানতেন-দুর্নীতিবাজদের কথা জানতেন-সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন:

আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্লাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে

হবে। ...সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘূণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। ...আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না। ...আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা। গ্রাম সমবায় গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে তার ছিল স্পষ্ট দর্শন ও মনোভাব। গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা তিনি স্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন। এ বিষয়ে এক গভীর অন্তদৃষ্টি আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাই:

কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক। ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। ...কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এবং দ্বিতীয় বিপ্লব-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। একে তিনি This is our second revolution বা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। ১৯৭৫ সালের ৬ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের অন্যান্য রাজনৈতিক দল, শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা প্রমুখকে নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল নামে একটি জাতীয় দল গঠন করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ জাতীয় ঐক্য অর্জন। এ জাতীয় দলের ১৫টি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ: [ছয়: সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিকীকরণ এবং সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ প্রচলন। ]

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে দুটি দিক ছিল-(ক) সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মসূচি এবং (খ) আর্থসামাজিক কর্মসূচি। (ক) প্রথমত ছিল সরকার-পদ্ধতির

পরিবর্তন, একটি জাতীয় দল গঠন, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা, জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে জনগণের প্রতিনিধি বা গভর্নর, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং (খ) দ্বিতীয়ত সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও ভূমিব্যবস্থাপনা, গ্রামে মাল্টিপারপাস বা বহুমুখী কো-অপারেটিভস, পল্লী অঞ্চলে 'হেলথ কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠা, পরিকল্পিত পরিবার এবং শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচিতে ৫টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এগুলো হলো: দুর্নীতি উচ্ছেদ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং জাতীয় ঐক্য।

দ্বিতীয় বিপ্লবের আওতায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছিলেন যার অন্যতম ছিল সমবায় পদ্ধতির চাষাবাদ। এসব পদক্ষেপগুলো হলো: জমির সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ; প্রতিটি থানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ; পর্যায়ক্রমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ; কৃষকদের নিকট ফার্টিলাইজার পৌঁছানো; খাল কেটে কৃষি জমিতে চাষের ব্যবস্থা। পাম্প সরবরাহ না করা পর্যন্ত বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে কিংবা কুয়া কেটে সেখান থেকে কৃষিকার্যে পানির ব্যবস্থা করা; কৃষির ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষি ও শিল্পের প্রসার। উৎপাদন ও বন্টন প্রক্রিয়ায় কৃষক ও শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা; সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ। জমির মালিকানা থাকবে এবং কিছুতেই নেওয়া হবে না, বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট তা জানিয়ে দেন। উৎপাদিত ফসলের এক অংশ জমির মালিক, একভাগ কৃষক ও এক অংশ সরকার পাবে। সমবায় হবে কম্পালসারি; গ্রামে গ্রামে ৫০০ থেকে ১০০০ পরিবার নিয়ে মাল্টিপারপাস ভিলেজ কো-অপারেটিভ, ৬৫ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে ৫ বছরে ১টি করে এরূপ বহুমুখী সমবায় স্থাপন। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি কর্মক্ষম মানুষ এর সদস্য হবে। সরকারের কাছ থেকে অর্থ, ফার্টিলাইজার, টেস্ট রিলিফের বরাদ্দ, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের বরাদ্দ তাদের কাছে যাবে। কৃষি সমবায়ের মতো এর উৎপাদিত পণ্যও জমির মালিক, কো-অপারেটিভের সদস্য ও সরকারের মধ্যে বন্টিত হবে। এরপর বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য,'আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যারা টাউট আছে, তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে।'

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালের বাজেটে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বেশকিছু অগ্রগতি সাধিত হয়। এর মধ্যে সমবায় সেক্টরের অর্জন ছিল নিম্নরূপ: ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা তাকাতি ঋণ কৃষি ব্যাংক ও সমবায়ের মাধ্যমে ১৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হয় এবং পাবনা ও ঢাকার সমবায় দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের একত্রীকরণ ও সম্প্রসারণের অগ্রগতি সমবায় কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

বঙ্গবন্ধু এমন সমবায়ের কথা ভেবেছেন যা গ্রামের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করবে, শুধু কৃষি- উৎপাদনের সঙ্গে জড়িতের নয়। সে কারণেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ছিল 'বহুমুখী' সমবায়। বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিচালনাও এসব সমবায়ের লক্ষ্য ছিল। তিনি গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় তথা গ্রামের বাইরের সব সম্পদও গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে ও প্রবাহিত করার কথা ভেবেছেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাবের পেছনে একদিকে ছিল বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অন্যদিকে ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। বঙ্গবন্ধু নিজে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন এবং বঙ্গবন্ধুর সময়কালে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাজতন্ত্রের যে মডেল বিরাজমান ছিল, তাতে কৃষিতে যৌথ চাষভিত্তিক সমবায়কেই যথাযথ বলে বিবেচনা করা হতো। দ্বিতীয় বিপ্লব এবং তার অংশ হিসেবে সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব বিবেচনা থেকেই বের করেছিলেন।

গ্রামের বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একমাত্র সমবায়কে অবলম্বন হিসেবে বঙ্গবন্ধু চিহ্নিত করেন। তিনি দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের উন্নয়নের স্বপ্ন বিনির্মাণে সমবায়ের শক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু দেখান, সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অনেকের পুঁজির সমন্বয়ে বৃহৎ বিনিয়োগ সম্ভব, যা সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। দুভার্গ্যবশত পুঁজির স্বার্থান্বেষী চক্র, দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট, দেশি-বিদেশি চক্র 'দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের' বঙ্গবন্ধুর তত্ত্ব বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। তা নাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনগণের জীবনমান আজ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে গর্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতো।

বঙ্গবন্ধুর 'সমতাবাদী বহুমুখী সমবায় গ্রাম' এর রূপরেখা বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী মহাচিন্তক। তিনি সময়ের অগ্রগামী পুরুষ ছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা উপলব্ধি করতে পারি। বর্তমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্য চাহিদা, কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা ও কৃষি যান্ত্রিকীকিকরণ, অব্যবহৃত পতিত কৃষি জমি উৎপাদনের বাইরে পড়ে থাকা-এসব সমস্যার কথা আগেই বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু 'গ্রাম সমবায় সমিতি'র পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্তমানের অনেক সমস্যার উদ্ভব হতো না বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

গ্রামের আর্থসামাজিক চিত্রে আমূল পরিবর্তন আনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্যাস। আধা সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য, সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদন উপকরণসমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রাম বাংলার দরিদ্র দীন দুঃখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু 'বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়' কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর গ্রামভিত্তিক সমবায় আন্দোলনের বর্তমান উপযোগিতা বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল একটি সময় উপযোগি (Time Driven), চাহিদা উপযোগী (Demand Dreven) ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগিতার (Situatuon Driven) নিরিখে উন্নয়নমুখী ও জনমুখী (Pro-development and Pro-people) চিন্তার আলোকে জনবান্ধব (Pro-people) কর্মযজ্ঞ। উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সব ইতিবাচক ফলাফল আমরা পেতে পারতাম তার কয়েকটি হলো: গ্রাম সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের উপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক-কৃষাণি সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্ধতিতে বর্গা প্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেত। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রদানের জন্য সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে জমির মালিকবৃন্দ, কৃষি শ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মাঝে সমানভাগে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব শুরু হতো এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো। ফসলের উদ্বৃতাংশ বিদেশে রপ্তানি করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো। দেশ অনেক আগেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো। বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারি উদ্যোগে বা ব্যক্তি মালিকানায় ছোটোখাটো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ ব্যাবসাবাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো। ব্যক্তি মালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকৃবন্দ ও দ্রব্যসামগ্রীর ক্রেতা সাধারণকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। গ্রাম সমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূল ভিত্তি। গ্রাম সমবায়ের সার্বিক ক্ষমতা থাকতো জনসাধারণের উপর। এর ফলে নেতৃত্বের বিকাশসহ জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতো। ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতো। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তো। (একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় পাকিস্তান আমলে এদেশের কৃষকের খণ্ডিত বিভিন্ন জমিতে যে পরিমাণ আইল ছিল তার পরিমাণ যোগ করলে তৎকালীন বগুড়া জেলার আয়তনের সমান হতো। এ চিত্র বর্তমানে পাল্টেনি। বরং আরও প্রকট হয়েছে জমির বিভক্তির ফলে। ) শুধু উৎপাদন নয়; বরং বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও ইতিবাচক এবং গুণগত পরিবর্তন আসতো।

লেখক- উপসচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

# সার্বজনীন পেনশন

## ড. শাহাদাৎ হোসাইন সিদ্দিকী

পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর থেকে পুরো জাতি ছিল দিগভ্রান্ত। জাতির সামনে ছিল না কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বাঙালি জাতির জন্য সম্ভাবনার এক স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করে 'দিন বদলের সনদ' নির্বাচনি ইশতেহারে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসেন। এর মাধ্যমে পুরো জাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সরকার 'রূপকল্প -২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে জনগণকে সাথে নিয়ে বাস্তবায়ন শুরু করেন। 'দিন বদলের সনদের' মূল বিষয় ছিলো ক্ষুধা দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা যার ভিত্তি হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। এই 'দিন বদলের সনদেই' সার্বজনীন পেনশনের বিষয়টি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ, মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবস্থা এর ( ঘ) "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার। "- কে বিবেচনায় নিয়ে বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় বৃদ্ধকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বজনীন পেনশনের বিষয়টি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। তখন থেকেই বিষয়টি আলোচনায় ছিলো। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে একটি ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী সার্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শ্রম বাজারের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। ২০০০ সালে দেশের মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিলো ৪ কোটি ৭ লাখ, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ মোতাবেক বর্তমানে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়স্ক মোটসংখ্যা শতকরা ৬২.১৪ শতাংশ অর্থাৎ সোয়া দশ কোটিরও বেশি। দেশে ষাটোর্ধ্ব জনসংখ্যা এক কোটিরও বেশি যা ২০৪১ সালে ৩.১ কোটি এবং ২০৬১ সালে ৫.৫৭ কোটিতে দাঁড়াবে। বর্তমানে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৭৩ বছর যা ২০৫০ সালে ৭৯.৯ বছর এবং ২০৭৫ সালে ৮৪.৩ বছর হবে। আগামী তিন দশকে মানুষের অবসর গ্রহণের পরও গড়ে ২০ বছরের বেশি আয়ু থাকবে। বর্তমানে নির্ভরশীলতার হার ৭.৭ শতাংশ, ২০৫০ সালে ২৪ শতাংশ এবং ২০৭৫ সালে ৪৮ শতাংশে উন্নীত হবে। বর্তমানে প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা এক কোটিরও বেশি, এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য

কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা না থাকায় বৃদ্ধকালে তাদের জীবনযাপনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। প্রত্যাশিত গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে ধীরে ধীরে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশে পরিবারের মাধ্যমে বয়স্ক লোকের জন্য গ্রামে যে সুরক্ষাসহ নিরাপত্তাবলয় ছিল তা ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এতে বয়োবৃদ্ধদের নিরাপত্তা দিন দিন হুমকির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের দেশে বর্তমানে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর তুলনায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশি বিধায় একটি সার্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালু করাটা এখন সময়ের দাবি।

সরকার সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন,২০২২ ইতোমধ্যে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে আইনটি পাশ হবে এমনটা দেশের মানুষের প্রত্যাশা। প্রস্তাবিত সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ২১ দিক হলোঃ(১)১৮-৫০ বছর বয়সি সব কর্মক্ষম নাগরিক সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। (২) বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীগণও এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। (৩) সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের আপাতত নতুন জাতীয় পেনশন ব্যবস্থার বাইরে রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে তাদের বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। (৪). জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে দেশের ১৮ থেকে ৫০ বসর বয়সি সব নাগরিক পেনশন হিসাব খুলতে পারবেন। (৫). প্রাথমিকভাবে এ পদ্ধতি স্বেচ্ছাধীন থাকবে,যা পরবর্তী সময়ে বাধ্যতামূলক করা হবে। (৬). ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দেওয়া সাপেক্ষে মাসিক পেনশন পাওয়ার যোগ্য হবেন। (৭). প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি আলাদা পেনশন হিসেব থাকবে, ফলে চাকরি পরিবর্তন করলেও পেনশন হিসাব অপরিবর্তিত থাকবে। (৮). সার্বজনীন পেনশন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। তবে এক্ষেত্রে কর্মী বা প্রতিষ্ঠানের চাঁদা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দিবে। (৯) মাসিক সর্বনিম্ন চাঁদার নির্ধারিত থাকবে। তবে প্রবাসী কর্মীরা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চাঁদা জমা দিতে পারবেন। (১০) সুবিধাভোগীরা বছরে ন্যূনতম বার্ষিক জমা নিশ্চিত করবেন। অন্যথায় তার হিসাব সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সময়ে বিলম্ব ফিসহ বকেয়া চাঁদা দেওয়ার মাধ্যমে হিসাব সচল করতে হবে। (১১). সুবিধাভোগীরা আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে চাঁদা হিসাবে বাড়তি অর্থ (সর্বনিম্ন ধাপের অতিরিক্ত কোন অঙ্ক) জমা দিতে পারবেন। (১২). পেনশনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অর্থাৎ ৬০ বছর পূর্তিতে পেনশন তহবিলে পুঞ্জীভূত লভ্যাংশসহ জমার বিপরীতে নির্ধারিত হারে পেনশন দেওয়া হবে। (১৩). পেনশনধারীরা আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। (১৪). নিবন্ধিত চাঁদা জমাকারী পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে জমাকারীর নমিনি বাকি সময়কালের( মূল জমাকারীর বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত) মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। (১৫). পেনশন কর্মসূচিতে জমা করা অর্থ কোন পর্যায়ে এককালীন উত্তোলনের সুযোগ থাকবে না। তবে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জমা করা অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসেবে উত্তোলন করা যাবে যা সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। (১৬). কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দেওয়ার আগে নিবন্ধিত চাঁদা দানকারী

মারা গেলে জমা করা অর্থ মুনাফাসহ তাঁর নমিনিকে ফেরত দেওয়া হবে। (১৭). পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করে কর রেয়াতের জন্য বিবেচিত হবে এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে। (১৮). এ ব্যবস্থা স্থানান্তরযোগ্য ও সহজযোগ্য অর্থাৎ কর্মীর চাকরি পরিবর্তন বা স্থান পরিবর্তন করলেও তার অবসর হিসেবে স্থিতি চাঁদা প্রদান ও অবসর সুবিধা অব্যহত থাকবে। (১৯). নিম্ন আয়সীমার নীচে নাগরিকদের ক্ষেত্রে পেনশন কর্মসূচিতে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসেবে দিতে পারে। (২০). পেনশন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সরকার নির্বাহ করবে। (২১). পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিলে জমা টাকা নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগ করবে ( সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করণে)।

পেনশনভোগীদের স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। পেনশনের উপর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টেরও ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্বজুড়ে  সাধারণত চার ধরনের পেনশন সুবিধা চালু আছে। এগুলো হলো আনফান্ডেড,ফান্ডেড,ডিফাইন্ড বেনিফিটস(ডিবি), ডিফাইন্ড কন্ট্রিবিউশনস (ডিসি)। আনফান্ডেড পেনশনে কোনো কর্মীকে চাঁদা দিতে হয় না। ফান্ডেড পেনশনে কর্মী বা প্রতিষ্ঠান বা উভয়কে চাঁদা দিতে হয়। ডিবি পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ সরকারি কর্মচারীদের জন্য। আর ডিসি পদ্ধতিতে কর্মী বা প্রতিষ্ঠান থেকে একটি তহবিলে অর্থ জমা হয় এবং সেখান থেকেই পেনশন দেওয়া হয়। ভারতে ২০০৪ সাল থেকে জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। চীনে তিন ধরনের পেনশন ব্যবস্থা চালু আছে। শহরে কর্মরতদের জন্য আরবান পেনশন সিস্টেম, সরকারি ও আধাসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সিভিল ও পাবলিক সার্ভিস পেনশন সিস্টেম এবং গ্রামের বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিতদের জন্য রুরাল পেনশন সিস্টেম চালু আছে। বৃটেনে চার ধরনের পেনশন সুবিধা চালু আছে। এগুলো হলো রাষ্ট্রীয়, পেশাগত, ব্যক্তিগত ও আনফান্ডেড। আমেরিকাতে ৯৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা আওতায় পেনশন পেয়ে থাকে। এছাড়াও চাকরি ভিত্তিক,আনফান্ডেড ও ব্যক্তিগত পেনশন ব্যবস্থা চালু আছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বাজেট থেকে সবাইকে পেনশন দেওয়া হয়। জাপান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে পেনশন ব্যবস্থা চালু আছে।

সরকার বয়স্ক ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষাকল্পে প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ সুবিধাভোগীকে সহায়তা প্রদান করছে। শুধু বয়স্ক ভাতা হিসেবে ৫৭ লাখেরও বেশি উপকারভোগীকে মাসিক ৫ শত টাকা হারে প্রদান করা হচ্ছে। তবে এটা ঠিক এভাতা বয়স্কদের জন্য যথেষ্ট নয়। সার্বজনীন পেনশন চালু হলে এ সমস্যার সমাধান অনেকাংশে হয়ে যাবে। সার্বজনীন পেনশন  একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের  চমৎকার উদ্যোগ। জাতর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উপহার সার্বজনীন পেনশন।

লেখক: অর্থনীতিবিদ

# উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ

## মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আজ বিশ্বের বিস্ময় বাংলাদেশ। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মুখে শোনা যায় আজ বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা। সম্ভাবনার এ স্বর্ণদুয়ার উন্মোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হয়ে ওঠেন অতীতের ঐতিহ্য সুরক্ষা, বর্তমানের সফল পথচলা এবং ভবিষ্যতে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অকুতোভয় ও বিশ্বস্ত কান্ডারি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন অভিযাত্রায় একের পর এক লক্ষ্য অর্জনের সফলতা দেশের অগ্রযাত্রায় এক একটি মাইল ফলক। এ যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছি আকাশ পানে চেয়ে"।

প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে সরকার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৈষম্য দূর করে একটি পক্ষপাতমুক্ত ন্যায় ভিত্তিক মানবিক সমাজ বিনির্মানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে সরকার দারিদ্র্যমোচন, সার্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তাসহ দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করে ২০৩০ এ এসডিজি এবং ২০৪১ এ দারিদ্র্য শূন্য উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে। সরকার ইতোমধ্যে মানবিক উন্নয়ন সূচকে টেকসই ক্রমোন্নতিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে,যা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রসংশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে পদ্মা সেতুসহ অনেকগুলো বড়ো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর সুবিধা জনগণ পাচ্ছে। এ সেতুর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতকে সহজ করার লক্ষ্যে অনেকগুলো বড়ো বড়ো নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেগুলো পর্যায়ক্রমে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে এবং হবে। আগামী অক্টোবর মাসে দেশের প্রথম ছয় লেনের কালনা সেতু উদ্বোদন করা হবে। আগামী ডিসেম্বরে বহু কাঙ্ক্ষিত কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য উদ্‌বোধনের কথা রয়েছে। ঢাকায় মেট্রোরেল নগরবাসিদের জন্য ডিসেম্বরে উন্মুক্ত করার সময় নির্ধারিত আছে। এছাড়াও এমন কোনো জেলা উপজেলা নেই যেখানে সড়ক, মহাসড়ক, ব্রিজ,কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে না। সরকার দেশের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে জনগণের সময় বাঁচিয়ে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ২৬ টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮১ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। স্বাবলম্বী, উদ্যামী যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে

নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুসারে বাংলাদেশের ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম জনবলের (৫৯ বছর পর্যন্ত) সংখ্যা ১০ কোটি ২৬ লাখেরও বেশি। এর মধ্যে পুরুষ ৫ কোটি ০৯ লাখেরও বেশি এবং মহিলা ৫ কোটি ১৭ লাখেরও বেশি। এ বিপুল জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ,যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজ কল্যাণ,মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে।

সরকার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ,সংরক্ষণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করেছে এবং করছে। পুষ্টি বৈষম্য দূর করার জন্য নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নাগরিকের সুস্বাস্থ্য এবং সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ' স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের কৌশলপত্র ২০১২-২০৩২' প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রের আলোকে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের চিকিৎসা সেবার অর্থায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে ' স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে) প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পাইলট প্রকল্পের আওতায় কার্ডধারী প্রতিটি পরিবার হাসপাতালে আন্তঃ বিভাগীয় সেবা গ্রহণকালে ৭৮ টি রোগের জন্য রোগ নির্ণয় ও ঔষধসহ যাবতীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২২ হাজারেরও বেশি সদস্য এ সেবা গ্রহণ করেছে। ক্রমান্বয়ে কর্মসূচিটি সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে। নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার, ২০১৮ এর অঙ্গীকার অনুযায়ী শহরের সকল সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ' আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪৪ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা ব্যয় করবে। পরিবেশ সুরক্ষার অপরিসীম গুরুত্বকে বিবেচনা করে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাস্তবসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করেছে। সরকার জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে এ বিনিয়োগের অর্থায়ন করা হবে। জাতির পিতা সংবিধানের ১৫(ঘ)অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সমাজিক সুরক্ষা বিধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল সেটা এখন বর্তমান সরকারের আমলে জীবনচক্রনির্ভর ব্যাপক কর্মসূচিতে

রূপান্তরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৯ শতাংশ পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সমাজের দুর্বল অংশগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য দুর্যোগ প্রবণ এলাকা,দরিদ্রতম এলাকা এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের অনুপাতের মতো বিষয়গুলি বর্তমানে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণে সরকার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই মহাপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণে আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা পূরণের জন্য ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং হবে। দেশে এখন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে। সরকার দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও ভূমিহীন দরিদ্র মানুষকে আশ্রায়ণ প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে জমির মালিকানাসহ বসবাসের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে এটি একটি চলমান কার্যক্রম।

সরকারের নীতি হচ্ছে ' সমগ্র সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি' গ্রহণ যাতে কেউ পিছিয়ে না পড়ে। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও যুবাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান যাতে তারা দেশের মূল অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য মুক্ত সোনার বাংলাদেশ নির্মাণে উন্নত জাতি গঠনই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য।

লেখক : রেক্টর, বিপিএটিসি

# Dangerous Drug LSD

**Dr. Sabbir Harun**

LSD (Lysergic acid diethylamide) is a semi-synthetic hallucinogenic drug. It is manufactured from lysergic acid which is found in the ergot fungus that grows on ray and other grains and a non-organic chemical called diethylamide. LSD is also referred to as acid.

LSD is produced is crystalline form and then mixed with other inactive ingredients or diluted as a liquid for production in ingestible forms. It is colorless, odorless, water soluble and has a slightly bitter taste. LSD is most often taken orally. It is usually diluted with other materials. Solutions of LSD in water or alcohol are occasionally encountered. LSD is light sensitive in solution, but more stable in dosage units.

LSD produces tolerance, meaning the user needs greater doses of LSD to get the same high. Some users who take the drug repeatedly must take progressively higher doses to achieve the state of intoxication that they had previously achieved. This is an extremely dangerous practice, given the unpredictability of the drug.

While searching for medically useful ergot alkaloid derivatives at the Sandoz Laboratories in Basel, Switzerland, LSD was first synthesized by Albert Hofmann on 16 November, 1938. He discovered its hallucinogenic properties in 1943.Sandoz Laboratories introduced LSD as a psychiatric drug in 1947 and marketed LSD as a cure for schizophrenia, criminal behaviour, sexual perversions and alcoholism. It was listed as a schedule 1 controlled substance in the Conventions on Psychotropic substances, 1971 by UN.

LSD is so potent. A very small amount, equivalent to two grains of salt, is sufficient to produce the drugÕs effects. It is taken orally as capsules, pills, sugar cubes, chewing gum or liquid drops transferred to colorful blotter paper. Its doses tend to be in the microgram range. Recreational dosage averages between 25 to 80 micrograms. The physical effects of LSD are unpredictable from person to person. Usually, the first effects of the drug when taken by mouth are felt 30 to 45 minutes after taking it, peak at 2 to 4 hours and may last 12 hours or longer. Its effects, often called a ‘trip’ can be stimulating, pleasurable and mind-altering or it can lead to an unpleasant, acute and disturbing psychological effects are known as a ‘bad trip’. A ‘bad trip’ is similar to psychosis and the person cannot escape from it. There may be extreme fear, paranoia a separation from self and the person may believe that they are dzing or in hell.

The experiences are lengthy with the effects of higher doses lasting for 6 to 12 hours and it may take 24 hours to return to a normal state. If a large amount of LSD is taken the following negative effects are more likely to happen paranoia, increased risk taking, psychosis.LSD may not be particularly physically addictive but that doesn‘t mean it isn’t dangerous. The effects of LSD can last far beyond the initial. LSD can trigger a range of perceptual changes. Visual effects include brightened, vivid color, blurred vision, distorted shapes and colors of objects and faces and halos of light. Changes related to touch include shaking, pressure and lightheadedness. Mood changes can lead to a sense of euphoria, bliss, peacefulness, dreaminess and heightened awareness or despair, anxiety and confusion.

Thinking: Impact on thinking can lead to a distorted perception of time, either fast or slow accelerated thoughts, unusual insight and a sense of transcendence. Sensations may seem to ‘cross over’ giving the feeling of hearing colors and seeing sounds. These changes can be frightening and can cause panic. Some LSD users also experience severe, terrifying thoughts and feelings, fear of losing control, and fear of insanity or death.

There is no known cure for HPPD, but a number of medications have been used to manage HPPD symptoms. The following medications have shown varying levels of success in managing HPPD symptoms: This drug is used for treating anxiety disorder and seizures. Atypical antipsychotics drugs are typically used to treat schizophrenia, irritability from autism and bipolar disorder. Clonidine is often used for treating high blood pressure, cancer pain and attention deficit hyperactivity disorder. This drug blocks or minimizes opioids substances that act on the nervous system similarly to morphine and is usually used to treat alcohol and opioid dependence.

Effective doses of LSD are often exceedingly small-on the order of millionths of a gram. Though the profound perceptual changes that LSD brings about may place the user at risk of indirect bodily harm or injury, in most cases of mild to moderate intake the long-term effects of LSD involve the brain and psyche rather than the bodz. An experience with LSD is referred to as a ‘trip’. Acute, disturbing psychological effects are known as a ‘bad trip’. These experiences are lengthy, with the effects of higher doses lasting for 6 to 12 hours, and it may take 24 hours to return to a normal state. Regularly LSD use can lead to long-term effects include: Flashback- Flashback which is known as hallucinogen persisting perception disorder (HPPD) can happen weeks, months or even years after the drug was last taken. While some flashbacks may be amusing, colorful, and even pleasant, hallucinogen persisting perception disorder

(HPPD) can be a dangerous and frightening condition. Individuals with hallucinogen persisting perception disorder experience intermittent or chronic flashbacks that cause distress or impairment in life and work.

Experimenting with LSD and other drugs is often considered to be a rite of passage among teenagers and young adults. Older adults may use LSD occasionally to experience its hallucinatory effects, to achieve a quasi-religious state of exaltation or to escape their own reality. But the unpredictable effects of LSD make the drug dangerous to anyone who takes it even on a recreational basis.

Writer : Doctor

# প্রতিনিয়ত কি যেন সরিয়ে ফেলা হচ্ছে

## ইলিয়াস কাঞ্চন

প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় অমূল্য জীবন হারাচ্ছে মানুষ। আর গণমাধ্যমের (প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া) বিশেষ একটা অংশ জুড়ে প্রতিদিনই থাকে এই সড়ক দুর্ঘটনার খবর এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী হাহাকারের চিত্র। প্রতিটি দুর্ঘটনার পরই বলা হচ্ছে আমাদের দেশের রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। যে কারণে সড়কে এই অপমৃত্যুর মিছিল থামানো যাচ্ছে না। তাহলে কী আমরা নিরাপদ সড়ক ও যাতায়াত সুরক্ষায় আন্তরিক নই? এক্ষেত্রে কী কী করণীয় তা নিয়ে কি কেউ ভাববার নেই? প্রশ্নগুলো আমাকেও তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রশ্ন আর প্রশ্ন- এরকম প্রশ্ন গণমাধ্যম থেকে সকল মহলের। নিরাপদ সড়ক চাই- এই সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে সড়ক দুর্ঘটনারোধে কাজ করে যাচ্ছি আমরা। আমাদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে সড়ক দুর্ঘটনা নিরসনে এবং রাস্তায় শৃঙ্খলা ফেরাতে এখনো যথেষ্ট আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা মানুষকে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছি, মানুষ সচেতনও হচ্ছে কিন্তু কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন না আসাতে এই সচেতনতার কোনো প্রভাব পড়ছে না সড়কের উপর। কারণ আমাদের সড়কের ব্যবস্থাপনা ও সদিচ্ছার জায়গাটাতে ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ঘাটতি পূরণে আমি ২৯ বছর ধরে নানাভাবে বলে আসছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমার পর্যবেক্ষণে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে আছে সেটা হলো সদিচ্ছার অভাব। কোনো একটা মহল এই সদিচ্ছাকে পেছন থেকে টেনে ধরে আছে। যে কারণে সড়ক ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে কাজে লাগছে না।

সড়কের এই ব্যবস্থাপনা নিয়ে কিছু বলতে চাই। সড়ক দুর্ঘটনার উপর জাতিসংঘ যে পাঁচটি পিলারের কথা বলেছে, তার মধ্যে প্রধান হলো সড়কের ব্যবস্থাপনা। আর আমার মতে যে কোনো ব্যবস্থাপনা তখনই সঠিক দিকনির্দেশনায় রূপ নেয় যদি আন্তরিক সদিচ্ছা থাকে। আপনাকে আগে টার্গেট বা লক্ষ্য স্থির করতে হবে, তারপর সেই টার্গেটে উপনীত হতে কী কী করা লাগবে তা ছক অনুযায়ী সাজাতে হবে, সর্বোপরি আন্তরিকতা বা সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে। যেমন আমার স্ত্রী সড়কের অপঘাতে প্রাণ হারানোর পর আমি নিজের সাথে বোঝাপড়া করে এই সামাজিক আন্দোলনের ডাক দেই। আমার লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষকে সড়কের অপঘাতে যেন আর প্রাণ না হারাতে হয় তার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা, সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো এবং নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠা করা। আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে আমিতো আমার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারিনি। আমি তো ইলিয়াস কাঞ্চন হয়েছি এদেশের মানুষের জন্য তাদের ভালোবাসায়। তাদের প্রতি তো আমার কিছু দায়িত্ব আছে। আমার স্ত্রী একাতো মারা যাচ্ছে না। প্রতিদিন সড়কে অনেকে মারা যাচ্ছে। কিন্তু আমি যদি চেষ্টা করি তাহলে আমার এই দেশের মানুষগুলোকে আমি বাঁচাতে পারবো। এই

টার্গেট নিয়ে যখন আমি রাস্তায় নামলাম তখন আমাকে বলা হলো আপনি কিন্তু হিরো থেকে জিরো হয়ে যাবেন। কিন্তু তখনো আমার মনোভাব ছিলো আমি যে মানুষের ভালোবাসায় হিরো হয়েছি সেখানে আমার কোনো কিছু হয়ে গেলে হিরো থেকে জিরো হলেও আমার কিছু যায় আসে না। আপনারা জানেন আমি আমার টার্গেট অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং এখনও আমি পথেই আছি। কিন্তু আজও যখন দেখি সড়কে মৃত্যুর মিছিল চলছে তারই আলোকে আমি মনে করি আমাদের সকলের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে সড়কের নিরাপত্তা বলয় তৈরিতে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

আমি মনে করি যে কাজটি করবেন তা সম্পন্ন করতে কী কী প্রয়োজন এবং করণীয় তা নিরূপণ করতে হবে। এখানে কোনো একটা বিষয় এর ব্যত্যয় হলে কাজটি যে উদ্দেশ্যে করা সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার মতে যে কোনো ব্যবস্থাপনায় যদি টার্গেট বা প্রত্যাশা না থাকে তাহলে ব্যবস্থাপনা বা পরিকল্পনা দুর্বল হবে। রোড সেইফটির বেলায়ও আমি এই কথাটিই বোঝাতে চাচ্ছি। লক্ষ্য থাকতে হবে যে রোড সেফটিকে নিশ্চিত করতে হবে। জাতিসংঘের যে পাঁচটি পিলার আছে সে পাঁচটি পিলারকে ম্যানেজমেন্টের আওতায় আনতে হবে এবং পলিসি নির্ধারণ করতে হবে। মোটকথা সব কিছু ম্যানেজম্যান্টের ভেতর থাকতে হবে। এখানে কোনো একটির অভাব থাকলে কিন্তু হবে না। সকল সফলতা বা সুফলের পেছনে শক্তিশালী মনোভাবই অন্যতম কারণ। উদাহরণ হিসেবে আমাদের পদ্মা সেতুর কথা বলতে পারি। এই সেতু নির্মাণে বিদেশীরা যখন অর্থায়ন করবে না জানিয়ে দেয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কঠিন ও কঠোর মনোভাবে ঘোষণা করেছেন নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছে ও শক্তিশালী মনোভাবের কারণে আমরা পদ্মা সেতু পেয়েছি। সড়কের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আমি সকল পরিকল্পনায় এই মনোভাবের কথাই বোঝাতে চাচ্ছি।

কথাটি বলতে হচ্ছে এ জন্য এ পর্যন্ত যতগুলো পরিকল্পনা করা হয়েছে তা কী কোনো কাজে এসেছে? সড়কের বিশৃঙ্খলা কী দূর হয়েছে? আমি মনে করি সত্যিকার অর্থে আমারা যদি মনে করি আমার দেশের মানুষগুলোকে একটা নিরাপদ সড়ক উপহার দিতে হবে তাহলে এই যে সড়কে মানুষ মারা যাচ্ছে, সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জিডিপি লস হচ্ছে- এসমস্ত বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। তার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক এবং সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা। কারণ এই কাজ করতে গিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি আসবে সেগুলো কীভাবে ওভারকাম করা যায় সেটাও পরিকল্পনার মধ্যে রেখেই কিন্তু এগুতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা নিরসনে নীতিগতভাবে সর্বপ্রথম বিশৃঙ্খলাকে দূর করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সকল অপশক্তির কালো হাত। আর এটা নিয়ন্ত্রণ করা আসলে কঠিন কোনো বিষয় নয়।

সর্বশেষে বলবো সড়কের নিরাপত্তায় জাতিসংঘ একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছে। পাঁচটা পিলার দিয়েছে। প্রত্যেকটাতে কিন্তু টার্গেট অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সড়কের নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি স্টেপই গুরুত্বপূর্ণ। সেইসাথে রোড সেফটি নিয়ে আমরা যারা কাজ করছি আমরা ১১১টা সাজেশন দিয়েছি। প্রতিটি সাজেশনকে পরিকল্পনার মধ্যে ফেলে বাস্তবায়নের জন্য সাজাতে হবে এবং কার্যকর করতে হবে। পাশাপাশি সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮- এর পরিপূর্ণ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এই আইনের বিধিমালা চূড়ান্ত করতে হবে। এই বিধিমালার জন্য আইনটি এক প্রকার অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে। অথচ এমন কিছু সমস্যা আছে আইন ছাড়া নিরসন করা অসম্ভব।

অনেকেই ধানের খোলায় বা গোলায় মুরগিকে ধান খেতে দেখেছেন। দেখা গেছে ধান খাবার সময় মুরগি পা দিয়ে কী যেন সরায়। কী সরায় তা আমরা জানি না বা বোঝার চেষ্টাও করিনি। ঠিক সড়ক দুর্ঘটনা নিরসনে নানা পরিকল্পনা হয় কিন্তু বাস্তবায়নের বেলায় দেখা যায় কী যেন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কথাটা এইজন্য বলা একটি আইন পাশ হয়েছে অথচ বিধিমালা করা হয়নি। এই বিধিমালার জন্য চারবছর অপেক্ষার পরও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না কবে আমরা বিধিমালা পাবো। তাহলে বলতে হয়, মুরগির সেই কী যেন সরিয়ে ফেলার মতই বিধিমালাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। একটি নতুন আইন কার্যকর করতে বাস্তবায়নকারী সকল স্টেকহোল্ডারকে আইনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করতে হয়। এমনকী প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের তৈরি করতে হয়। সড়ক পরিবহণ আইনের পাশাপাশি সেই বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে পুরোপুরি তৈরি করতে হবে। সবশেষে বলবো, এই মুহূর্তের করণীয় হচ্ছে যে আইন আছে তার বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিআরটিএ-কে আইন প্রয়োগের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। অন্তত আইনটি সড়কে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হলে দুর্ঘটনা আমরা অনেকাংশে রোধ করতে পারবো।

লেখক: জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা এবং প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)

# বাংলাদেশের ক্রীড়ার বর্তমান অবস্থা, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সুপারিশ

**নাজমুল আবেদিন ফাহিম**

স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সবচাইতে লক্ষণীয় যে পরিবর্তনটি পরিলক্ষিত হয়েছে তা হচ্ছে খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের আগ্রহ, যুবসমাজের খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে সফলতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। দেশের মানুষ এখন কেবল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাকে কিংবা জাতীয় দলের তুলনামূলক ভালো খেলার সক্ষমতাকে যথেষ্ট মনে করে না, এখন সবাই সফলতা চায়, চায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় পতাকার সগৌরব উপস্থিতি। আর তাই আমরা দেখতে পাই বাবা মা'র হাত ধরে শিশু, কিশোর বা কিশোরীদের খেলার মাঠে সরব উপস্থিতি, ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবার পাশপাশি সন্তান খেলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে তাতেও অভিভাবকের সস্নেহে সম্মতি। আমাদের অগোচরেই ধীরে ধীরে খেলাধুলা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে, দৈনিক পত্রিকার দুই পাতা জুড়ে থাকছে এর খবর এমনকি শুধু খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে স্পোর্টস চ্যানেল। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের কারণে বর্তমান সময়ের একজন সফল ক্রীড়াবিদের গ্রহণযোগ্যতা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থানও এখন অন্য যে কোনো পেশায় সফল মানুষদের সমতুল্য বা ক্ষেত্র বিশেষে বেশিও। আর তাই একজন সাকিব আল হাসান, একজন সাবিনা খাতুন, একজন রোমান সানা কিংবা একজন সিদ্দিকুর রহমান আজ সমাজে এতটা সমাদৃত, সম্মানিত। একথা সত্যি যে ছেলেদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি যতোটা সহজ ছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে ততোটা নয়। কিন্তু দিন শেষে মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেনি। ক্রিকেটে আমাদের মেয়েদের এশিয়া কাপ জয় কিংবা নারী ফুটবলে নিজেদের যোগ্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং এই সফলতাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস উন্মাদনা একথাই প্রমাণ করে। ভারোত্তোলনে মাবিয়া আক্তার এর এস এ গেমস এ অশ্রুসজল চোখে স্বর্ণপদক গ্রহণের সেই দৃশ্য আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি কিংবা অতি সম্প্রতি আরচারিতে দিয়া সিদ্দিকীর বিশ্ব অলিম্পিকে অত্যন্ত সম্মানজনক অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের আরও সুন্দর ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের যত অর্জন তার পেছনে ক্রীড়াবিদ, সংগঠক বা সমর্থকদের অবদান অনস্বীকার্য এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানও স্পন্সর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে, কিন্তু তারপরও এর অন্যতম

চালিকাশক্তি হিসেবে আমরা সরকারকেই দেখতে পাই। কয়েকটি খেলা বাদ দিলে বাকি প্রায় সব খেলাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ফেডারেশন এবং সংগঠনের মাধ্যমে আয়োজিত প্রতিযোগিতা, খেলোয়াড় বাছাই, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনাসহ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ভার সরকারই বহন করে থাকে। এছাড়া ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রেও সরকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান অর্থবছরেও বরাদ্দকৃত বাজেটের একটি বড়ো অংশ ব্যয় হবে বিভাগীয় পর্যায়ে আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমনেশিয়াম, সুইমিংপুল এবং উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ বাবদ। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অধীনস্থ 'জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ' এই স্থাপনাসমূহ নির্মাণের ক্ষেত্রে এবং 'ক্রীড়া পরিদপ্তর' তৃণমূল পর্যায় থেকে বিভিন্ন খেলা আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সরকারের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে একটি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে দেশে বিদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এটিকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে একটি মডেল হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে অনুরূপ আরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করে দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেধাবী খেলোয়াড়দের জন্য আধুনিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বর্তমানে প্রধান কেন্দ্র ঢাকাসহ সারা দেশব্যাপী ছয়টি কেন্দ্র রয়েছে এবং ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে আরও দুটি নতুন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। বলাই বাহুল্য বিকেএসপি পরিচালনার সার্বিক ব্যয়ভারও সরকারই বহন করে। তবে সরকারের ক্রীড়া কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র বাজেট প্রণয়ন, ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ বা বিভিন্ন সংগঠন কে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমরা বারবার দেশের ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কে দেখেছি অধীর আগ্রহ নিয়ে দর্শকদের সারিতে অবস্থান নিতে, ক্রীড়াবিদদের সফলতা বা ব্যর্থতায় তাদের পাশে দাড়াতে। দেখেছি সহানুভূতিশীল প্রধানমন্ত্রী কে দুঃস্থ আথবা অসুস্থ ক্রীড়াবিদদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কিংবা যে কোনো ইতিবাচক অর্জনকেই স্বীকৃতি দিতে, দু হাত ভরে পুরস্কৃত করতে। এ বছর থেকে 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার' এর পাশপাশি 'শেখ কামাল ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার' এর সংযোজন সরকারের ক্রীড়া প্রীতিরই পরিচায়ক। খেলাধুলার প্রতি রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্ব প্রদান সামগ্রিকভাবে একটি ইতিবাচক ক্রীড়া আবহ তৈরিতে এবং সমাজে ক্রীড়া এবং ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট সকল কে আরও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা,অর্থনীতি এই সবের পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতাকেও বর্তমান যুগে একটি আধুনিক ও সফল রাষ্ট্রের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আজ যেমন সমাদৃত ঠিক তার পাশাপাশি আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে ক্রিকেটের ভূমিকাও অনুরূপ। পৃথিবীর অনেক দেশকেই

আমরা চিনি বা জানি কেবল ক্রীড়া ক্ষেত্রে সফলতার জন্য, সেই দেশ উন্নত কিংবা অনুন্নত কি না সেই বিবেচনায় নয়। শুধু তাই নয়, ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমাদের নারী ক্রীড়াবিদের এই যে সফলতা তা কেবলমাত্র খেলাধুলায় আমাদের মেয়েদের উন্নতির কথাই বলে না পাশাপাশি আমাদের সমাজে মেয়েরা যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন কি খেলাধুলার মতো একটি জটিল বিষয়েও পুরুষদের পাশাপাশি সমান তালে এগিয়ে চলেছে এবং সব বিষয়ে তারা যে সমান অংশীদার, সেই বার্তাও দেয়। এটি অত্যন্ত সম্মানজনক এবং অনুকরণীয়। শুধু দেশের ভাবমূর্তি নয় দুটি দেশের মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনে অথবা চলমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনকে ব্যাবহারের নজির রয়েছে। তবে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে সফলতাই খেলাধুলায় অংশগ্রহণের বা খেলাধুলাকে পৃষ্ঠপোষকতার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর পাশাপাশি শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী তৈরি করার ক্ষেত্রেও ক্রীড়ার ভূমিকা অপরিসীম। কিশোর এবং যুব সমাজকে মাদক বা সন্ত্রাসমুক্ত রাখা, তাদের নৈতিক স্খলনের হাত থেকে রক্ষা করে সমাজিক এবং মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। আর তাই আমাদের তরুণ সমাজকে ক্রীড়ামুখী করার ব্যপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা আমাদের সরকার প্রধানকে বারবার বলতে শুনি। যে উদ্যোগের অংশ হিসেবে খেলাধুলাকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশব্যাপী ক্রীড়া সুবিধাদি নির্মাণসহ বিভিন্ন ক্রীড়া কার্যক্রম চলমান।

বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ক্রীড়া ক্ষেত্রে আরও সুনাম অর্জনের স্বপ্ন দেখতেই পারে। তবে এইজন্য যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে দীর্ঘ পরিকল্পনা। এই ক্ষেত্রে প্রথমেই সম্ভাবনাময় খেলাগুলিকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি। দুই একটি খেলা বাদ দিলে নিকট ভবিষ্যতে দলীয় খেলায় সফলতার সম্ভাবনা খুব একটা নেই বললেই চলে আর সেই কারণেই সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকেন্দ্রিক কয়েকটি খেলাকে ঘিরে পরিকল্পনা সাজানো প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ আর তাই নির্দিষ্ট কয়েকটি খেলায় মনযোগী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত এবং সেই অনুযায়ী বিনিয়োগ হওয়া জরুরি। এই বিনিয়োগ অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত খেলাসমূহের ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ থেকে শুরু করে মানসম্পন্ন অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের আয়োজনসহ আন্তর্জাতিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানো, সব ব্যাপারেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ক্রীড়া সামগ্রীর সহজলভ্যতা শিশু কিশোরদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমদানি নির্ভর হওয়ায় আমাদের দেশে ক্রীড়াসামগ্রীর মূল্য আশেপাশের দেশের তুলনায় অনেক বেশি। জনপ্রিয় খেলাগুলির ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রযোজ্য। এর ফলে ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক কারণে খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হওয়া আথবা তুলনামূলক স্বল্প মূল্যের এবং নিম্ন মানের ক্রীড়াসামগ্রীর ব্যবহার, এটিই হচ্ছে আমাদের খেলার

মাঠের দৈনন্দিন চিত্র। এর ফলে 'বেইস ক্রিয়েশন কনসেপ্ট' টি দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইলে প্রথমত আমদানিকৃত ক্রীড়াসামগ্রীর উপর থেকে ট্যক্স কমানোর ব্যপারটি ভেবে দেখা যেতে পারে এবং তার পাশাপাশি সাধারণ মানের ক্রীড়া উপকরণ আমরা দেশীয়ভাবে প্রস্তুত করতে পারি কি না তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। শিশু, কিশোর এমনকি যুবকদেরও একটি বড়ো অংশ এই মানের ক্রীড়াসামগ্রী ব্যবহারে অভ্যস্ত। আমরা যদি আপাতত সাধারণ থেকে মধ্যম মানের ক্রীড়া উপকরণ প্রস্তুতিতেও সক্ষম হই তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের খেলার মাঠের চিত্র বদলে যাবার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হওয়া এবং নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হবার ব্যপারটি তো আছেই। তবে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হচ্ছে প্রান্তিক পর্যায় থেকে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন নিশ্চিত করা। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম আয়োজন বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। সত্যিকার মেধাবীরা যেন রাষ্ট্রের এই বিনিয়গের সুফল পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এখানে সততা ও সচ্ছতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র যেন তার সবচাইতে মেধাবী সন্তানদের সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

খেলাধুলা একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় তাই এই সংক্রান্ত সব প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান যৌক্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং স্বভাবতই এখানে আবেগ প্রসূত সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই। আর তাই, একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ অর্থাৎ নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে সংগঠক, কোচ, ফিটনেস ট্রেইনার, ফিজিও, আম্পায়ার, রেফেরি, মাঠকর্মী আথবা ক্রীড়া বিজ্ঞানী প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে যোগ্য থেকে যোগ্যতর হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে সেইটিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন একটি এডুকেশন প্যনেলের মাধ্যমে এই কাজের তদারকি করতে পারে। এর পাশাপাশি আমাদের সার্বিক ক্রীড়া কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি রিসার্চ সেল গঠন করাও জরুরি। এর মাধ্যমে আমাদের ক্রীড়া সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার সুযোগ তৈরি হবে।

খেলাধুলাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাকে পুঁজি করে ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট সবাই যদি সততা এবং সচ্ছতার সাথে সার্বিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনায় এগিয়ে আসে তাহলে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে কোনো একদিন বিশ্বকাপ কিংবা অলিম্পিক পদক জয় নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যেই লাখ শহিদের ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের আত্মপরিচয়ের সুযোগ পেলাম এবং পেলাম একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, তাদের এইটুকু প্রতিদান তো আমরা দিতেই পারি।

লেখক: জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাবেক ক্রীড়াবিদ।

# শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান

## নাসিমুন আরা হক (মিনু)

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর, শেখ হাসিনার জন্মদিন। কোটি মানুষের মত আমারও আনন্দের দিন। আমার জন্য আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন। কারণ আজ থেকে ৬২ বছর আগে তাঁর সঙ্গে আমার আজিমপুর স্কুলে (বর্তমানে আজিমপুর গভমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ) প্রথম দেখা। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, যা আজও অটুট রয়েছে। জীবন সায়হ্নে এসে অতীতের দিকে ফিরে তাকালে স্মৃতি বিজড়িত সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। বয়স যত বাড়তে থাকে ছেলেবেলার স্মৃতি তত মনে ভিড় করে। সেই স্মৃতির সঙ্গে ভিড় করে আমার আজিমপুর স্কুল ও স্কুলের বন্ধুদের স্মৃতি। আমরা আজিমপুর গভর্নমেন্ট স্টাফ কোয়ার্টারে আসি ১৯৫৮ সালে। তারপরই আমি আজিমপুর স্কুলে ক্লাস ফোরে ভর্তি হই।

স্কুল কাছে হওয়ায় আমরা কখনও দলবেঁধে, কখনও একা হেঁটেই স্কুলে চলে যেতাম। স্কুলের সামনে বিশাল মাঠ। সেটা ছিল আমাদের প্রধান আকর্ষণ। অবশ্য আজিমপুরে সব বাড়ির সামনেই ছিল বড়ো বড়ো মাঠ। বন্ধুরা তখন যেমন ছিল তেমনি এখনও আমাকে ভীষণ টানে। আজকাল স্কুলের বন্ধুদের কোনো পুনর্মিলনী থাকলে সব প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে হাজির হয়ে যাই। কখনও মিস করি না। আমাদের বন্ধুদের অধিকাংশই নিজ নিজ পেশায় খুব সফল হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সফল, সার্থক হয়েছেন শেখ হাসিনা। হ্যাঁ, আমি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা বলছি। শেখ হাসিনা আজিমপুর গার্লস হাইস্কুলে আসেন সম্ভবত ক্লাস সিক্সে। তার আগে ছিল নারী শিক্ষা মন্দিরে। স্কুলের দিনগুলো আমাদের কেটেছে পড়াশোনার পাশাপাশি গল্পের বই পড়ে, আড্ডা দিয়ে আর দুষ্টুমি করে। হাসিনা সে-সময় অনেক দুরন্ত ছিলেন। টিফিনের সময় স্কুলের মাঠে বসে দল বেঁধে আড্ডা দেওয়া ছিল আমাদের কাজ। আমার মনে পড়ে '৬৬ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ডাকে আমরা একদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে মিছিলে চলে গিয়েছিলাম।

সামরিক শাসক আইয়ুব খান দেশে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেছিল। আমাদের 'সমাজপাঠ' নামে একটি বইতে এসব পড়তে হতো। ক্লাস নাইনে সমাজপাঠ পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে হাসিনা 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র কঠোর সমালোচনা করে অনেক কিছু লিখে দিয়েছিলেন। হাসিনা যে খুবই দৃঢ়চেতা ছিলেন এ তারই প্রমাণ। স্কুল থেকে খবর পেয়ে পরে তার গৃহশিক্ষককে এসে স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল। স্কুলের আরও স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে, '৬৪ সালে আমাদের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল স্কুলে ধর্মঘট করানোর ও পিকেটিং করার। '৬২-র শিক্ষা আন্দোলনের স্মরণে ঐ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল। আমরা স্কুলের সামনে পিকেটিং করেছিলাম। ছাত্রীদের বলেছিলাম আজ স্কুলে ধর্মঘট, তোমরা ফিরে যাও। ছাত্রীরা অবশ্য আমাদের কথা শোনেনি। আমরা সফল হইনি। তবে

স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টা ভালোভাবে নেয়নি। শেখ হাসিনা, আমি নাসিমুন আরা হক (মিনু), সুলতানা কামাল (লুলু), কাজল, হোসনে আরা বেগম (হেলেন)-সহ আমাদের মোট ১০ জনকে স্কুল কর্তৃপক্ষ শোকজ করেছিল। বাকিদের সকলের নাম এখন আর মনে নেই।

১৯৬৫ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম পূরণ ইত্যাদি কাজে একদিন স্কুলে গিয়েছি। সে-সময় হাসিনা হঠাৎ বলল, চল সবাই আমাদের বাড়িতে যাই। ওর ভেতরে এমন স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তরিকতা ছিল। আমরা সাতজন হাসি, বেবী, হেলেন, বুড়ি, মর্জিনা ও আমি হাসিনার সঙ্গে ওদের বাড়ি গেলাম, ৩২ নম্বরে। দুপুরে সেখানে ভাত খেলাম। বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব আমাদের পরিবেশন করে খাওয়ালেন। শেখ রাসেল তখন ছোট্ট শিশু। বিছানায় শোয়া ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পরে ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বেগম মুজিব ও শিশু রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল দুর্বৃত্তরা। সেদিন আমরা অনেক আড্ডা দিলাম, ছাদে ও বাগানে বেড়ালাম। ছাদে হাসিনা ওর কাকার ক্যামেরায় আমাদের ছবি তুলল। সে ছবি আমার কাছে এখনও আছে। এসএসসির পর আমাদের স্কুল পর্ব শেষ হলো। আমরা ভর্তি হলাম বকশীবাজারে গভ. ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজে (বর্তমান বদরুন্নেসা কলেজ)। এখানে শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো। আমি ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে। আমরা পুরোপুরি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়লাম।

তখন ছিল আইউব-বিরোধী তথা সামরিক শাসনবিরোধী উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের সময়। আমি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৫-৬৬) নির্বাচিত হই। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ছাত্রলীগের সাঈদা গাফফার। তখন কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন খুবই শক্তিশালী ছিল। আমাদের সময়ে আমরা কলেজে শহিদ মিনার নির্মাণ করেছিলাম। প্রিন্সিপাল তা পরের দিন ভেঙে দিয়েছিলেন। পরের বছর ১৯৬৬ সাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা ঘোষণা করেছেন। ৬-দফার পক্ষে সারাদেশে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কলেজ ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে সহ-সভানেত্রী পদে শেখ হাসিনা নির্বাচন করেও বিপুল ভোটে জয়ী হয়। হাসিনা ছিলো অত্যন্ত মিশুক স্বভাবের এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আমাদের শামসুন্নাহার। আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের বন্ধুরা অনেকেই শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়েছিল। শেখ হাসিনা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে সহ-সভানেত্রী হিসেবে ছাত্রী সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলো। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো ছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের জন্য ছাত্রদের সংগ্রামে মুখর। বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াইয়ে উত্তাল। প্রতিদিন ছিল সংগ্রাম ও মিছিলের কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমবেত হয়ে সেসব মিছিল শুরু হতো। কলেজ থেকে হেঁটে গিয়ে আমরা মধুর ক্যান্টিনে সভা-সমাবেশে বা শহিদ মিনারের মিছিলে যোগ দিতাম। সেই উত্তাল দিনগুলোতে এসব মিছিলে আমরা একসঙ্গে অনেক হেঁটেছি। আমরা ছিলাম মিছিলের সহযাত্রী। এই সংগ্রামই পরে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার রেশ ধরে '৭০-এর নির্বাচন এবং পরে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৬৮ সালে হঠাৎ করেই শেখ হাসিনার বিয়ে হয়ে যায় পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে। শুরু হলো তাঁর নতুন জীবন। ১৯৭১ সালের ২৭ শে জুলাই শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় জন্মগ্রহণ করে। ৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করে। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ শাখার সদস্য এবং রোকেয়া হল ছাত্রলীগ ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক ছিলো। ৭৫ এর ১৫ আগস্টে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহেনা পশ্চিম জার্মানিতে স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার কর্মস্থলে অবস্থান করায় ঘাতকের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যায়।

১৯৭৫-'৮১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন স্বৈরাশাসক তাঁর দেশে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করায় দীর্ঘ ৬ বছর বিদেশে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য হয়। '৮১ সালে দেশে না থেকেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয় এবং একই বছর ১৭ মে দেশে ফিরে আসে। শুরু করে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসে। সেই বছরের নভেম্বরে দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত এবং বহু কাঙ্ক্ষিত গঙ্গা-পদ্মা নদীর ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি করেন শেখ হাসিনা। ১৯৯৭ সালে তাঁরই হাত ধরে আসে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। ২০০৪ সালে ২১শে আগস্ট তাঁর উপর নজীরবিহীন গ্রেনেড হামলা হয়। অল্পের জন্য প্রণে বেঁচে যান শেখ হাসিনা। ২০০৭ সালে তথাকথিত তত্ত্বধায়ক সরকারের মিথ্যা দুর্নিতীর মামলায় তাঁকে প্রায় ১ বছর জেলে আটকে রাখা হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে পুণরায় ক্ষমতায় আসে।

২০১১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ভারত-বাংলাদেশের ৬৪ বছরের সীমান্ত সমস্যা সমাধান করে চুক্তি স্বাক্ষর করেন শেখ হাসিনা। তাঁর সরকারের আমলেই জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার,জেল হত্যার বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হয়েছে। এসব বিচারের রায়ও কার্যকর করা হয়েছে। করোনা অতিমারি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করে তিনি দেশে-বিদেশে প্রসংশিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে স্বপ্নের পদ্মা সেতু তৈরি করেছেন। দেশের সর্বত্র উন্নয়নের ছোঁয়া। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। স্কুল জীবন থেকেই দেখেছি তাঁকে মানুষকে নিয়ে ভাবতে। মানুষের অধিকার,তাদের জীবনমান উন্নয়ন,দেশের উন্নয়ন এসবই ছিলো সবসময় তাঁর ভাবনায়।

আজকের এই দিনে আমি সকলের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। শুভ জন্মদিন, শেখ হাসিনা। সুস্থ্য থাকুন, দীর্ঘজীবী হও, দেশের উন্নয়নে, মানুষের কল্যাণে আমৃত্যু নিবেদিত প্রাণ হয়ে জনগণের মাঝে বেঁচে থাকো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই প্রার্থনা ।

লেখক : সমাজকর্মী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল জীবনের সহযোদ্ধা।

# সুপার ফুড

## পুষ্টিবিদ নাফিসা শারমিন

মাছে- ভাতে বাঙালি এ ভূখণ্ডের একটি জনপ্রিয় প্রচলিত প্রবাদ। একসময় এ অঞ্চলের মানুষের গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর ক্ষেতে থাকত সোনালি ফসল। কালের বিবর্তনে গ্রামে আর পুকুর দেখা যায় না। মিঠা পানির সেই সুসাধু মাছের স্থান দখল করে নিয়েছে চাষের হাইব্রিড মাছ। গোয়াল ভরা গরু আজ আর গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে দেখা যায় না। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে আমাদের জীবন অনেক বদলে গেছে। গ্রামে গ্রামে এখন আর নবান্নের উৎসব হয় না। শহুরে মানুষরা নিজেদের ঐতিহ্যকে জানান দিতে নবান্নের উৎসব করে। পিঠাপুলির আয়োজন করে কিছু আলোচনা হয়। এর মাধ্যমে আমরা বাঙালি, এটা জানান দেয়।

কবি বিভূতি দাস তাঁর 'মাছেভাতে বাঙালি' কবিতায় লিখেছেন- মাছে ভাতে বাঙালি, নিরামিষে মন উঠছেনা এটা সেটায় ভরছে পেট, রসনা কিন্তু মানছেনা। গ্রামের মানুষেরা বাজারে আড্ডায় সিঙ্গারা, পিয়াজু, সমুচা খায় আর শহরের মধ্যেবিত্ত এবং উচ্চবিত্তরা পিৎজা, বার্গার, তন্দুরি, চিকেন ফ্রাই, ফ্রেন্স ফ্রাইসহ আরও নানারকম ফার্স্ট ফুড না হলে তাদের চলে না। আর এসব খাবার গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের অজান্তেই শরীরের অনেক বড়ো ক্ষতি করে ফেলছি। বাঙালি চিরকালই ভোজন রসিক। তা সেকালই হোক কিংবা একালই হোক। সব যুগেই বাঙালির খাবারের সুনাম রয়েছে। আমরা যতটা না আদর্শ খাদ্য গ্রহণে সচেতন তার চেয়ে অনেক বেশি মুখরোচক খাদ্যের প্রতি বেশি দুর্বল। আমরা একবার ভেবেও দেখিনা কি খাচ্ছি, এতে আমাদের শরীরের উপর কি প্রভাব ফেলছে।

বিশ্বজুড়ে এখন পুষ্টিবিদরা খাবার গ্রহণের জন্য সুপার ফুডের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাহলে আমাদের জানতে হবে সুপার ফুড কী,বিজ্ঞানীদের মতে সুপার ফুড হলো এমন এক ধরনের খাদ্য, যাতে উদ্ভিজাত পুষ্টি উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে যা আমাদের দেহের জন্য খুব উপকারী। এতে অ্যান্টিঅক্সিজেন্ট, অন্থোসায়ানিন,ভিটামিন সি,বিভিন্ন মিনারেল,ডায়োটারি ফাইবার থাকে বলে দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন ও রোগ প্রতিরোধসহ নানা উপকার করে। সুপার ফুড আমাদের ইমিউন ফাংশন বৃদ্ধি করে এবং রোগ প্রতিরোধে বা অগ্রগতির সম্ভাবনা হ্রাস করে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। সুপার ফুড সম্পর্কে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সুপার ফুড খাবারের এক একটি বিভাগ যা সুপার - স্বাস্থ্যকর। তবে প্রতিটি স্বাস্থ্যকর খাবার সুপার ফুড নয়। প্রতিটি সুপার ফুডের বিশেষ পুষ্টিগুণ রয়েছে। এসব বিশেষ পুষ্টিগুণের কারণে মানব শরীরের হার্টের সমস্যা,ক্যান্সার প্রতিরোধ, প্রদাহ হ্রাস, কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখাসহ একটি শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেম তৈরি করে।

সুপার ফুডে বিশেষ যে সব পুষ্টিগুণ থাকে তার মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস অন্যতম। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসের প্রাকৃতিক যৌগগুলো মানব শরীরের কোষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। যার ফলে হৃদরোগ, ক্যানসারের মতো জীবন হরণকারীসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। সুপার ফুডে প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকে। আমাদের শরীরের খনিজ পদার্থ মূলত অজৈব পদার্থ, এগুলো ছাড়া শরীরের পক্ষে কর্মচঞ্চল রাখা একেবারেই অসম্ভব। খনিজ লবণ দেহের অস্থি, দাঁত এনজাইম ও হরমোন গঠনে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে, রক্ত জমাট বাঁধতে, স্নায়ু ব্যাবস্থায় সুষ্ঠু কাজ করতে সহায়তা করে। আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির কাজও বিপাকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে। ভিটামিন হচ্ছে একধরনের জৈবিক উপাদান যা আমাদের শরীরে একেবারে তৈরি হয় না বা দরকারের চেয়ে কম তৈরি হয়। আমাদের দেশের মানুষ খাবারের ভিটামিন নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত থাকে। অথচ এই উপাদানটি আমাদের শরীরে খুব অল্প পরিমাণ লাগে। তবে এটা ধারাবাহিকভাবে শরীরে যোগান দিতে হয়। এই ভিটামিনের ঘাটতি হলে শরীরে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা তের প্রকার ভিটামিনের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। ভিটামিন শরীরে বিভিন্ন কোষের স্বাভাবিকতা রক্ষার কাজে সহায়তা করে। রক্তের কাজ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিনের অভাবে রাতকানা, রক্তসল্পতা,চর্মরোগ, রিকেট ও অস্টিওম্যালিসিয়া (হাড়ের রোগ) ও স্নায়ুরোগ দেখা যায়। আবার অধিক ভিটামিনের প্রভাবে শরীরে যে সব সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হলোঃ ভিটামিন-এ এর আধিক্যের কারণে হাইপারভিটামিনসিস, ভিটামিন-বি১ এর কারণে তন্দ্রা ভাব, ভিটামিন-বি৩ এর কারণে লিভারে বিরূপ প্রভাব, ভিটামিন-বি৫ এর কারণে বমি বমি ভাব ও ডায়রিয়া এবং ভিটামিন-ই এর কারণে হার্ট ফেইলিউর হয়ে থাকে। এছাড়াও সুপার ফুডে থাকে ফাইবার, ফ্ল্যাভোনয়েডস এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি। ফাইবার শরীরের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে। ফ্ল্যাভোনয়েডসে এন্টিইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি- কার্সিনোজেনিক বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো উদ্ভিদে পাওয়া যায় স্বাস্থ্যকর চর্বি হলো মনোস্যাচুরেটেড ও পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। একে ভালো চর্বি বলা হয়। এটি আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রতিরোধ করে।

আমাদের আশেপাশে সস্তায় যে সব সুপার ফুড পাওয়া যায় সেগুলো খুব সহজেই আমরা, আমাদের খাদ্য তালিকায় রাখতে পারি। আপেল, কমলা,ড্রাগণ ফল এগুলো সুপার ফুড কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষ সব সময় এগুলো কিনতে পারে না। তবে এর বিকল্প হিসেবে কলা, পেয়ারা, পেঁপে,জাম,আনারস,গাজর খুব সহজেই কম মূল্যে এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব। বাদাম, টকদই, কম চর্বিযুক্ত দুধ,ডিম, কুমড়া, হলুদ সবজি-ফল সুপার ফুড হিসেবে স্বীকৃত। গাঢ় পাতাযুক্ত সবুজ শাকসবজিতে ভিটামিন এ, সি এবং ই প্রচুর পরিমাণে থাকে। এসব শাকসবজি ক্যান্সার প্রতিরোধে

কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও এসব শাকসবজিতে ভিটামিন -কে এবং ফোলেট থাকার কারণে হাড় ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দারুচিনি আমাদের দেশের সকল মানুষের কাছে একটি পরিচিত মসলা। এটি মানবদেহের প্রদাহ,রক্তের শর্করার পরিমাণ এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। চিয়া বীজ মেক্সিকো এবং গুয়েতেমালার একটি ফুলের বীজ। এই বীজে ফাইবার,প্রোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম,আয়রন ও জিঙ্ক পাওয়া যায়। এগুলো কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার যা মানুষের জন্য খুবই সহায়ক। আদা, রসুন, হলুদ, কুমড়া, মসুরের ডাল, পালং শাক, মুলা শাক, শালগম, বাধা কপি, মটরশুঁটি এ সবই সুপার ফুড। মানব শরীরের জন্য উপকারী। আমলকি, আখরোট অ্যাভোকাডো, ব্লুবেরি, এক্সট্রা ভার্জিন অয়েলের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা কমবেশি জানি।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিবছর শুধু খাবারের কারণেই এক কোটিরও বেশি মানুষ মারা যায়। আমাদের দেশে এমনিতেই পুষ্টি বৈষম্য রয়েছে, যা নিরসনে কাজ করছে সরকার। সুপার ফুড একই সাথে স্বাস্থ্যকর এবং রোগবালাই প্রতিরোধকারী। তাই সুস্থ থাকার জন্য শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় উপদান সুপার ফুড। সুস্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর দীর্ঘ জীবন পেতে হলে ফার্স্ট ফুড নয় সুপার ফুডকে বেছে নিতে হবে।

# জেলহত্যা দিবসের স্মৃতিকথা

## তোফায়েল আহমেদ

আজ থেকে ৪৭ বছর আগে ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল খুনিচক্র। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও ৩ নভেম্বরের জেলহত্যা একসূত্রে গাঁথা। মূলত আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতেই সংঘটিত করা হয়েছিল এই নির্মম হত্যাকাণ্ড। প্রতিবছর জাতীয় জীবনে ৩ নভেম্বর ফিরে এলে জাতীয় চার নেতার-সর্ব জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান-আত্মত্যাগ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁরা বারবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলিতে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে বাংলার মানুষকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তির মোহনায় দাঁড় করান। '৪৮ ও '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭০-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। পৃথিবীতে বহু নেতা এসেছেন এবং আসবেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করবেন বলে মনে করি না। যে নেতা লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাজনীতি করতেন এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে জেল-জুলুম-অত্যাচার ফাঁসির মঞ্চকে তুচ্ছ মনে করতেন। একবার চিন্তা-ভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত নিতেন ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতেন না। সেই মহান নেতার নেতৃত্বে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছি। পঁচিশে মার্চের শেষ রাত এবং ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারের নির্জন সেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমাদের চিন্তা-চেতনা-ভাবনা সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্বাধীনতা।

যেদিন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়, সেদিন আমি ময়মনসিংহ কারাগারে বন্দি। তখন দুঃসহ জীবন আমাদের! ময়মনসিংহ কারাগারের কনডেম সেলে-ফাঁসির আসামিকে যেখানে রাখা হয়-আমাকে সেখানে রাখা হয়েছিল। সহকারাবন্দি ছিলেন 'দি পিপল' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবিদুর রহমান। যিনি ইতোমধ্যে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। আমরা দু'জন দু'টি কক্ষে ফাঁসির আসামির মতো জীবন কাটিয়েছি। হঠাৎ খবর এলো, কারাগারে

জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। কারারক্ষীসহ কারাগারের সকলকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। ময়মনসিংহ কারাগারের জেল সুপার ছিলেন শ্রী নির্মলেন্দু রায়। চমৎকার মানুষ তিনি। কারাগারে আমরা যারা বন্দি ছিলাম তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। বঙ্গবন্ধুও তাকে খুব স্নেহ করতেন। বঙ্গবন্ধু যখন বারবার কারাগারে বন্দি ছিলেন, নির্মলেন্দু রায় তখন কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর পরম স্নেহভাজন নির্মলেন্দু রায়কে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সেদিন গভীর রাতে নির্মলেন্দু রায় আমার সেলে এসে বলেন, 'ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মিস্টার ফারুক-যিনি এখন প্রয়াত-আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এতো রাতে কেন? তিনি বললেন, 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আপনাদের চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা কারাগারের চতুর্দিক পুলিশ দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছি, জেল পুলিশ ঘিরে রেখেছে। এসপি সাহেব এসেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।' আমি বললাম, না, এভাবে তো যাওয়ার নিয়ম নেই। আমাকে যদি হত্যাও করা হয়, আমি এখান থেকে এভাবে যাব না। পরবর্তীতে শুনেছি সেনাবাহিনীর একজন মেজর সেদিন জেলখানায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নির্মলেন্দু রায় বলেছিলেন, 'আমি অস্ত্র নিয়ে কাউকে কারাগারে প্রবেশ করতে দেবো না।' কারাগারের চারপাশে সেদিন যারা আমাকে রক্ষার জন্য ডিউটি করছিলেন তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে আমার সহপাঠী জনাব ওদুদ-আমরা একসাথে এমএসসি পাশ করেছি এবং দেশ স্বাধীনের পর '৭৩-এ যিনি সহকারী পুলিশ সুপার পদে যোগদান করেন-নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারাগার রক্ষার জন্য। আমি নির্মলেন্দু রায় এবং ওদুদের কাছে ঋণী।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট যেদিন জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, আমরা সেদিন নিঃস্ব হয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরপরই জাতীয় চার নেতাসহ আমরা ছিলাম গৃহবন্দি। পরদিন খুনিরা আমার বাসভবনে এসে আমাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন করে। পরবর্তী সময়ে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং প্রয়াত ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত জামিল-তিনি তখন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার-তাদের প্রচেষ্টায় রেডিও স্টেশন থেকে আমাকে বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় মা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। মায়ের শরীরের উপর দিয়েই আমায় টেনে নিয়েছিল ঘাতকের দল। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি জনাব ই এ চৌধুরী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় নেতা জিল্লুর রহমান এবং আমাকে বঙ্গভবনে নিয়ে যান। সেখানে খুনি খোন্দকার মোশতাক আমাদের ভয়-ভীতি দেখান এবং বলেন, যদি তাকে সহযোগিতা না করি তাহলে তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। আমরা খুনি মোশতাকের সকল প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। ২২ আগস্ট জাতীয় চার নেতাসহ আমাদের অনেক বরেণ্য নেতাকে গ্রেফতার করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়েছিল হত্যা করার জন্য। যে-কোনো কারণেই হোক ঘাতকের দল শেষ পর্যন্ত

হত্যা করেনি। পরে নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। গৃহবন্দি অবস্থা থেকে একইদিনে আমাকে, জিল্লুর রহমান ও আবদুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের কোণে অবস্থিত পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ৬ দিন বন্দি রেখে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে খুনিচক্র আমাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে চোখ ও হাত-পা চেয়ারের সাথে বেঁধে নির্মম নির্যাতন করে অর্ধমৃত অবস্থায় পুনরায় পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রেখে আসে। পরদিন সিটি এসপি আবদুস সালাম ডাক্তার এনে আমার চিকিৎসা করান। পরে আমাকে ও আবিদুর রহমানকে ময়মনসিংহ কারাগারে এবং জিল্লুর রহমান ও রাজ্জাক ভাইকে কুমিল্লা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

ময়মনসিংহে কারারুদ্ধকালে জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদটি শুনেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতীয় চার নেতার কতো অবদান। স্মৃতির পাতায় আজ সে-সব ভেসে ওঠে। দল পুনরুজ্জীবনের পর '৬৪তে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু পুনরায় সাধারণ সম্পাদক এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। '৬৬-এর ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে যে সর্বদলীয় নেতৃসম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা উত্থাপন করেন, সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন ভাই যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দেওয়ার পর ১৮, ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু সভাপতি, তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রথম সহ-সভাপতি, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী অন্যতম সহ-সভাপতি এবং এএইচএম কামারুজ্জামান নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ পরম নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু সারা বাংলাদেশে ছয় দফার সমর্থনে জনসভা করেন এবং যেখানেই যান সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ও তিনি জামিনে মুক্ত হন। অবশেষে ৮ মে, নারায়ণগঞ্জের জনসভা শেষে ধানমণ্ডির বাসভবনে ফেরামাত্রই তথাকথিত 'পাকিস্তান রক্ষা আইন'-এ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন ভাইসহ আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এর প্রতিবাদে আমরা '৬৬-এর ৭ জুন হরতাল পালন করি। সফল হরতাল পালন শেষে এক বিশাল জনসভায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছয় দফা তথা বাঙালির স্বাধিকার কর্মসূচি বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা, তাজউদ্দীন আহমদ দক্ষ সংগঠক এবং কামারুজ্জামান সাহেব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের এমএনএ হিসেবে পার্লামেন্টে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালির স্বাধিকারের দাবি তুলে ধরতেন। '৬৮তে কারারুদ্ধ অবস্থায় তাজউদ্দীন ভাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃনির্বাচিত হন। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি

পান। '৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কারাগারে বন্দি ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাইরে ছিলেন। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মরহুম আহমেদুল কবীরের বাসভবনে Democratic Action Committee -সংক্ষেপে DAC -এর-সভা চলছিল। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবি নিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়েছিলাম। আমি যখন ১১ দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করছি তখন ন্যাপ নেতা মাহমুদুল হক কাসুরি ১১ দফা কর্মসূচি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন, 'তোমরা ১১ দফা কর্মসূচিতে শেখ মুজিবের ৬ দফা হুবহু যুক্ত করেছো। সুতরাং, তোমাদের ১১ দফা সমর্থনে প্রশ্ন আসবে।' উত্তরে বলেছিলাম, আমরা বাঙালিরা কীভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা জানি। আপনারা সমর্থন না করলেও এই ১১ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে কারামুক্ত করবো। এ কথার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমায় বুকে টেনে পরমাদরে বলেছিলেন, 'তোমার বক্তব্যে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।'

'৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং কামারুজ্জামান সাহেব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে কে কোন পদে পদায়িত হবেন বঙ্গবন্ধু তা নির্ধারণ করেন। '৭০-এর নির্বাচনে আমি মাত্র ২৭ বছর বয়সে এমএনএ নির্বাচিত হই। '৭১-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিংয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপনেতা, তাজউদ্দীন আহমদ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা এবং কামারুজ্জামান সাহেব সচিব, চীফ হুইপ পদে জনাব ইউসুফ আলী এবং হুইপ পদে যথাক্রমে জনাব আবদুল মান্নান এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম নির্বাচিত হন। আর প্রাদেশিক পরিষদে নেতা নির্বাচিত হন ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী হবেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য মনসুর আলী সাহেবকে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক পরিষদে মনোনয়ন দেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর সেট-আপ করা ছিল। কিন্তু '৭১-এর ১ মার্চ পূর্বঘোষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন একতরফাভাবে স্থগিত হলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে সর্বাত্মক স্বাধীনতা ঘোষণার পর শুরু হয় অসহযোগের দ্বিতীয় পর্ব। বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন অসহযোগের প্রতিটি দিন। আমাদের প্রয়াত নেতা খুলনার মোহসীন সাহেবের লালমাটিয়াস্থ বাসভবনে বসে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। অসহযোগ চলাকালেই বঙ্গবন্ধু ঠিক করে রেখেছিলেন আমরা কোথায় গেলে কি সাহায্য পাবো। '৭১-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি আমাদের চারজনকে-শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং আমাকে-বঙ্গবন্ধু ডেকে পাঠালেন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে। সেখানে জাতীয় চার নেতাও ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের বললেন, 'পড়ো, মুখস্থ করো।' আমরা মুখস্থ করলাম একটি ঠিকানা, 'সানি ভিলা, ২১ নং রাজেন্দ্র

রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানীপুর, কোলকাতা।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এখানেই হবে তোমাদের জায়গা। ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা দেবে না। আমি নিশ্চিত ওরা আক্রমণ করবে। আক্রান্ত হলে এটাই হবে তোমাদের ঠিকানা। এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করবে।' বঙ্গবন্ধু সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সদ্য নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য চিত্তরঞ্জন সুতারকে তিনি আগেই কলকাতা প্রেরণ করেন। ডাক্তার আবু হেনা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। বঙ্গবন্ধু তাকে আগেই পাঠিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে। সেই পথেই ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান সাহেব, মণি ভাই এবং আমাকে আবু হেনা নিয়ে গিয়েছিলেন। কোলকাতার রাজেন্দ্র রোডেই আমরা অবস্থান করতাম। আর ৮ নং থিয়েটার রোডে অবস্থান করতেন আমাদের জাতীয় চার নেতা। নেতৃবৃন্দের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হতো। '৭১-এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' গঠন ও সেই পরিষদে বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতার ঘোষণা' ও 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' অনুমোদন করে তারই ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠন করা হয়। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং উপ-রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেন এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভূমিকে হানাদার মুক্ত করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ দূরদর্শীতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমাদের সাথে পরামর্শ করতেন। আমাদের চারজনকে মুজিব বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমাদের চার জনের কাজ ছিল প্রধানমন্ত্রীর সাথে বসে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে বর্ডারে বর্ডারে ঘুরেছি, রণাঙ্গনে ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়েছি, একসাথে কাজ করেছি। আমি থাকতাম কোলকাতায় মুজিব বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ব্যারাকপুরে, মণি ভাই আগরতলায়, সিরাজ ভাই বালুর ঘাটে আর রাজ্জাক ভাই মেঘালয়ে। মেজর জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে দেরাদুনে ছিল আমাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মুজিব বাহিনীর জন্য ভারত সরকারের যতো সাহায্য-সহযোগিতা সেসব আমার কাছে আসতো। আমি আবার সেগুলো এই তিন নেতার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। জাতীয় চার নেতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা স্বাধীন করেছি।

দেশ স্বাধীনের পর '৭১-এর ১৮ ডিসেম্বর কোলকাতা থেকে একটি বিশেষ হেলিকপ্টারে আমি এবং রাজ্জাক ভাই এবং ২২ ডিসেম্বর জাতীয় চার নেতা বিজয়ীর বেশে প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। আর ৯ মাস ১৪ দিন কারারুদ্ধ থাকার পর পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত হয়ে বিজয়ের পরিপূর্ণতায় জাতির পিতা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। '৭২-এর ১১ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদের বাসভবনে

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা বিষয়ে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাবেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং; সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী; তাজউদ্দীন আহমদ অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী; ক্যাপ্টেন মনসুর আলী যোগাযোগ মন্ত্রী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান সাহেব ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৪ জানুয়ারি প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হবার। সেই থেকে বঙ্গবন্ধুর কাছে থেকেছি শেষ দিন পর্যন্ত।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট খুনিচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। খুনিদের নির্মমতা এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, তারা নিষ্পাপ শিশু রাসেলকেও হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে না পারে, সে জন্যই খুনিচক্র শিশু রাসেলকে হত্যা করে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য পূরণ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যার হাতে '৮১ সনে আমরা রক্তেভেজা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী পতাকা তুলে দিয়েছিলাম। সেই পতাকা হাতে নিয়ে তিনি নিষ্ঠা-সততা-দক্ষতার সাথে সংগ্রাম করে দীর্ঘ ২১ বছর পর '৯৬ তে আওয়ামী লীগকে গণরায়ে অভিষিক্ত করে সরকার গঠন করেন এবং অনেকগুলো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সংবিধান থেকে কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' অপসারণ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ উন্মুক্ত করা। এরপর ২০০৯-এ সরকার গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ও দণ্ড কার্যকর করা। সফলভাবে এ দুটো ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্নের সাথে সাথে তিনি বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী ইতোমধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্বপ্ন থেকে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আমরা আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়ে ২০৪১-এ 'উন্নত বাংলাদেশ' গঠনে বদ্ধপরিকর। করোনা অতিমারিতে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও দেশের কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের অগ্রগতি ঘটছে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী যে জ্বালানি ও খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে তা আমাদের সকলকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। জাতির পিতা ও জাতীয় চার নেতার আরাধ্য স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করে প্রিয় বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। মহান নেতাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেই নেতৃবৃন্দের আত্মা শান্তি লাভ করবে এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই লক্ষ্যেই নিয়োজিত।

লেখকঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ।

# গণমাধ্যমে শেখ হাসিনা

## জাফর ওয়াজেদ

গণমানুষের রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা অর্জন করেছেন অসংখ্য সম্মাননা ও স্বীকৃতি। জনগণের ক্ষমতায়নে আলোকিত প্রিয় স্বদেশ শেখ হাসিনার কর্মেই আজ সারাবিশ্বে সমুজ্জ্বল বাংলাদেশ। বিদেশি মূলধারার গণমাধ্যমগুলো বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন নেতিবাচক প্রতিবেদন আর প্রকাশ করে না। তবে স্বাধীনতা বিরোধী ও একাত্তরের পরাজিত শক্তির ধারক বাহকরা গণমাধ্যম ছাড়াও সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে। তারা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে হেয় করার জন্য মিথ্যাচার অব্যাহত রেখেছেন। অসম্পাদিত এই সব মাধ্যম আর যাই হোক ধোপে টেকে না। বিশ্ব গণমাধ্যম তাঁর সার্বিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করে মাদার অভ হিউম্যানিটি খেতাবে ভূষিত করেছে।

শুধু গণমাধ্যমকে নয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি এবং বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছে। গণমাধ্যমে তাই শেখ হাসিনার ছিল নানামুখী উপস্থিতি জাতিসংঘের ভাষণই বাংলাদেশ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে অনুকরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। এজন্য বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে এমডিজির 'রোল মডেল।' যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিক এন্ড বিজনেস রিসার্চ এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিল ২০১৮ শীর্ষক এক প্রতিবেদনে আগামী ২০৩২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের একত্রিশতম দেশ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব আজ জানতে চায় সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশে এমন কী ঘটেছে যার ফলে এখানে দারিদ্র্যের হার নব্বই দশকের ৫৬ দশমিক ৭ থেকে ২৪ দশমিক ৮ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যে হার ১৩ শতাংশ নেমে এসেছে। যাতে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। গড় আয়ু বেড়েছে অনেক। শিশুর মৃত্যু কমানোর ক্ষেত্রে এ অভাবনীয় সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন করেছে। শিক্ষার হারও বেড়েছে। যে বিদেশি গণমাধ্যমগুলো এক সময় হতাশা ছড়াতো, তারাই এখন প্রশংসাসূচক লেখা লেখে। উদীয়মান অর্থনীতি দেশ অর্থনীতির বিস্ময় টেকশই উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বিংশশতকে যারা শেখ হাসিনার অযথাই সমালোচনা করতেন রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্যে আদর্শগত কারণে তাদের সেই লেখনী আর দেখা যায় না। মেগা প্রকল্পগুলো নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ যখন নিজেদের উন্নত বিশ্বের স্তরে ভাবতে শুরু করেছে, তাতে বিশ্ববাসীও সে মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসছে। ২০১৮ সালের ১৩ মার্চ সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ন্যাশনাল অর্কিড গার্ডেনে শেখ হাসিনার নামে একটি অর্কিডের নামকরণ করা হয়। ইতিবাচকভাবেই মূল্যায়ণ করে আসছে গত

এগারো বছর ধরেই। দেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে দক্ষ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা।

গণমাধ্যমে শেখ হাসিনা প্রথম আসেন ১৯৬৯ সালে ইডেন কলেজের নির্বাচিত ভিপি হিসেবে। বিজয়ের পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে তার উপর সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়। মহিলাদের পত্রিকা সাপ্তাহিক ললনা ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে তার সাক্ষাৎকার ছেপেছিল। তখন নাম ছিল হাসিনা শেখ। সেখানে তিনি দুই পাকিস্তানের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈষম্য তা তুলে ধরেছিলেন। শেখ হাসিনা এরপর গণমাধ্যমে আসেন পঁচাত্তরে ১৫ আগস্টের পর। বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনা ও রেহানার অবস্থান ও অবস্থা জানার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু ক্ষমতা দখলবাজি সামরিক জান্তারা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্যই প্রদান করেনি। গণমাধ্যমগুলোও ছিল নিশ্চুপ, নির্বিকার।

১৯৭৫-এর ১৮ আগস্ট জার্মানির 'ডি ভেল্ট' পত্রিকায় ক্লাউস বর্ণ ও উলরিশ লুকের যৌথ নামে তিনটি ছবিসহ চার কলামের একটি সংবাদ ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল 'বনে শোকাগ্রস্ত শেখ মুজিবের কন্যারা।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে নিয়ে প্রথম প্রতিবেদন ছাপা হয় ১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট। তখন তারা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন-এ অবস্থান করছিলেন। এর আগে তারা ব্রাসেলস থেকে এখানে আসেন। সেখানকার পত্রিকা 'ডি ডেজ' তিনটি আলোকচিত্রসহ চার কলামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 'বলে শোকাগ্রস্থ শেখ মুজিবের কন্যারা'। শিরোনামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় 'বাংলাদেশের সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নিজের সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আরও নিহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো শেখ মুজিবের দুই কন্যা কোথায় তা নিয়ে অনুসন্ধান করেছে।' দুই সাংবাদিক ক্লাউস কর্ণ ও উলরিশলুকের যৌথ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, 'আমরা ডিভেল্ট পত্রিকার পক্ষ থেকে দুই কন্যার সঙ্গে কথা বলেছি। গত শুক্রবার তাঁদের বাবা নিহত হবার পর থেকেই তাঁরা উভয়ই বনে এ্যাম লেবিং সড়কের ছয় নম্বরে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের কোয়েনিগসভিন্টারের বাসায় অবস্থান করছেন। সাদা রঙ্গে ভিলা সদৃশ্য বাড়িটিতে রাষ্ট্রদূত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মাহজাবিন চৌধুরীও বাস করেন। বাড়িটির সামনে দিয়ে পিটার্সবার্গ কুর হোটেল যাবার মূল রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে শত শত গাড়ি চলাচল করছে। কিন্তু এই গাড়ির আরোহীরা কেউ জানে না যে, সবুজ ঝাউঘেরা ভিলা বাড়িটাতে দুটি মেয়ে গত শুক্রবার তাঁদের বাবার মৃত্যুর খবর পাবার পর থেকে শোকে মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। বড়ো মেয়েটির নাম হাসিনা, বয়স ছাব্বিস আর তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট বোনটির নাম রেহানা।' প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায় বাংলাদেশ দূতাবাসের এক কর্মীর কোলে শিশুকন্যা পুতুল, পাশে শিশু জয়। নীচে রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে দুই সাংবাদিক। (তথ্যদূত 'প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার দুঃসহ দিন' সরাফ আহমেদ)।

পঁচাত্তর ২৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পৌঁছেছেন বন থেকে। ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকাকালে শেখ হাসিনা আকাশবাণীর বাংলা সার্ভিসের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। সাংবাদিক বিবেক শুক্লা লিখেছিলেন যে প্রণব মুখার্জী আকাশ বাণীর বাংলা সাভির্সের সঙ্গে শেখ হাসিনাকে যুক্ত করে দেন। যাতে তিন অপরিচিত দিল্লী মহানগরে সময় কাটাতে পারেন। শেখ হাসিনা সেখানে কারেন্ট এফেয়ার্স প্যাকেজগুলোতে অংশ নিতেন। তবে স্বনামে অংশ নেননি। দি পাইনিয়র পত্রিকায় এই সাংবাদিক শেখ হাসিনার প্রতি প্রণব মুখার্জীর পরিবারের সম্পর্কের গভীরতাও উল্লেখ করেছেন। 'এই মুহূর্তে ডটকম' এর সন্দীপ সিনহাও উভয় পরিবারের সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন। ধারণা করা যায়, আকাশ বাণীতে কর্মরত থাকাবস্থায় শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের সঙ্গে সংযুক্ত হবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ১৯৮০ সালের ১৬ আগস্ট লন্ডনের ইয়র্স হলে ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডের সম্পর্কে আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি ছিলেন। যা ছিল লন্ডনে প্রথম রাজনৈতিক সভা। লন্ডনের স্থানীয় বাংলা কাগজগুলোতে তা ছাপা হয়েছিল। ১৯৮১ সালের ১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনা সভাপতি নির্বাচিত হন। কাউন্সিলের আগে দেশের সংবাদপত্রে শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। তারও আগে সামরিক জান্তা শাসকদের নিয়ন্ত্রিত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় দিল্লী প্রবাসী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার ছেপেছিল। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছিল তাতে শেখ হাসিনা যা বলেননি, তাও সন্নিবেশিত ছিল। শেখ হাসিনাকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনাধর্মী অনেক প্রতিবেদনই ছাপা হয়েছিল সে সময়। দেশের সংবাদপত্রে অধিকাংশই ১৯৮১ সালের ১৭ মে ঢাকায় আসেন সামরিক শাসকদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে। ক্ষমতা দখলকারি জান্তারা তাঁকে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করেছিল পরিবারের সদস্যসহ। পিতা-মাতা-স্বজনদের কবর জিয়ারত ও ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের জন্য দেশে আসার সুযোগ দেয়নি। এতোই নির্মম, নিষ্ঠুর ছিল। শেখ হাসিনা যেদিন দেশে ফেরে। তার পরদিন সংবাদপত্রগুলোতে কোথাও প্রথম শিরোনাম কোথাও দ্বিতীয় শিরোনাম হয়েছিল। মানিক মিয়া এভিনিউতে ক্রন্দন-মথিত তাঁর ভাষণ সংবাদপত্রে পাঠ করে পাঠক আপ্লুত হয়েছিল পিতৃ-মাতৃহীন স্বজন হারা শেখ হাসিনার জন্য। সেদিন রাজপথে মানুষের ঢল নেমেছিল। শাসকরা গতিরোধ করতে পারেনি। রাস্তার দু'পাশে ছিল মানুষের ঢল। মিছিলে স্লোগান। ট্রাক, গাড়ি, বাস, মোটর সাইকেলে সারিবদ্ধ শোভাযাত্রা। দেশে ফিরেও তিনি ৩২ নম্বরের বাড়িতে যেতে পারেন নি। মা-বাবা-ভাই ও পরিবারকে অন্য সদস্যদের স্মৃতি স্পর্শ করতে পারেন নি, দোয়াও নয়। শেখ হাসিনা রাস্তার ওপরই বসে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে মিলাদ ও দোয়া পড়েন। ১৯৮১ সালের ১২ জুন বাড়িটি হস্তান্তর করা হয়। সে সময় অনেক পত্রিকার প্রতিবেদন ছিল মর্মস্পর্শী। জিয়া হত্যার পর বিচারপতি সাত্তার সরকারের সাময়িক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পর রাজনৈতিক কর্মকান্ড প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তিরাশি সালে শেখ হাসিনাকে আটক করা হয়। সামরিক যোদ্ধার সেন্সরশিপ

থাকলেও সাহসী সংবাদপত্রগুলো প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেদনার ছবিও ছেপেছিল। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমের একটি অংশ শেখ হাসিনার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। শেখ হাসিনার প্যারালাল এক জেনারেলের স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য প্রগতিশীল বলে পরিচিত সংবাদপত্রগুলোও ভূমিকা পালন করেছিল। মিডিয়া ক্যু মার্শাল ক্যুর মাধ্যমে নির্বাচনি আসন ছিনিয়ে নিয়েছিল শাসকরা। শেখ হাসিনার ভূমিকা গুরুত্ব পেয়েছিল সংবাদপত্রে।

প্রায় চার দশকের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে শেখ হাসিনাকে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বলিষ্ঠ ভূমিকায় তিনি সপ্রতিভু এখনো। বিদেশি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে তার লক্ষ্যকে তুলে ধরেছেন। সর্বশেষ দেখা যায়, কোভিড-১৯ এর প্রকোপ বিশ্বজুড়ে যখন তীব্র বাংলাদেশও তার থেকে মুক্ত ছিল না। গণমাধ্যমে শেখ হাসিনা বলেছিলেন জাতিসংঘের ভার্চুয়াল অধিবেশনে এই যে, 'এ মহামারির কারণে আজ সারা বিশ্বের মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকির সম্মুখীন। কোভিড-১৯ প্রমাণ করেছে আমাদের সবার ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা।' এমনটাও বলেছিলেন তিনি, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও যেমন জাতিসংঘ সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। তেমনি এই মহামারিও সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে।' প্রধানমন্ত্রী করোনা ভ্যাকসিন যাতে সব দেশ পায়, সে জন্য ওষুধ প্রস্তুতকারী দেশগুলোর প্রতিও আহ্বান জানিয়েছিলেন। করোনাকালে দেশের মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা শুধু নয়, বিনামূল্যে করোনার দুই ডোজ টিকাদানেরও ব্যবস্থা করেছেন। পশ্চিমা দেশগুলো এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা নীচের দিকে। শেখ হাসিনা করোনাকালে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে ইতিবাচকভাবেই এসেছে।

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

# মাদকমুক্ত সমাজ নিশ্চিত করে উজ্জ্বল ভবিষ্যত

**ড. হুমায়ুন কবির**

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশেই মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশিয়া থেকে ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা থেকে ওশেনিয়া কোথায় নেই মাদকের ভয়াবহতা। উদ্বেগ -উৎকণ্ঠা, হতাশা আর কষ্টের শেষ নেই মাদকাসক্ত পরিবারগুলোর। মাদকাসক্তি বর্তমান সময়ে একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দেশে মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮ এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচনি ইশতেহারে ৩.১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে "মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' ও চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।" এছাড়াও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি'তেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাদকদ্রব্যের ইংরেজি পরিভাষা হলো Drug. ড্রাগ বলতে আমরা সাধারণতভাবে ওষুধকেই বুঝি। মাদকদ্রব্য ও ওষুধের মধ্যে চারিত্রিক, গুণগত ও ক্রিয়া- বিক্রিয়াগত পার্থক্য রয়েছে। ওষুধের কাজ হলো জীবদেহে পুষ্টি সাধন, ক্ষয় পূরণ,রোগ নিরাময়,বল বর্ধন, জীবানু নাশ,কষ্ট দূর করা ইত্যাদি। কোনো কোনো মাদকদ্রব্য ওষুধের মতোই জীবদেহের রোগ নিরাময়, বল বর্ধন, কিংবা কোনো কষ্ট বা বিকার দূর করলেও ওষুধের সাথে মাদকের সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ ওষুধ যতই গ্রহণ করা হোক তা কখনোই প্রাণিদেহে 'craving' বা গ্রহণের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে না। কিন্তু মাদকদ্রব্য লাগাতার কয়েক বার গ্রহণের পরই তা পুনরায় গ্রহণের জন্য গ্রহণকারী প্রাণির মনো-দৈহিক এবং জৈব - রাসায়নিক ব্যবস্থায় 'craving' বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। মাদকদ্রব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটা ব্যবহারকারীর দেহ মনের উপর নানারকম ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াসহ তার মনস্তাত্ত্ব ও মানসিক প্রবণতা, আচরণ, স্বভাব ও চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মাদকের উপস্থিতি মানুষের আগে। ওল্ড টেস্টামেন্ট, বাইবেল ও কোরআনের বর্ণনা মতে বেহেশত বা প্যারাডাইসের ' ফিগ ট্রি','অ্যাপল' বা 'গন্দম ফল' ভক্ষণের ফলে আদি পিতা-মাতা আদম- হাওয়ার দেহ,মন,চেতনা, আবেগ,অনুভূতি ও উপলব্ধিতে যে পরিবর্তন হয়েছিল, তা ইহজগতের মাদক সেবনের ফলে মনোদৈহিক ব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া পরিবর্তনেরই অনুরূপ। মাদকদ্রব্য প্রকৃতিরই অবদান। ডারউইনের বিবর্তনবাদের সূত্রানুসারে পৃথিবীতে জীব জগতের

আগে উদ্ভিদ জগতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিলো। উদ্ভিদের মধ্যে আবার প্রচীনতম হলো ' ভাইন' জাতীয় লতানো গাছ। এ গাছের মিষ্টি ফলে নিহিত চিনির সাথে বাতাসে ভাসমান ' ইস্ট ' জাতীয় এককোষী ব্যাকটেরিয়ার খাদন এবং গাঁজন ক্রিয়ার ফলে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয়েছিল বিশ্বের আদিতম মাদক ' অ্যালকোহল'। এ যাবত প্রায় চার হাজার উদ্ভিদের কথা জানা গেছে যেগুলো সরাসরি মাদক কিংবা মাদকের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। ভেষজ লতাগুল্ম, উদ্ভিদের ছাল- বাকল, পাতা, ফুল, ফল বিচি কিংবা এগুলোর নির্যাস থেকে মাদক আহরিত হয়। তবে নেশার বস্তু হিসেবে ব্যবহার্য এসব ভেষজ কিংবা উদ্ভিদের নির্যাসের পুরোটাই মাদক নয়। এর মধ্যে বিদ্যমান একটি বিশেষ মৌল বা রাসায়নিক উপাদানই মাদক। যেমন অ্যালকোহলের ইথানল, গাঁজার টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল, কোকা পাতা বা কোকেনের একজোনিন, তামাকের নিকোটিন, কফির ক্যাফেইন, পান- সুপারির অ্যারিকোলাইন ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে মানুষের হাতে মাদকদ্রব্যের নানান পরিশীলন ও বিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতিজাত মাদকের নানা ধরনের রাসায়নিক বস্তুর সংশ্লেষে সিনতেসাইজ করে তৈরি হয়েছে সেমি- সিনথেটিক মাদক। ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের রাসায়নিক বস্তুর বিক্রিয়া ও সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে সিনথেটিক মাদক। এসব সিনথেটিক মাদকের সাংগঠনিক কাঠামো এবং পারমাণবিক সংখ্যায় হেরফের ঘটিয়ে আবার তৈরি করা হয়েছে ' ডিজাইনার্স ড্রাগ' গোত্রভূত হাজারো নতুন মাদক। বিশ্ব বর্তমানে এক লাখ বিশ হাজারেরও বেশি মাদক আছে।

বাংলাদেশে যে সব মাদকের ব্যবহার বেশি সেগুলো হলো হেরোইন, বিদেশি মদ,দেশি মদ,গাঁজা, কোকেন,ইয়াবা, কোডিন (ফেনসিডিল), ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল ইত্যাদি। মাদকদ্রব্য জব্দের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, দেশে হেরোইন এবং ইয়াবার অপব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাঁজার ব্যবহার ২০১৪-১৭ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বর্তমানে এর অপব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন কাজ। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ নয় তথাপি প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে নানাভাবে দেশে অবৈধভাবে মাদক ঢুকছে। মাদক কারবারিরা নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরও সেসকল কৌশল দ্রুত রপ্ত করে দক্ষতার সাথে সফল অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিচারের মুখোমুখি করছে। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য সারাদেশের ৮ টি বিভাগ,৬৪ টি জেলা, ৪ টি মেট্রো কার্যালয় ও ৮ টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্ট গার্ডে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাদকাসক্তি একটি জটিল কিন্তু চিকিৎসাযোগ্য রোগ। এটিকে একটি ক্রনিক রোগও বলা হয়। মাদকাসক্তি চিকিৎসা অবশ্যই একজন ব্যক্তির মাদক গ্রহণ বন্ধ করবে, মাদকমুক্ত স্বাভাবিক জীবনচর্চা বজায় রাখবে। পরিবার, কর্মক্ষেত্র এবং সমাজে

উৎপাদনশীল কাজ অর্জনে সহায়তা করবে। বাংলাদেশে প্রায় অর্ধ কোটি মাদকাসক্ত থাকলেও সরকারি- বেসরকারি মাদকাসক্ত চিকিৎসা হাসপাতাল (বর্তমানে নিরাময় কেন্দ্র) প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আবার ফলপ্রসূ চিকিৎসার অভাবও রয়েছে। কাউন্সেলিং বা থেরাপি মাদকাসক্তি চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কিন্তু বাংলাদেশের বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলো কাউন্সেলর ও থেরাপিস্টের উপস্থিতিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। অধিকাংশ নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মাদকাসক্তি রিকভারি ব্যক্তি হওয়ায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো প্রফেশনাল বা হাসপাতাল আকারে গড়ে উঠেনি। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে প্রায়সই অভিযোগ পাওয়া যায়, তারা রোগীদের সাথে প্রতারণা করছে, সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নেই, তারা অপচিকিৎসা প্রদান করছে ইত্যাদি। আমাদের দেশে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র থেকে পরামর্শ নেওয়াকে অসম্মানজনক মনে করা হয়। মাদকাসক্তি চিকিৎসা শুধু একটি চিকিৎসা নয়,বরং অনেকগুলো চিকিৎসার একটি গ্রুপ,যার উদ্দেশ্য যৌথভাবে এসব পদক্ষেপ মাদক অপব্যবহার সমস্যার সমাধান করা, মাদকমুক্তির সাথে সাথে অন্যান্য সমস্যার সমাধান, অপরপক্ষে অন্যান্য সমস্যার সমাধানের সাথে সাথে মাদকমুক্ত সুস্থ জীবনযাপনে সহায়তা করা।

মাদকাসক্তরা আমাদের কারো না কারো আপনজন। তাদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ না করে সহানুভূতিশীল হয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করে তাদের চিকিৎসার মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য সরকারের সাথে সাথে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহায়তা করা প্রয়োজন। মাদকমুক্ত সমাজ উন্নত বাংলাদেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এজন্য মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা।

# অকালে ঝরে যাওয়া এক সম্ভাবনা

## লাকী ইনাম

আজ আমরা মায়াভরা হৃদয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে স্মরণ করব অকালে ঝরে যাওয়া এক সম্ভাবনা ছোট্ট সোনামনি শেখ রাসেলকে। বাঙালি জাতি যুগে যুগে ক্ষণজন্মা ও মহান ব্যাক্তিত্বদের জন্ম দিয়েছে। অর্ধশত বছর আগে আমাদের প্রিয় রাসেল সোনা জাতির পিতা-সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র হয়ে এ পৃথিবীকে আলো করে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতেই হয় মাত্র ১১ বছর বয়সে '৭৫ এর ১৫ আগস্ট কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্যদের হাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিশু রাসেল ও নির্মমভাবে নিহত হয়।

ছোট্ট রাসেল আমাদের রাজকুমার। রাসেল সোনার কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রাণচঞ্চল, মিষ্টিমুখের এক অনাবিল ছবি। ওর নাম কি করে রাসেল হলো সবাই জানতে চায়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিক, চিন্তাবিদ বার্ট্রান্ড রাসেলের ভক্ত। দার্শনিক রাসেলের লেখা তিনি পড়তেন এবং বেগম মুজিবকেও পড়ে শোনাতেন। বেগম মুজিবও ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেলের ভক্ত- আর তাই ১৯৬৪ সালের হেমন্তের শিশিরস্নাত রাতে রাসেলের জন্মের পর এই নামটিই, বঙ্গবন্ধু ও ফজিলাতুন নেছা মুজিব তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। রাসেল সোনার ছোট্ট মুখে সেকি মায়া। দেখেই মনে হচ্ছিল যেন-পুরো দেশটা জুড়ে একদিন মায়া ছড়াবে সে বাবারই মতো। সে স্বপ্ন দেখবে এ দেশ হবে সোনার দেশ। মাঠভরা ফসল আর গোলাভরা থাকবে ধান। পুকুর ভরা মাছ আর গোয়াল ভরা গরু। এ দেশের সকল শিশু থাকবে আনন্দে আর সুখে, তাদের কল কাকলীতে মুখরিত হবে প্রাঙ্গণ। কিন্তু না- দানবের দল তা হতে দেয়নি। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে রাসেলকে চলে যেতে হয়েছে দূর অজানার দেশে। তাই প্রতিবছর রাসেল দিবসে রাসেলের জন্মদিনে আমাদের সবার চোখ হয়ে ওঠে ছলছল। সব শিশুদের চোখ অশ্রুজলে টলমল, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন আমাদের এই ছোট্ট রাজকুমারও বেঁচে থাকবে আমাদের সবার অন্তরে। এ দেশের আকাশ-নদী, ফুল-পাখি আর পাহাড়-ঝরণার কলতানে।

চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া রাসেল সোনা ছিল অত্যন্ত মেধাবী ও মায়ায়ভরা প্রাণের অধিকারী। পায়রা পুষতে ভালোবাসতো, ভালোবাসতো বৃক্ষরাজি। নিজের ছোট্ট সাইকেলটি ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় বাহন। সকাল বিকেল ক্রিং ক্রিং ক্রিং-বত্রিশ নম্বর বাড়িটার ছোট্ট অলিন্দে দ্রুততালে চক্কর দিতে বড়ো ভালোবাসত রাসেল। শেখ রাসেল বাঙালি জাতির কাছে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। পুরো বাঙালি জাতি শেখ রাসেলের মধ্যে খুঁজে পায় তাদের ছেলে বেলাকে। বাঙালির শৈশব বেঁচে থাকবে শেখ রাসেলের মধ্য দিয়ে। তার অসময়ে চলে যাওয়া বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমাদের এই বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস। নৃশংস ক্ষমতালোভী কিছু

মানুষেরর ক্ষমতার লোভে বলী হতে হয়েছে শিশু রাসেলকে। তার এই অকাল প্রয়াণ ক্রোধে জাগ্রত করে আমাদের বিবেক। আমরা জানি ইতিহাস কথা কয়।

ইতিহাস জেগে ওঠে, ইতিহাস চির জাগরুক। যে জাতি নিজের ইতহাসকে মিথ্যাচারে রুপান্তরিত করে সে জাতি কোনোদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। শেখ রাসেল বাঙালি জাতির সেই ইতিহাসে এক জলন্ত প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি। তার স্মৃতিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে নির্মিত হয়েছে শেখ রাসেল মঞ্চ, শেখ রাসেল শিশু যাদুঘর, শেখ রাসেল শিশু গ্রন্থাগার। তার নামে রাজধানী ঢাকার বুকে রয়েছে একটি স্কেটিং স্টেডিয়াম, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ। এভাবেই শেখ রাসেল অমর হয়ে থাকবে বাঙালি জাতির হৃদয়ে, মাথার মনি হয়ে, হৃদয়ের পদ্ম হয়ে। শেখ রাসেল সকল শিশুর প্রতি ঘটে যাওয়া সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ। যারা শিশু রাসেলকে তার বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তাদের জানাই ধিক্কার। ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে তারা নি:সন্দেহে।

কবির ভাষায়-

রাসেল এখন কোথায়?
ছোট্ট একটা পাখী এসে
এই তো বলে গেল
রাসেল ছিল, রাসেল আছে
তোমার আমার মনে
ইচ্ছা হলেই বলছি কথা
দেখছি প্রতিক্ষনে
তাইতো সেদিন বললো রাসেল
'থাকবো আরও ভালো
সবাই মিলে সোনার বাংলা
গড়তে যদি পারো'।

লেখক : নাট্য ব্যক্তিত্ব ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।

# মানব সম্পদ উন্নয়ন

## কাজী তামান্না ইসলাম

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির স্বল্প আয়তনের, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবের এই দেশে প্রধান সম্পদ মানুষ। মানব সম্পদ উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি মধ্যম সারির। সার্বিকভাবে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। সারা বিশ্বের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি সবচেয়ে ভালো নরওয়েতে,এরপর আছে যথাক্রমে আয়ারল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড। বাংলাদেশে আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানব উন্নয়নের এই তিনটি সূচকই করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের আয় ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হলেও শিক্ষাখাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। সামাজিকখাতে উন্নয়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশে আয়-বৈষম্য প্রকট। আয়-বৈষম্য সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য, শিক্ষাখাতে ভালো করছে। যেমন গড় আয়ুর হিসেবে ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর, ভারতের গড় আয়ু ৬৯.৭ বছর। বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ জীবিত শিশু জন্মগ্রহণকালে ১৭৩ জন মা মারা যায়। বাংলাদেশের ২৫ বছর ও এর বেশি বয়সি নারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩৯.৮ শতাংশ কমপক্ষে মাধ্যমিক পাস। আর পুরুষদের মধ্যে এই হার ৪৭.৫ শতাংশ। শ্রমশক্তিতেও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ৩৬.৩ শতাংশ হয়েছে। প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ খুব তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। একজন সুস্থ কর্মী স্বাস্থ্যহীন বা রোগা কর্মীদের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল বলে স্বাস্থ্য খাতে খরচকে শিক্ষা খাতের চেয়ে প্রত্যক্ষ অবদানকারী হিসেবে দেখা হয়। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের বিচারে স্বাস্থ্যের শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুবসমাজের আইকন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি,উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। শুধু তাই নয় যুবরা সাহসী, বেগবান, প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভবনাময় এবং সৃজনশীল। এরই ধারাবাহিকতায় যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে সমায়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন বিদ্যমান জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করা। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী শ্রমের চাহিদা পূরণ করা, প্রযুক্তির পরিবর্তনে কর্ম-সংকোচনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মোপযোগী করা।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক সংখ্যক দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিবিএসের সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ,২০১৬-১৭ অনুযায়ী দেশে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি। এই বিপুল কর্মক্ষম জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নত দেশ গঠনে সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। Human Development Report ২০২০ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৩ তম। দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের উপরে আছে শ্রীলংকা (৭২), মালদ্বীপ (৯৫), ভূটান (১২৯) ও ভারত (১৩১)। এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ দুই ধাপ এগিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান এবার দুই ধাপ করে পিছিয়েছে। জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের অনুপাতে বাংলাদেশের চেয়ে ভারত এগিয়ে আছে। ভারতে প্রতি ১০ হাজার নাগরিকের জন্য গড়ে ৮.৬ জন চিকিৎসক আছে। বাংলাদেশে এই সংখ্যা ৫.৮।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ২৪.৯৩ শতাংশ, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ২৩.৭৫ শতাংশ। এ অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমুহ যেমন- শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হচ্ছে এবং হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তাই এ দুই খাতকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ দুই খাতের মোট বরাদ্দ ১ লাখ ০৪ হাজার ৬৮৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৭.৩৪ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

কোভিড-১৯ অভিঘাতের ক্রান্তিকাল কাটিয়ে উঠে শিক্ষার উন্নয়নকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে আধুনিক ও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। সরকার ইতোপূর্বে রূপকল্প -২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা জাতীয় শিক্ষানীতি -২০১০ হিসেবে পরিচিত। এ শিক্ষানীতির মূল

উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা বিশেষত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে বিবেচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের উল্লেখযোগ্য হলো, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে প্রথাগত শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রমের সাথে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে একীভূত করে শিক্ষক - শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের Online এন্ট্রিকরণের কাজ চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর মাধ্যমে পরিদর্শন করা হচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারার অন্তর্ভুক্তকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে সাধারণ ধারার ৬৪০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে ভোকেশনাল কোর্স পরিচালনা করছে। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারের ভোকেশনাল কোর্স পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ৪৯ পলিটেকনিক ও ৬৪ টি টিএসসি এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি মোট ১০ হাজার ৪৫২ টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ১১৯ টি। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে গত একদশকে শিক্ষার্থী ভর্তির হারে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ২০২০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল ১৭.১৪ শতাংশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২৫ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ইতোমধ্যে সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছে। গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তাসহ নানারকম সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ১ শতটি উপজেলায় ১ টি করে টেকনিক স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প, ৪ টি বিভাগীয় শহরে ( সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর) ১ টি করে মহিলা

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, ২৩ জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং ৪ টি বিভাগে ( চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) ১ টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

আজকের যুব সমাজই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা -দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত- সমৃদ্ধি ও আত্মমর্যাদাশীল সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধান কারিগর। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমেই যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে তাদের সচেতন করা, আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা এবং কর্মসংস্থানের পথ নির্দেশনা প্রদান করার মাধ্যমে জাতি পাবে উন্নত বাংলাদেশ।

লেখক : উন্নয়ন কর্মী।

# কাজী নজরুল যেভাবে বাংলাদেশের হলেন

## ইয়াকুব আলী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক বড়ো কীর্তি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনা। নজরুল দেশকে ভালোবেসেছিলেন বুক উজাড় করে। ভুল বললাম। দেশের সাথে তার অস্তিত্ব মিশে গিয়েছিল। দেশ মানে গোটা ভারতবর্ষ। তাঁর জন্ম বিহারের পাদদেশে বর্ধমানের রুক্ষ, শুষ্ক, বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশে। কিন্তু বাংলাদেশ তার বিপরীত-- সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। নানা উপলক্ষ্যে তিনি এসেছেন বাংলাদেশে। কখনো শুধুই বেড়ানোর জন্য, আবার কখনো কর্ম উপলক্ষ্যে, কখনো সভা-সমিতিতে যোগ দিতে। এমনকি সংসদ (বঙ্গীয় ব্যাপস্থাপক সভা) নির্বাচনে লড়তেও এসেছেন এই পূর্ববঙ্গে- ঢাকা-ফরিদপুরে। তিনি বাংলাদেশকে বড়ো আপন মনে করেছেন। বাংলাদেশও তাকে টেনে নিয়েছে আপন মমতায় যেমন কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবী স্নেহকাঙাল নজরুলকে বরণ করেছিলেন পুত্রস্নেহে।

বঙ্গবন্ধুর কল্যাণে এই বাংলাদেশই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল কবির চিরদিনের ঠিকানা। ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম নজরুল ভ্রমণ করেছেন বাংলাদেশের নানা জায়গায়- ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর সন্দ্বীপ (তখন সন্দ্বীপ নোয়াখালীর অধীন ছিল), ফেনী, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, যশোর, ফরিদপুর, জয়দেবপুর, কুচ্ছিা, কুড়িগ্রামে এমনকি জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে পর্যন্ত। কুমিল্লার আলী আকবর খানের চক্করে পড়ে তো তিনি কুমিল্লার জামাই-ই হয়ে গেলেন। ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক নিবন্ধ থেকে জানা যায় নজরুল বাংলাদেশের ২৬টি জেলা সফর করেছেন।

ঢাকা থেকে কলকাতা এখন যত দূরের মনে হয় কবির বয়সকালে কিন্তু সেরকম ছিল না। এখনকার মত মানসিক দূরত্বটি ছিল না। এসময়ে 'অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা' মনে হলেও তখনকার দিনে কলকাতার সঙ্গে বাংলা ভূখন্ডের মানুষের একটা স্মার্ট যোগাযোগই ছিল বলেই মনে হয়। নদীপথে গোয়ালন্দঘাট এরপর ট্রেনে কলকাতা। কুমিল্লা থেকে নজরুল দুই দিনে কলকাতা পৌঁছতেন। নিত্য চলত কলকাতামুখী হাজার হাজার মানুষের মিছিল।

সাহিত্যিক আবুল ফজল তার স্মৃতিকথা 'রেখাচিত্র' গ্রন্থে লিখছেন: '১৯২২ সালে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই বের হলো নজরুলের ব্যথার দান ও অগ্নি-বীণা (বই দুটি)। তখন আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। থাকি জায়গীরে- কোনো রকম আর্থিক সঙ্গতি নেই। তবু অর্ডার দিয়ে কলকাতা থেকে পার্সেলেই বই দুটো আনালাম। ... ... ... তিন মাসের চাঁদা অগ্রিম পাঠিয়ে আমি হয়ে গেলাম 'ধুমকেতু'র গ্রাহক।'

লক্ষ্য করুন, চট্টগ্রামের মাদ্রাসার ক্লাস টেনের এক ছাত্র কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে পার্সেলে বই আনায়! যেন আজকের ডিজিটাল দিনে রকমারিতে অর্ডার দিয়ে বই পাওয়ার মতো। ঢাকায় বসে ঢাকার বইয়ের অনলাইন পরিবেশকের বই পেতেও সপ্তাহ পার হয়ে যায়। আবুল ফজলের তারুণ্যের যুগে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রামের বাস বা ট্রেন যোগাযোগ ছিল না। একবার আবুল ফজল দুই বন্ধুর সাথে ঢাকা থেকে হেঁটেই চট্টগ্রাম চলে গিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের মানুষ ট্রেনে আসত চাঁদপুরে। সেখান থেকে স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ হয়ে সেখান থেকে আরেক ট্রেনে চেপে ঢাকার ফুলবাড়িয়ায়। আর কলকাতাগামীরা চাঁদপুর থেকে যেত গোয়ালন্দে। সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদা। কাজেই চট্টগ্রামের মানুষের কাছেও ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা আর কলকাতা যাত্রার মধ্যে খুব বেশি কি ফারাক ছিল? মনে হয় না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল উভয়ই প্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে জনগণের জাগরণ লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণেও বলেছেন : 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি বাঙ্গালিরে, হে বঙ্গজননী, রেখেছ বাঙ্গালি করে, মানুষ করোনি। কবিগুরুর মিথ্যা কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার বাঙ্গালি আজ মানুষ।' স্বাধীনতার পর দুজনের একজনের গানকে জাতীয় সংগীত ও অন্যজনের গানকে বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এভাবে নবগঠিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করা হয়। প্রায় তিন দশক আগে যার 'সৃষ্টিসুখের উল্লাস' থেমে গিয়েছিল সে রকম একজন কবির জন্য ছিল এটি একটি বিরাট স্বীকৃতি।

উপমহাদেশে স্বাধীনতার প্রথম দাবি উত্থাপনকারী কবি পশ্চিমবঙ্গে দুর্দিনে আছেন, চরম অবহেলার শিকার হচ্ছেন ভেবে বঙ্গবন্ধু কবিকে ঢাকায় এনে সাড়ম্বরে তার জন্মদিন উদ্‌যাপনের চিন্তাভাবনা করেন। উদ্‌যাপন তো হতেই হবে। তিনি মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধের মাধ্যমে ছিড়েছেন বাঙালির ২৩ বছরের গোলামীর জিঞ্জির! উদ্‌যাপনের উপলক্ষ্যই বটে। সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ৪৭ এর দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলায় প্রভাবশালী ও বুদ্ধিজীবী মহলে নজরুলকে নিয়ে অনেক রাজনীতি হয়েছে। ভারতের হিন্দুদের কাছে তিনি 'নেড়ে' 'মুসলমান কবি' কাজেই পরিত্যাজ্য। শরিফ মুসলমানদের কাছে 'কাফের' 'বেইমান'। দেশবিভাগের পরপর সাচ্চা পাকিস্তানপন্থি কবি-সাহিত্যিকদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন নজরুল 'পাকিস্তানের আদর্শের অনুসারী নন'- তিনি পাকিস্তান বা কায়েদে আযমকে নিয়ে কোনো কবিতা লেখেননি। তিনি পাকিস্তানের কবি হন কীভাবে? হিন্দুয়ানি অংশ বাদ দিয়ে নজরুল রচনাবলির পাকিস্তান সংস্করণ প্রকাশেরও প্রস্তাব করেন প্রতিষ্ঠিত এক কবি। নজরুলকে কেটে ছেটে গ্রহণ করার আগ্রহ দেখান কেউ কেউ। কিন্তু ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন পূর্ববঙ্গে

নজরুলকে প্রাসঙ্গিক রেখেছিল শক্তিশালীভাবেই। এ বঙ্গে মানুষের মন থেকে নজরুল কখনো বিস্মৃত হননি।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রথম বিদেশ সফরে যান কলকাতায়। সে সফরে তার যা কিছু অর্জন তার মধ্যে অন্যতম হলো কবিকে বাংলাদেশে আনার পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর এই পদক্ষেপটি এখনো সেভাবে আলোচিত/মূল্যায়িত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে একথা বলা যায় যে, এর মাধ্যমে প্রায় বিস্মৃত কবিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা হলো। ৩০ বছর আগে শেষ হয়ে যাওয়া কবিকে বাঁচিয়ে তোলা হলো। কলকাতা সফরকালে জাতির পিতাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে রাখা হয় পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে। রাজভবন হলো রাজ্যপালের (গভর্নর) অফিসিয়াল বাসভবন। রাজ্যপাল তখন পশ্চিমের অ্যান্টনি ল্যান্সলট ডায়াস। বঙ্গবন্ধু তাঁর কাছেই কবিকে বাংলাদেশে আনার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তিনি কবিকে ঢাকায় এনে ধুমধাম করে কবির ৭৩ তম জন্মদিনটি পালন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রাজ্যপালে পরামর্শে বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন। এরই মধ্যে খবর পাঠিয়ে রাজভবনে কবির পরিবারের সদস্যদের আনিয়ে আলাপ করেন বঙ্গবন্ধু। কবির দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধকে তিনি জানিয়ে রাখেন যে, বাংলাদেশ সসম্মানে নজরুলকে নিয়ে গিয়ে সংবর্ধনা দিতে চায়।

এরপর চলে চিঠি-চালাচালি, শলা-পরামর্শসহ নানামুখী কূটনৈতিক তৎপরতা। কবির পুত্ররা ঢাকায় এসে আলোচনা করে যান। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট দাবি উত্থাপনকারী কবি নজরুল ততদিনে ভারতে অনেকটাই উপেক্ষিত। বাকশক্তিহীন, বোধ-বুদ্ধিহীন, অসুস্থ কবির স্ত্রী গত হয়েছিলেন তারও ১০ বছর আগে ১৯৬২ সালে। কাছের মানুষজনও ধীরে ধীরে সরে পড়েছিলেন। আমজনতার উৎসাহ ফুরিয়ে গিয়েছিল বহু আগেই। মুসলমানরা তো 'কাফের' হিসেবে আগেই মাইনাস করে রেখেছিল। সবার নজরুল ততদিনে আর কারোরই না। কমিউনিস্টরা একসময় কবিকে নিজেদের সম্পদ মনে করলেও অকেজো নজরুলকে তারা ভুলেই গিয়েছিল। কলকাতারও তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। খাদ্য আন্দোলনে কলকাতা ক্লান্ত শ্রান্ত। এদিকে মাওবাদের জোয়ার শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। নকশালবাড়ি আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। ফলে কাজী নজরুল ইসলাম নামের 'না-হিন্দু-না-মুসলমান' মুখ এক কবি থাকবেন না যাবেন তা নিয়ে কলকাতার ভাববার অবকাশ কোথায়? বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এরূপ মন্তব্যই করেছেন পশ্চিমবঙ্গের নজরুল গবেষক অর্ক দেব। সৌগত রায় নামের একজন প্রবীণ রাজনীতিক বলেন, নজরুলকে নিয়ে উন্মাদনা ও আবেগগুলো থিতিয়ে আসায় তার ঢাকা যাওয়া নিয়ে কোনো হই-চই হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে না।

যাহোক, নজরুলকে আনার জন্য বঙ্গবন্ধু কলকাতায় পাঠান তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি তৎকালীন গণপূর্তমন্ত্রী মতিউর রহমান এবং আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুস্তাফা সারোয়ারকে। 'হে কবি' সম্বোধন করে নজরুলকে চিঠি লিখে দেন বঙ্গবন্ধু। চিঠিতে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিনিধিদ্বয়ের মারফতে কলকাতায় প্রতিবাদের কথা জানা যায়। তারা লক্ষ্য করেন দমদম থেকে কলকাতাগামী রাস্তার দুপাশের পোস্টারিং করা হয়েছে : 'অসুস্থ কবি নজরুলকে বাংলাদেশে নেওয়া যাবে না'। দুই চার জন হয়তো প্রতিনিধিদলকে দেখানোর জন্য বিক্ষোভও করে থাকবেন। তবে অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যায় জর্জরিত কলকাতা নগরীতে এসব দায়সারা আন্দোলনের তেমন প্রভাব পড়েছিল বলেও মনে হয় না। তবে হ্যা, কবির ছোটো ছেলে অনিরুদ্ধ কবিকে ঢাকায় আনার বিরুদ্ধে ছিলেন। যদিও বড়ো ছেলে সব্যসাচীর এ ব্যাপারে উৎসাহ ছিল খুব। অবশেষে ১৯৭২ সালের চব্বিশে মে সকাল ১১ টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে চড়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেন কবি। কবির সঙ্গে আসেন বড়ো ছেলে কাজী সব্যসাচী ও তার স্ত্রী উমা কাজী, ছোটো ছেলে কাজী অনিরুদ্ধ ও তার স্ত্রী কল্যাণী কাজী, তাদের সন্তানেরা এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডি কে রায়। কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে ততক্ষণে লোকে-লোকারণ্য পুরো তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর। এত মানুষ সেখানে ভীড় জমায় যে, বিমানের সিঁড়ি লাগানোও নাকি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না অপেক্ষামান হাজার হাজার জনতাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে গোপনে কবিকে নামানো হয় বিমানের পিছনের দরজা দিয়ে। কোলে করে ওঠানো হয় অ্যাম্বুলেন্সে। স্বাভাবিক রাস্তায় নয়, বিমানবন্দরের উত্তর দিকের ফ্লাইং ক্লাবের পথ দিয়ে কবিকে ধানমন্ডিতে তাঁর জন্য নির্ধারিত বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। বঙ্গবন্ধু নিজে বাড়িটি পছন্দ করে এর নাম দিয়েছিলেন 'কবি ভবন'। সরকারের বরাদ্দ করা সেই বাড়িটি এখন নজরুল ইনস্টিটিউট।

নজরুলকে কবি ভবনে নেওয়ার পর সেখানে ফুলেল শুভেচ্ছায় স্বাগত জানাতে ছুটে যান দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবি পরিবারকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তাৎক্ষণিকভাবে কবির পেনশন বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়। এক এক করে কবিকে স্বাগত জানাতে আসতে থাকেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। হাজার হাজার মানুষ ফুল হাতে ভিড় জমায় কবি ভবনের আশাপাশে। কবি ভবনে প্রতিদিন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা শুরু হয়। কয়েকদিন পর জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কবিকে দেখতে আসেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে কবিকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে রাখার দাবি জানান। ত্রিশের দশক বাদ দিয়ে সারাজীবন কবির অর্থকষ্টে কাটলেও ঢাকায় এই প্রথম কবির জীবনে অর্থাভাব দূর হয়। শুরু হয় আপাত সুখের পর্ব। চিকিৎসাসহ সেবা-শুশ্রুষায় কবির স্বাস্থ্য কিছুটা উন্নতির দিকে যেতে থাকে। কিন্তু হলে কি হবে। বয়স বাড়ছিল। এভাবে সময় যায়। সময় গড়িয়ে যায়। পরবর্তী

বছরের জন্মদিন আসে। ভারত থেকে কবিকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জোরদার হয় না। তাগাদাও আসে না।

তবে বাংলাদেশের মানুষের উচ্ছ্বাস কিন্তু চলতেই থাকে। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই কবিকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাখা হয় ১১৭ নম্বর কেবিনে। ১৯৭৬ সালে কবিকে একুশে পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক না হলে পদক দেওয়া যায় না বলে ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। এ সময় তিনি পিজি হাসপাতালে ভর্তি। অবশেষে ৭৭ বছর বয়সে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে চিকিৎসাধীন কবি পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গানের বুলবুলি চিরমুক্তি পেলেন অনন্ত আকাশে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন কবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তিনি ঢাকায় আসতেন কি না। এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ কবিকে আনা হয়েছিল সাময়িকভাবে। জন্মদিন পালনের জন্য। অবশ্যই আসতেন। কারণ বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আলাদা টান ছিল। তিনি নিমন্ত্রণ পছন্দ করতেন। বয়সকালে কবি কলকাতা থেকে কুড়িগ্রাম এসেছিলেন স্কুলের একটি মিলাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে। ঢাকায় আসাসহ স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে বিবিসি বাংলাকে কবি পরিবারের সদস্য সঙ্গীতশিল্পী সোনালি কাজী বলেছেন, কবিকে ঢাকায় পাঠাতে তাঁর পরিবার রাজি হয়েছিল প্রধানত উন্নত চিকিৎসার আকর্ষণে। 'তিরিশ বছর ধরে একটা মানুষ নির্বাক, তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করছে না। কলকাতার ডাক্তাররাও একরকম জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এই অবস্থায় একটি নতুন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন তাঁরা যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিকে নিয়ে যাবেন এবং ভালো করে চিকিৎসা করাবেন। তখন কবির পরিবার যদি তাঁর কথায় আস্থা রাখে, তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়?' ভিন্ন মতের ওরা বলে, ঢাকার লোকেরাই তো তখনকার দিনে চিকিৎসার জন্য কলকাতা যেত। ঠিক আছে, যেত। কিন্তু কারা যেত? কলকাতায় ততদিনে নজরুল যে একজন অর্ডিনারি পাবলিক! প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে সংবর্ধনা দেবার জন্য ঢাকায় আনা হচ্ছে। কাজেই কলকাতার চেয়ে ঢাকায় চিকিৎসাসহ যত্নাদি যে বেশি হবে একথা কে না বোঝে?

বাহাত্তর সালে কাজী নজরুল ইসলামের দেশান্তরকে দেশান্তর বলা যায়? বাংলাদেশও কি তার দেশ নয়? ৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে কিন্ত পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের পাশাপাশি কবিকে মাসিক ২০০ রুপি করে ভাতা দিত। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান এ ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ৩৫০ টাকা করে ভাতা দিতে শুরু করে। সে হিসেবে বলা যায়, সাহিত্যিকের দেশান্তর বলতে যা বোঝায় নজরুলের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। বাংলাদেশ নজরুলের প্রিয় জায়গা। কবিকে ভারত যা দিতে পারেনি বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি দিয়েছে। কবির

নামে এদেশে বহু স্কুল-কলেজ, ছাত্রাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, মিলনায়তন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হয়েছে। সর্বশেষ ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতের নজরুল অ্যাকাডেমির সভাপতি কবি জয় গোস্বামীর ভাষায়, নজরুলকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রভূত সম্মান দিয়ে, বিরাট মর্যাদা দিয়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এমন এক সময়ে যখন তাঁর "মেমোরি অব ওয়ার্ডস নেই, শব্দরা তাঁর স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে, একটা লাইনও তিনি লিখতে পারেন না - তারপরও তাঁকে আপ্যায়নে, সম্মানে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষেরা। .... আর এখানেই নজরুলের অনন্যতা'। গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে যে নজরুল চর্চা পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও অনেক বড়ো ক্যানভাসে হয়েছে, সে কথাও নির্দ্বিধায় মানেন তিনি।

লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রেস অ্যান্ড মিনিস্টিরিয়াল পাবলিসিটি), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।

# স্মার্ট বাংলাদেশ

## তাসনিম রিদওয়ান

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনি ইশতেহারে 'রূপকল্প -২০২১' বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন, যার মূল শিরোনাম ছিল " ডিজিটাল বাংলাদেশ " । আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও বিকাশের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা করে ' ভিশন -২০২১' বা ' রূপকল্প -২০২১' বাস্তবায়নের ঘোষণা করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমানের চার স্তম্ভ যথা- কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই- গভর্নেন্স এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশনের আলোকে বিগত ১৩ বছরে নানা উদ্যোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে।

আজ থেকে ১৩ বছর আগে এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়েছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছিলেন। তারপর থেকেই ধারাবাহিকভাবে ডিজিটাল শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ এখনো 'ফাইভ জি' চালুর বিষয় চিন্তাও করেনি। অথচ বাংলাদেশে ইতোমধ্যে 'ফাইভ জি' চালু হয়েছে। ২০২৩ সালে আসছে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল। সরকার ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট উচ্চগতির ডেটা দিচ্ছে যার মাধ্যমে প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে। আগামীর পৃথিবী হবে ডেটা নির্ভর। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকবে। ডেটার চাহিদা পূরণে ইকোসিস্টেম দাঁড় করাতে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এবং গ্রাহক স্বাচ্ছন্দ্যে তা গ্রহণ করছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটকে সাশ্রয়ী ও জনবান্ধব করার জন্য ইতোমধ্যে সরকার 'একদেশ একরেট' প্যাকেজ চালু করেছে।

২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সুবিধা এখন দেশবাসী পাচ্ছে। আমাদের নতুন প্রজন্ম জন্ম থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে গড়ে উঠেছে। তাদের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। অথচ বিষয়টি আজ থেকে এক যুগ আগেও স্বপ্নের মতো ছিলো।

বৈশ্বিক করোনা অতিমারির সময়ে সব কিছু যখন বন্ধ ছিল তখন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে ব্যবসাবাণিজ্য, অফিস আদালত, শিক্ষাসহ অতি প্রয়োজনীয় ও জরুরি সেবা

সচল রাখা হয়েছিল। করোনা অতিমারি মোকাবিলায় দেশীয় আইটি প্রকৌশলীদের দ্বারা তৈরি ' সুরক্ষা ' অ্যাপস চালু করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ভ্যাকসিন নিবন্ধন, ভ্যাকসিনের তথ্য সংকলন,ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট ইস্যু ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশের আইটি প্রকৌশলীরা এ কাজের মাধ্যমে তাদের দক্ষতাই শুধু প্রমাণ করেননি, এর মাধ্যমে দেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা, দেশপ্রেম এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে। দেশবাসী তাদের এ পরিশ্রমকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করেছে। করোনাকালীন corona.gov.bd ওয়েব পোর্টালে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষেরও অধিকবার তথ্য ও সেবার জন্য নাগরিকগণ যুক্ত হয়েছেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাকে মেশিন ইন্টেলিজেন্সও বলা হয়। কম্পিউটার সায়েন্সের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি প্রধানত যে চারটি কাজ করে তা হলো কথা শুনে চিনতে পারা,নতুন জিনিস শেখা, পরিকল্পনা করা এবং সমস্যার সমাধান করা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স স্মার্টফোনে ব্যবহার হচ্ছে সুন্দর সেলফি তুলতে, গ্রাহকের অভ্যাস ও প্রয়োজনীয়তা মনে রেখে কাস্টমাইজড সেবা প্রদান করা,ভয়েস শুনে বিভিন্ন সেবা প্রদান ইত্যাদি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত বছর বিজয় দিবসে সিটি ব্যাংক বিকাশে' র সাথে যৌথভাবে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ঋণ প্রদানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিকাশ হিসাবধারী বিকাশ অ্যাপ ব্যবহার করে ঋণের জন্য আবেদন করলে সিটি ব্যাংক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে স্বয়ংক্রীয়ভাবে ঋণ মঞ্জুর করে দিবে। এখানে কোন মানুষের সাহায্য লাগবে না। আবেদন করার সাথে সাথে লোন পাওয়া যাচ্ছে। কোন জামানত ও কাগজপত্র লাগছে না। ব্যাংকের কোন ঋণ প্রসেসিং ফিও নেই। বিকাশ একাউন্ট ব্যালেন্স থেকে মাসিক ভিত্তিতে ঋণ আদায় করা হয়ে থাকে। ইন্টারেস্ট রেটও সহনীয়। ৩৬৫ দিন ২৪ ঘন্টা এ সুবিধা গ্রাহকরা পাচ্ছেন। ব্যাংকিং খাতে এটা একটা যুগান্তকারী কার্যক্রম। এছাড়াও গার্মেন্টস কারখানায় রোবটের ব্যবহার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। ওয়াল্টন কারখানায় ফ্রিজের কম্প্রেসার অ্যাসেম্বেল করতে ব্যবহার করা হচ্ছে রোবোটিক প্রযুক্তি। আইসিডিডিআরবি 'কারা' নামে টেলি অপথালমোলজি প্রযুক্তি দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাপ্সি সনাক্তের একটি আধুনিক পদ্ধতি চালু করেছে। 'বন্ডস্টাইন ' সফলভাবে মেডিক্যালের প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানোর জন্য আই ও টি ডিভাইসের মাধ্যমে স্মার্ট ট্রাকিং ব্যবহার করে আসছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মানুষকে ১ শত বছর সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এখনকার প্রজন্ম আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত ও সচেতন হচ্ছে। আমাদের শিশু কিশোররা জন্ম থেকেই টেকনোলজির দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিশ্ববাসীর দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ ইতিবাচকভাবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে নিজেকে পরিচিত করতে সক্ষম হবে এটাই প্রত্যাশা।

বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠায় স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ ভিশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠিত হয়েছে। সরকারের পরবর্তী ভিশন 'স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১' বাস্তবায়নে ১৪টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর এসব সিদ্ধান্ত এসেছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'-এর তৃতীয় সভায়। 'স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১' এর আওতায় প্রধান অঙ্গ হবে স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট কৃষি , স্মার্ট বাণিজ্য, স্মার্ট পরিবহণ ইত্যাদি। অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলা এবং পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর ভারনারেবল এক্সেপশন (ডাইভ) উদ্যোগের আওতায় আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ। স্মার্ট ও সবত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তুলেতে ডিজিটাল লিডারশিপ অ্যাকাডেমি স্থাপন। এটি বাস্তবায়ন করবে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। শিক্ষার্থীদের অনলাইন কার্যক্রম নিশ্চিতে 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম' এর আওতায় শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। যা বাস্তবায়ন করবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। কুটির, ছোটো, মাঝারি ব্যবসাগুলোর জিডিপিতে অবদান বাড়াতে এন্টারপ্রাইজভিত্তিক ব্যবসাগুলোকে বিনিয়োগ উপযোগী স্টার্টআপ হিসেবে প্রস্তুত করা। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। এন্টারনেটিভ স্কুল ফর স্টার্টআপ এডুকেটরস অব টুমোরো (এসেট) প্রতিষ্ঠা। এটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এটি বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশ নলেজ ডেভেলপমেন্ট পার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা। এটি বাস্তবায়নে থাকছে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। সেন্টার ফর লার্নিং ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন অব নলেজ (ক্লিক) স্থাপন। বাস্তবায়নে থাকছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠা। বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। সেলফ অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্টরপ্রেইনরশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিড) প্লাটফর্ম স্থাপন। এটি বাস্তবায়ন করবে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। কটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লিংকেজ ল্যাব (সেল) স্থাপন। তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তর এটি বাস্তবায়ন করবে। সার্ভিস এগ্রিগ্রেটর ট্রেইনিং (স্যাট) মডেলে সরকারি সেবা ও অবকাঠামো নির্ভর উদ্যোক্তা তৈরি করা। বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

সকল ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রিয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডে নিয়ে আসা। এটি বাস্তবায়নে থাকবে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। ডেটা নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সার্ভিস আইন, শেখ হাসিনা ইন্সটিটিউট অব ফন্ট্রিয়ার টেকনোলজি (শিফট) আইন, ইনোভেশন

ডিজাইন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিওরশিপ অ্যাকাডেমি (আইডিয়া) আইন, এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) আইন, ডিজিটাল লিডারশিপ অ্যাকাডেমি আইন ও জাতীয় স্টার্টআপ পলিসি প্রণয়ন। এ বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

আমাদের শিশু কিশোররা জন্ম থেকেই টেকনোলজির দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ২০৪১ এর বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত বৈসম্যহীন উন্নত বাংলাদেশ,যেখানে বসবাস করবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম।

লেখক : ফ্রিল্যান্সার।

# রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আমাদের অর্থনীতি

**জাহিদ মুরাদ**

বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ার দুরত্ব প্রায় ৪ হাজার ৩ শত কিলোমিটার এবং ইউক্রেনের দুরত্ব প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব ইউক্রেনের দুটি অঞ্চল লুহ্যানস্ক ও দানইয়াস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন এবং একই দিন ভোরে সেখানে স্থল,আকাশ এবং জলপথে সামরিক অভিযান শুরু করেন। রাশিয়া যুদ্ধের কৌশল হিসেবে শুরুতেই ইউক্রেনের বড়ো বড়ো সমুদ্র বন্দরগুলো ব্লক করে ফেলে। ফলে যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনের বন্দরগুলোর কম বেশি শতকরা ৮০ শতাংশ অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ইউক্রেন থেকে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধে ইউক্রেন বাহিনীও তাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইউক্রেনকে সাহায্যের হাত বাড়ায় আমেরিকাসহ তাদের ইউরোপীয় মিত্ররা। প্রথমেই আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা তাদের দেশে থাকা রাশিয়ার সম্পদ জব্দ করে। এর পাশাপাশি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নানারকম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বৃটেন, জাপান, কানাডা এবং আমেরিকাসহ আরও কয়েকটি দেশ রাশিয়াকে অর্থনৈতিক অবরোধ করার লক্ষ্যে সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা সম্মিলিতভাবে রাশিয়ার প্রথম শ্রেণির কয়েকটি ব্যাংকের উপর সুইফট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এখানে উল্লেখ রাশিয়া প্রতিদিন কম বেশি ৪ লাখ লেনদেন সম্পন্ন করে এই সুইফটের মাধ্যমে। এই সুইফট বা Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication হচ্ছে দুইশটিরও বেশি দেশে ব্যবহৃত একটি আন্তর্জাতিক পেমেন্ট ম্যাসেজিং সিস্টেম, যা কোনো আন্তর্জাতিক লেনদেনের তথ্য ঐ অর্থের প্রেরক ও প্রাপককে ম্যাসেজের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুততার সাথে জানিয়ে দেয়। ফলে কার্যত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়ে। রুশ ব্যবসায়ীরাও পড়েছে নিষেধাজ্ঞার আওতায়।

আমেরিকা এ যুদ্ধে ইউক্রেনকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। কিন্তু এ অস্ত্র ব্যবহারে শর্ত দেওয়া হয়েছে। শর্ত হলো আমেরিকান মিসাইল দিয়ে বিয়ন্ড বর্ডার রাশিয়াতে আক্রমণ করা যাবে না। ফলে রুশ- ইউক্রেন যুদ্ধটা ইউক্রেনের সীমানাতে সীমাবদ্ধ থাকছে, রাশিয়ার ভূখণ্ডে যুদ্ধ হচ্ছে না। অবকাঠামোসহ অন্যান্য সকল ক্ষয়ক্ষতি ইউক্রেনে হচ্ছে। রাশিয়ার ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি না। অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা চাচ্ছে যুদ্ধটা ইউক্রেনের সীমানায় সীমাবদ্ধ রাখতে। যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও মনে রাখা দরকার জাতিসংঘ অদ্যবধি কোনো যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। এ যুদ্ধে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে ইউরোপের দেশগুলো। ইউরোপীয়

ইউনিয়নের বেশির ভাগ দেশ জ্বালানির জন্য রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। সাধারণত অক্টোবর থেকে ইউরোপে শীত শুরু হয়। বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা না হলে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে ইউরোপীয় দেশগুলোকে। ইতোমধ্যে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকি মুখে পড়েছে। বিশ্বে খাদ্য পণ্যের দাম বেড়ে তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ( ডব্লিউ এফপি) সংস্থার গত জুনের তথ্য মোতাবেক রাশিয়া - ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় দুই কোটি মানুষের খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এ মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশে খাদ্য সরবরাহ করা না গেলে ঐ সব দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। বিশেষ করে কেনিয়া ও ইথিওপিয়ায় জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তা পৌঁছাতে ব্যার্থ হলে লাখ লাখ মানুষকে অনাহারে থাকতে হবে। তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়বে। এসব অঞ্চলে করোনা অতিমারি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্যাভাব শুরু হয়।

জিডিপির আকার বিবেচনা করলে রাশিয়া বিশ্বের ১১ তম বৃহত্তম দেশ। বিশ্বের এক- তৃতীয়াংশ গম ও তুলা সরবরাহ করে রাশিয়া। আর তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের এক- দশমাংশ তেল উৎপাদন করে রাশিয়া। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি তেল এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ রাশিয়া। এছাড়াও রাশিয়া সূর্যমুখী তেল ও ভুট্টা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে থাকে।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন নানাভাবে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য সহায়তা করেছিলো। এছাড়াও দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে সহায়তা করেছে। তাই রাশিয়ার সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদুৎ কেন্দ্র। আরও একটা বড়ো প্রকল্প হলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২। এ-সব প্রকল্প রাশিয়ার সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। রাশিয়া থেকে বাংলাদেশ সামরিক সরঞ্জামসহ বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি ও সার ক্রয় করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে গম, ভুট্টা ও তেল বীজ কিনে থাকে। বাংলাদেশের গমের চাহিদার এক- তৃতীয়াংশ এবং ভুট্টার এক- পঞ্চমাংশ আসে ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে। বিশ্বের সিংহভাগ সার রপ্তানি করে রাশিয়া ও বেলারুশ। রাশিয়ার উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার কারণে সার সংগ্রহে সমস্যা হবে। ফলে এ বছর কৃষি পণ্য উৎপাদনে সমস্যা না হলেও আগামীতে কৃষককে সময়মতো সার সরবরাহে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। বর্তমান সরকার তাই ইতোমধ্যেই কিছু কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে রাশিয়ার উপর আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের বিভিন্ন রকমের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন মাত্রায় নানাভাবে পড়বে,এটাই বাস্তবতা। যদিও রাশিয়া ও ইউক্রেনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশি না তবুও হাজার হাজার মাইল দূরের দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিদ্যমান অসম যুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের উপর

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়ছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ রাশিয়ার থেকে অনেক এগিয়ে আছে। রাশিয়া থেকে যে পরিমাণ গম, সার স্টিল বা এলুমিনিয়াম বাংলাদেশ আমদানি করে তার থেকে বেশি তৈরি পোশাক রাশিয়ায় রপ্তানি করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬৬ কোটি ৫৩ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যার মধ্যে তৈরি পোশাকের পরিমাণ বেশি। আর আমদানি করা হয়েছে ৪৬ কোটি ৬৭ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য, যার বেশির ভাগ খাদ্য পণ্য। বাংলাদেশের গমের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ আসে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে। ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশ গম আমদানি করে এবং রপ্তানি করে তৈরি পোশাক। এর পরিমাণ খুব বেশি না। তবে এ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এ দুই দেশে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো।

কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলা ২০২০ সাল থেকে বিশ্ব অর্থনীতি ছিল টালমাটাল। দেশে দেশে লক ডাউনের কারণে সবকিছুই ছিল বন্ধ। সংক্রমণ যখন নিয়ন্ত্রণে এলো সবকিছু যখন স্বাভাবিক হতে শুরু করলো মানুষ যখন কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

বাংলাদেশ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইউক্রেন - রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া বছরে ৬৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি তৈরি পোশাক আমদানি করে। রাশিয়ার বেশ কয়েকটি ব্যাংককে বৈশ্বিক আন্তব্যাংক লেনদেন সংক্রান্ত সুইফট সিস্টেমে নিষিদ্ধ করায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হুমকির মুখে পড়েছে। যে সব তৈরি পোশাকের অর্ডার শিপমেন্ট হয়েছে তার পেমেন্ট পাওয়াও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে তেল,গ্যাসসহ খাদ্যপণ্যের সরবরাহে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রভাব ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশে পড়েছে। অর্থনৈতিক মন্দাসহ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে ফলে জীনসপত্রের দাম বাড়ছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। ডলারের তুলনায় বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মুদ্রার মান পড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনো বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ভালো। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে ৭ শতাংশের কিছু বেশি। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে ভারতের ৭.০১ , পাকিস্তানের ৩৮ , নেপালের ৭.২৮ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯.১, ইরানে ৩৯.৩, জার্মানীতে ৭.৯, কানাডায় ৬.৮,তুরস্কে ৭৩.৫ এবং ভেনেজুয়েলায় ২২২ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। মার্কিন অর্থনীতিতে এখন ভাটার টান দেখা যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দার মধ্যেও অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো।

তবে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। ডলারের তুলনায় ইতোমধ্যে টাকার মান কমে গেছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ৪০ বিলিয়নের নীচে নেমে

গেছে। তবে আশার কথা হলো আমাদের ফরেন রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। বাংলাদেশ আপাতদৃষ্টিতে ঝুঁকি মুক্ত মনে হলেও সরকার ইতোমধ্যে দেশবাসীকে রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আমাদের দেশের সম্ভব্য ক্ষতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে নানামুখী পদক্ষেপে গ্রহণ করেছে। জনগণের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করে তাদের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে বিলাসপণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করা , বিদেশ ভ্রমন কমানো, সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ উৎপাদন কম করে জ্বালানি সাশ্রয় করা, গাড়ির ব্যবহার সীমিত রাখাসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রবাসীদের রেমিট্যান্স সহজে ব্যাংকি চ্যানেলে দেশে আনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা পাচার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এসব সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে ইতোমধ্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করেছে।

করোনা অতিমারি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে দেশবাসী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশবাসীকে সাথে নিয়ে অনাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত ইউক্রেন - রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ নির্মাণ করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক : অর্থনীতিবিদ।

# মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা, অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা

## মুহা শিপ্পু জামান

আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির সাথে জড়িয়ে আছে অনেক মানুষের অনেক দিনের সংগ্রাম আর ত্যাগের ইতিহাস। দুইশত বছর ব্রিটিশ শাসনের পর চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন - সংগ্রাম করেছেন, বাংলার ইতিহাসে সেসকল মহৎ ব্যক্তিত্বের গর্বগাঁথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আর সেই তালিকায় সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে, তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তনে সারাজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, সয়েছেন নিদারুণ কষ্ট আর যন্ত্রণা, বছরের পর বছর পরিবার থেকে দূরে অন্ধকার কারাবাস বরণ করেছেন। এই মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের - খোকা থেকে মুজিব কিংবা বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে উঠার পেছেনে বঙ্গবন্ধুর বাব-মার পাশাপাশি যার অনুপ্রেরণা আর সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আর কার্যকর ছিলো, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ১৯৩০ সালের ০৮ আগস্ট মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপারায় শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোটো। শৈশবে বাবা-মাকে হারানোর পর তিনি বেড়ে উঠেন বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতার স্নেহের ছায়ায়। বঙ্গমাতার জন্ম না হলে হয়তো শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠা হতোনা, আমরা পেতাম না জাতির পিতা, স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা, নিজ ভুখণ্ড ও মানচিত্র। তাই ০৮ আগস্ট বাঙালি জাতির জন্য এক অনন্য দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আজীবনের আন্দোলন, সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতীক্ষার অকুণ্ঠ সমর্থক ও প্রেরণাদায়ী মহিয়সী নারী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধেয় মাতা, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। এবছর সারাদেশে যথাযথ মর্যাদায় বঙ্গমাতার ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো "মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা, অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা" যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

সৃষ্টির আদি থেকেই নর-নারীর সম্মিলিত প্রয়াস মানবসভ্যতার বিকাশ ও অগ্রসরে ভূমিকা রেখেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই নারীগণ অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁর নারী কবিতায় বলেছেন,

'কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী'

স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে অসামান্য অবদানের জন্য যে নারীর ত্যাগ, অবদান ও অনুপ্রেরণায় ছিলেন উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত ও লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প, তিনি হলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, যিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সকল অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি সারাজীবন বঙ্গবন্ধুর সাথে ছায়ার মতো অবস্থান করেছেন, অন্তরালে থেকে বঙ্গবন্ধুর সকল কাজে সমর্থন ও সাহস যুগিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নিভৃত সহচর হিসেবে বিদ্যমান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করেছেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ বাংলাদেশের লাখো জনতাকে তাঁর জাদুকরী বজ্রকণ্ঠে শুনিয়েছিলেন অমর কবিতা,

> "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
> এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। "

মূলত এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি এক অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তা অর্জনের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পূর্বলিখিত বা সম্পাদিত কোন বক্তব্য ছিলো না, এই ভাষণ ছিলো বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর অকৃত্রিম দেশপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর স্বরচিত জাদুকরী কবিতাটি বিরামহীনভাবে আবৃত্তি করেন আর মুক্তিকামী বাঙালি তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ ও হৃদয়ে ধারণ করে এবং এই ভাষণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ জয় করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করে। কালজয়ী এই ভাষণ বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও ইতিহাসের সাথে সারাজীবন মিশে থাকবে। অর্ধশত বছর পার হলেও, এখনো এই ভাষণের প্রতিটা শব্দ বাঙালি হৃদয় ছুয়ে যায়, মনকে শিহরিত করে, করে আন্দোলিত। ভাষণের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আগের দিনই বক্তব্য দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে একটা লিখিত স্ক্রিপ্ট দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু অসীম রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধু সেটা আমলে নেননি, কিন্তু তিনি শুনেছিলেন বঙ্গমাতার কথা। সেদিন বঙ্গমাতা বলেছিলেন, "তাইই বলো যা তোমার মন থেকে আসে", বঙ্গবন্ধুও তাই করেছিলেন; অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের অনুপ্রেরণাও ছিলেন বেগম মুজিব। এছাড়া বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন," আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, 'বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী'। " অর্থাৎ মহান এই নেতার জীবন- কর্ম লেখার অনুপ্রেরণার উৎসও - বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

এই গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু আরও উল্লেখ করেছেন তাঁর টাকার প্রয়োজন হলে, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব নিজের জমানো টাকা থেকে দিতেন, কোনদিন আপত্তি করেন নাই এবং নিজের জন্য তিনি মোটেই খরচ করতেন না (পৃষ্ঠা -২৫)। গ্রন্থের আরেক জায়গায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "রেনু খুব কষ্ট করত, কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্য টাকা পয়সা জোগাড় করে রাখত যাতে আমার কষ্ট না হয়" (পৃষ্ঠা -১২৬)। এখানে তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর আত্মত্যাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন জাতির পিতার সুযোগ্য সহধর্মিণী, বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা এবং সকল অনপ্রেরণার উৎস।

সংগ্রামী জীবনে বঙ্গবন্ধু জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটিয়েছেন, আর এসময় সাহসী বঙ্গমাতা পরিবার ও সন্তানদের দেখাশোনার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরও আগলে রেখেছিলেন প্রজ্ঞা ও দায়িত্বশীলতার সাথে। জাতির পিতার স্ত্রী হয়েও তিনি গ্রহণ করেননি কোন রাষ্ট্রীয় সুবিধা। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন উদার, পরোপকারী এবং সহজ-সরল, সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। আর এজন্যই কোন রাজনৈতিক পদধারী না হয়েও তিনি বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক হয়ে থাকবেন সারা জীবন। তাঁর সহনশীলতা এবং ধৈর্য বর্তমান নারীদের জন্য শিক্ষণীয় এবং অনুসরনীয়।

বঙ্গমাতা ছিলেন একজন আদর্শ নারী যিনি পরিবারে স্ত্রী-মাতার ভূমিকায় কোমলতা আর দেশের প্রয়োজনে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কঠোরতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। বেগম মুজিব একদিকে যেমন শক্ত হাতে সংসার ও সন্তানদের সামাল দিতেন, তেমনি নিজের ব্যক্তিগত চাহিদাকে অতিক্রম করে স্বামীর সংগ্রামের সহযোদ্ধা হিসেবে নীরবে ছায়াসঙ্গীর মতো যোগাতেন সাহস ও উদ্দীপনা। তিনি ছিলেন মুক্ত চিন্তার অধিকারী, বিশ্বাসে অটল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী একজন নারী। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও আদর্শের সঙ্গে সবসময় ছিলেন একাত্ম। মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণাদাত্রী এই মহীয়সী নারী বঙ্গমাতার আদর্শ দেশের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে নারীদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনে অভ্যস্ত আর প্রচারবিমুখ এই মহিয়সী নারীর জীবনব্যাপী ত্যাগ ও অবদান থেকে গেছে লোক চক্ষুর আড়ালে, তাই আজকের এই দিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি আত্মত্যাগে ভরপুর তাঁর জীবন ও কর্মকে।

১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট কালরাতে ধানমণ্ডির ৩২ নং বাড়িতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ঘাতকেরা এই মহিয়সী নারীকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর পরিবারের সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। মৃত্যুর সময়ও তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথেই চলে গেছেন না ফেরার দেশে, এমন জীবনসঙ্গিনী শুধু বঙ্গবন্ধুর মতো ব্যক্তিত্বের ভাগ্যেই জোটে। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মের মাঝে যে আদর্শ তিনি রেখে গেছেন তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তিনি না থাকলেও রত্নগর্ভা বঙ্গমাতা রেখে গেছেন

একজন দেশরত্ন - শেখ হাসিনা, যিনি তাঁর মায়ের আদর্শ, চেতনা ও প্রেরণা এবং অদম্য সাহস ধারণ করেই বাংলার মাটি ও জনগণকে ভালোবেসে নিজের সারাটি জীবন দেশের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর হাত ধরেই, তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হয়েছে, শেখ হাসিনার অদম্য চেষ্টায় নিজেদের অর্থায়নে আমরা তৈরি করেছি স্বপ্নের পদ্মা সেতু, তাঁর নেতৃত্বেই দেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ উন্নত জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে - ইনশাল্লাহ।

বঙ্গমাতার আদর্শ আর মননে গড়ে উঠুক এদেশের নতুন প্রজন্মের নারীরা- বঙ্গমাতার জন্মদিনে এই আমাদের প্রত্যাশা। আসুন আমরা বঙ্গমাতার জীবনকর্ম থেকে ত্যাগ, দেশপ্রেম, সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার শিক্ষা পরিবার ও সমাজে সুন্দরভাবে তুলে ধরি, গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

লেখক: মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপ-প্রেস সচিব।

# Shipbuilding Industry for Blue Economy

**A H M Masum Billah**

The shipbuilding industry is an emerging potential sector in Bangladesh. In the past, ships plying domestic routes were imported from abroad, but for several years, all the ships used in domestic routes and coastal areas have been built in the country. More so, Bangladesh is now exporting ships in abroad competing with some other large production countries like India, China, Vietnam, etc. We have now 20 shipyards and dockyards with global standard along with another 100 having a local standard in this sector.

Ship industries need huge investment and in our country these are run by the private sector. The Govt. is beside the private investors and keen to yield the best output by capitalizing the potentials of this sector. The Govt. has set a target to increase the export volume to 4 billion USD by 2025 through encouraging more investment and state of the art technology in this sector. This vision has been reflected in the 'Shipbuilding Industry Development Policy-2021'. At present the export earning is around 1 billion USD. The policy also aims at building manpower of a total 100 thousand people in this sector.

In congruence with this policy, the Govt. has come up with financing program for this sector. Bangladesh Bank has built a refinancing fund of Tk. 2,000 crore for the development of the country's shipbuilding industry. The fund has been set up under this policy Bangladesh Bank has issued a notification on May 2021 in this regard. This financing program loans will be available at a maximum interest rate of 4.5%. Besides, banks will be able to avail refinancing facility from Bangladesh Bank at 1% interest.

The shipyards having an international standard are currently producing a total of around 100 ships per annum. This ships produced here are of the maximum capacity of 10 thousand DWT (Deadweight Tonnage). Shipbuilding industry is very bright in both local market and international market. Ships are required to ply around 700 rivers running across the country. Besides we have a large coastal area, where ship is the main mode of transportation of products and goods, along with other commercial activities and trades.

On the other hand, the seas and ocean are still the main routes for export import business and ships are only vehicle used in these routes. At present there are around 400 billion USD shipbuilding market globally, which is soaring by 6 percent each year. So there is a huge potential of enhancing

our shipbuilding industry both in quality and quantity. For achieving this, it requires huge investment, advanced technology and time.

The journey of shipbuilding industry started on 15 May, 2008 when Ananda Shipyard, a privately run shipbuilding industry exported a ship to Denmark. Since then the export volume has gradually increased. Bangladeshi ships are now exported to 40 countries in Europe, Africa and Asia continent.

While, shipping is a very crucial element of economic activities, shipbuilding industry has bearing on the 'Blue Economy'. To maximize the benefits from the sea we need a strong shipping facility which can strongly supported by shipbuilding industry. Coastal and deep areas off shore the mainland are rich with diversified varieties of fishes. The fishermen use fishing boats and trawlers to catch fishes from sea. But these vehicles are not well equipped to ensure the highest yield. They cannot fish in deep sea areas due to lack of advanced fishing boats and trawlers. Estimations say we are only using 10 percent of the total sea areas for fishing. Fishermen use boats of maximum 300 tons to catch fish in deep sea, whereas, those in the developed countries use bots or ships of around 2000 tons. Bangladesh has now achieved the technical maturity to build to fishing ships of 2000 tons for developed countries, like Norway. Ships with higher capacity is essential to fish in the deep sea particularly in Exclusive Economic Zone and continental shelf in the Bay of Bengal.

Other than fishing 'Blue Economy' includes economic activities tourism, oil and gas mining, mining of mineral resources and extraction of other marine biological resources. Besides, research is an important sector that we need to focus on to maximize the economic benefits form sea areas belonging to Bangladesh. Having shipping vessels with the right capacity is prerequisite to include all these aspects in our economic activities.

It is so great that ship building industry is booming gradually under private sector. The Govt. of Bangladesh has come forward to foster this potential sector. Ministry of industries has taken a taken a time befitting initiative of formulating a policy for developing the ship building industry policy which considers providing financial support to this industry. This policy has been developed including opinions of the stakeholders. We hope the concerted efforts from both the public and the private stakeholders will take the ship building industry to an uplifted stage and contribute in building Bangladesh a developed nation by 2041.

Writer: Senior Information Officer, Press Information Department

# ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড, উলটো রথে বাংলাদেশকে চড়িয়ে দেওয়ার নীলনকশা

**মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী**

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের শেষ রাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার পরিবারের সদস্য এবং মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও যুবলীগ প্রধান শেখ মনির পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যের হত্যাকাণ্ড 'কতিপয় উশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তার' মস্তিষ্ক প্রসূত শুধু নির্মম কোনো হত্যাকাণ্ড ছিলো না। দীর্ঘদিন পাঠ্যপুস্তকে কতিপয় উশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তার আক্রোশের বিষয় হিসেবে এটি দেখানো হয়েছিলো। বিএনপি এবং জোট সরকারের শাসনকালে এই হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসেবে ১৯৭৫ সালে এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। ১৫ই আগস্টের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের এসব বিভ্রান্তিকর, অযৌক্তিক এবং মনগড়া কারণ বা উপলক্ষ্য উপস্থাপনের পেছনে ছিলো ক্ষমতা দখলকারী অপশক্তির লক্ষ্য, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও তাদের পরিচয়কে আড়াল করা এবং নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিকে ঘটনাবলির প্রকৃত সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া।

প্রথমত, সেনাবাহিনীর কতিপয় উশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্টকে স্বীয় সিদ্ধান্তবলে হত্যা করতে যাবে এমন দুঃসাহস কতিপয় সেনা সদস্যের থাকে না, এমনটি ঘটে সংগঠিত কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ প্রস্তুতির মাধ্যমে- যেখানে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তর থেকে ট্যাঙ্ক, কামান, অস্ত্র , গুলি বের করা সম্ভব ছিলো। সেটি কতিপয় সাধারণ সেনা সদস্যের পক্ষে ঘটানো কোনোভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু ক্ষমতা দখলকারীরা শিশুদের মস্তিষ্কে ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডকে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সেনা সদস্যের কাণ্ড বলে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলো। সেনাবাহিনীর ভেতরে উচ্ছৃঙ্খল সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করতে পারে এমন প্রশ্নের উত্তরে গোটা সেনাবাহিনীই যে উশৃঙ্খল সেনা সদস্যদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা বাহিনীর দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে- সে বিষয়টি ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সুবিধাভোগী সরকারগুলো মোটেও ভাবেনি। তারা এই হত্যাকাণ্ডের দায় গোটা সেনাবাহিনীর ঘাড়ে দিয়ে তা শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘদিন চালিয়ে গেছে। একাধিক প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের এমন শিক্ষা নিয়েই বড়ো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত নতুন ধারার রাজনীতির বিপক্ষে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যেরই বা কেন আক্রোশ ঘটবে , কেনইবা তারা ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মতো নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটাতে যাবে? বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত রাজনীতি রাজনৈতিকভাবেই কেবলমাত্র মীমাংসিত হতে পারে। সেই কাজটি

করবেন রাজনীতিবিদরা। কিন্তু দীর্ঘদিন শিক্ষাব্যবস্থায় '৭৫ এর এই হত্যাকাণ্ডের দায় কতিপয় সেনা সদস্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে রাজনীতি, প্রচারমাধ্যম এবং সমাজেব্যবস্থায় যেভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাতে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের নায়ক , ষড়যন্ত্রকারী এবং এর সমর্থকদের পরিচয় ও চেহারাকে আড়াল করা হয়েছিলো। কিন্তু বাস্তবে এই হত্যাকাণ্ড মোটেও কতিপয় সেনা সদস্যের কোনো আক্রোশের বিষয় ছিলো না, কিংবা বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত নতুন রাজনীতিতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও কোনো কারণ ছিলো না।

বস্তুত, এই হত্যাকাণ্ডটি মোটেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং জনগণের কাছে কিংবা জনগণের জন্য অত ছোটো কোনো ঘটনা ছিলো না। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ছিল পূর্ব পরিকল্পিত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শক্তির একটি গভীর ষড়যন্ত্র যার লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সূচিত রাষ্ট্র নির্মাণের যাত্রাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া এবং সেই স্থলে বাংলাদেশকে ভাবাদর্শগতভাবে ১৯৭১ পূর্ববর্তী ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চরিত্রে ফিরিয়ে নেওয়া। সেই পথে ষড়যন্ত্রকারী দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শক্তির প্রধান বাঁধা ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতি। কারণ তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রকে বদলানোর চেষ্টা করেছিলেন ২৩ বছর ধরে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে দিতে চায়নি। সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৬ দফার স্বাধিকার আন্দোলনকে এক দফায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল মহলের ষড়যন্ত্র , অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তার নেতৃত্বেই '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিলো। পাকিস্তান সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ড ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকেও তিনি একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার যে পরিকল্পনা ধাপে ধাপে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে চলছিলেন। তাতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল পরাজিত শক্তি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো যে তিনি বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন তিনি মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই রাজনীতিতে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এগিয়ে চলছেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে তিনি ১৯৭২ সালে সাংবিধানিক কাঠামো, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, নতুন জাতি গঠনের শিক্ষাব্যবস্থা এবং জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে যথার্থ অর্থেই একজন রাষ্ট্র নির্মাতার প্রজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই পথ চলা সম্পর্কে তার দেশি এবং বিদেশি প্রতিপক্ষ যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করেই বাংলাদেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য যত নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা প্রদর্শন করতে হয় তারা তার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৯৫০, ৬০ এবং ৭০ এর দশকে যেসব রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছিল তাদেরকে স্বাধীনভাবে বিকশিত না হতে দেওয়ার একটি ষড়যন্ত্রকারী

গোষ্ঠী দেশগুলোর অভ্যন্তরে যেমন ছিল, আন্তর্জাতিকভাবেও কোনো কোনো শক্তি এদেরকে বুদ্ধি-পরামর্শ, অর্থ, অস্ত্র এবং আশ্রয় দিয়ে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ঘটানো, সরকার প্রধানকে প্রয়োজনে হত্যার মাধ্যমে হলেও উৎখাত করতে দ্বিধা করেনি। এটি সেই সময়ে এশিয়া এবং আফ্রিকার বেশ কিছু রাষ্ট্রে ঘটেছিলো। এমনকি লাতিন আমেরিকায়ও রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো। বাংলাদেশেও অনুরূপভাবে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই গোপনে সরকার উৎখাতের নানা প্রস্তুতি দেশে ও দেশের বাইরে চলতে থাকে। নিঃসন্দেহে ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পেরেছিল বঙ্গবন্ধুর মতো জনপ্রিয় নেতাকে ক্ষমতা থেকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কোনোভাবে উৎখাত করানো যাবে না। সেকারণে তাদের জন্য তখন একমাত্র পথ খোলা ছিল বঙ্গবন্ধুকে রাতের আঁধারে হত্যা করা।

সেই হত্যাকাণ্ডে সবচাইতে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু উচ্চাভিলাষী সৈনিক ও কর্মকর্তা- যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেনি কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। তাহলেই সেই রকম সৈনিক ও কর্মকর্তাদের দিয়ে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করা যতটা সহজ হবে, অন্যদেরকে দিয়ে তা মোটেও হবে না। এই হিসাবটি ষড়যন্ত্রকারীদের নেপথ্যের পরিকল্পনাকারীরা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলো। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু যেহেতু বঙ্গভবন কিংবা গণভবনে না থেকে নিজের বাসভবনে অনাড়ম্বরভাবে থাকতেন। নিরাপত্তার বিষয়টিও সেখানে খুব সীমিত পর্যায়ে থাকতো তাই রাতের আঁধারে বাসভবনে ঢুকে তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা খুব বেশি জটিল কাজ ছিলো না। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিলো হত্যা করতে পারে এমন সামরিক অস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, একইসঙ্গে দুঃসাহস ও নিষ্ঠুরতার মানসিকতাও তাদের থাকতে হবে। বেছে বেছে পরিকল্পনাকারীরা হত্যায় অংশ নিতে পারা তেমন ব্যক্তিদেরকেই নিয়োজিত করে। হত্যাকাণ্ডের পেছনে আরও অনেক বড়ো ধরনের প্রস্তুতি তাদের ছিলো। ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদও তারা সুকৌশলে মহড়ার নামে সেনানিবাসের বাইরে বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিলো। বোঝাই যাচ্ছে এই চক্রে সেনানিবাসের উর্ধ্বতন কেউ কেউ জড়িত ছিলেন যারা হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করার অস্ত্রশস্ত্র যোগানে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। এদের পেছনে বিদেশি শক্তির বল তাদেরকে সাহস যুগিয়েছিলো। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে দেশ থেকে পালাতেও তাদের কোনো সমস্যা হতো না। অনেক দেশেই তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ছিল যা পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে প্রমাণিত হতে থাকে। সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডটি ছিল একটি বড়ো ধরনের ষড়যন্ত্রের অংশ। যার বিস্তৃতি আজো আমরা জানতে পারিনি। সে কারণে এটিকে এত বছর কতিপয় বিপথগামী উশৃঙ্খল সেনা সদস্যের সংগঠিত ঘটনা হিসেবেই দেখানো হয়েছিলো। এর সঙ্গে খন্দকার মোশতাক এবং কিছু সুবিধাবাদী রাজনীতির মানুষ যুক্ত থাকায় এই হত্যাকাণ্ডকে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া হিসেবেও দেখানো চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক ছিল শিখণ্ডী, তার

ব্যবহারও ছিলো স্বল্পমেয়াদি। ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্যে নেপথ্যের নায়ক ও কুশীলবরা চলে আসতে থাকে। ব্যবহার করা হয় তখন গোটা সেনাবাহিনীকে। এর প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ঘটেছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ড। রক্তাক্ত রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান এবং সেনাবাহিনীর সংযুক্তি কত বেদনাদায়ক ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে তা ১৯৭৫ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা থেকে জাতি শিক্ষা নিতে পারে।

কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নিকটজনদের হত্যার পর থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে গলা টিপে হত্যা করার পরিকল্পনা ষড়যন্ত্রকারীরা বাস্তবে রূপ দিতে থাকে। হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। বেড়ে ওঠা ত্যাগী রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে আটকে রাখা হয়। গোটা রাজনীতিকে তছনছ করে দেওয়া হয়। ক্ষমতার শীর্ষে বসা সামরিক বাহিনী প্রধান রাষ্ট্র, রাজনীতি ও প্রশাসনের ওপর ছড়ি ঘোরাতে থাকেন। রাষ্ট্রের যা কিছু অর্জন বহু ত্যাগ ও তিতীক্ষার মাধ্যমে ছিলো তাও তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিলো, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যারা মেনে নেয়নি, আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধারণা যাদের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, রাজনীতিতে যারা ছিল পরিত্যাজ্য তাদেরকে নিয়েই তিনি গড়ে তুললেন নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। তার এইসব বুদ্ধি বিবেচনার পেছনে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা, বিদেশি কিছু কিছু মহলের বুদ্ধি -পরামর্শ এবং সমর্থন নিহিত ছিল। ধাপে ধাপে তিনি সে পথেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদর্শকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে থাকেন, সংবিধানকে করলেন তিনি কাটাছেঁড়া, সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মধ্যেও। বাংলাদেশ তখন মুক্তিযুদ্ধের কক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে পূর্ববর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রের কক্ষপথেই ফিরে যায়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখন বাক্সবন্দি, অর্থনৈতিক মুক্তি তখন খালকাটা কুমিরের আহারে পরিণত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও গতি এবং পথ হারায়। দেশে সুবিধাবাদ, ধর্মান্ধতা, ইতিহাস বিকৃতি এবং পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এমন রাষ্ট্রব্যবস্থায় জিয়াউর রহমানও টিকে থাকতে পারেননি। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তার জীবন নাশ হয়। ওই সময় রাষ্ট্রকে পরিচালিত করার মতো ত্যাগী , যোগ্য ও আদর্শবান নেতৃত্ব ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি। ক্ষমতা আবারো চলে যায় সামরিক ছাউনি থেকে আগত কতিপয় উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তার হাতে- যারা '৭৫ এর হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর ছিল। সে কারণেই দ্বিতীয় সামরিক শাসনামলেও রাষ্ট্রকে আদর্শগতভাবে আরও দুর্বল করা হলো। এরপর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িকতার ধারায় ফিরে যাওয়ার ভিত্তি ততটা পোক্ত থাকেনি। ১৯৯১ এর নির্বাচনে তারই উদাহরণ সৃষ্টি হলো। বাংলাদেশ ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতা, সুবিধাবাদ, ধর্মান্ধতা, উগ্র ভারতবিরোধিতা ইত্যাদির আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি , শিক্ষা, সংস্কৃতি কতটা গভীর সংকটে পড়েছে তা ৮০- ৯০ এর দশক

থেকে আরও দৃশ্যমান হতে থাকে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশকে মুক্তিযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার ধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলেন। ৫ বছর নিরন্তর সেই উদ্যোগই অব্যহত ছিলো। কিন্তু দেশ এবং বিদেশে ষড়যন্ত্র নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ২০০১ সালের নির্বাচনে সেটিরই প্রকাশ ঘটে। এরপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় স্বাধীনতা বিরোধীদের আরোহণ এবং ৫ বছর দেশে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা, অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নয়ন , দুর্নীতি, অপশাসন চরম আকার ধারণ করে। এর বিরুদ্ধে ২০০৬ সালে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভ এবং আন্দোলন তীব্রতর হয়। জোট সরকার যেনতেন নির্বাচনের পায়তারা করে। দেশ তখন জঙ্গিবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কব্জায় আটকে পড়ায় আন্তর্জাতিক মহলও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। নতুন বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশ ভয়ানক এক বিপদজনক পথে চলে যাচ্ছিলো। সেই অবস্থায় ১/১১ সৃষ্টি হয়, ক্ষমতায় অসাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটে। ২ বছর পর ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার রূপকল্প ২০২১, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ধারায় দেশকে ফিরিয়ে আনার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করে। স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী শক্তিসহ আরও কিছু গোষ্ঠী এর বিপক্ষে দাঁড়ায়। দেশে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গণজাগরণ, এর বিপরীতে হেফাজতকে নিয়ে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে।

২০১৪ এর নির্বাচন ভণ্ডুল করার চেষ্টা করা হয়। সরকার সেটি ব্যর্থ করে দেয়। বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে, অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। তবে সমাজ চেতনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এখন মুক্তিযুদ্ধ বনাম সাম্প্রদায়িকতার দ্বন্দ্বে বিভক্ত। ১৯৭৫ সালে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, এখন সেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পদ ও জীবন হরণ করার অপচেষ্টার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশকে আগামী দিনে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় বিকশিত করার অনেক কার্যকর পদক্ষেপ যেমন নিতে হবে, জনসচেতনতাও সেভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে যে উল্টোরথে চড়িয়ে দিয়েছিলো সেটিকে এখন রথ থেকে পুরোপুরি নামাতে হবে, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের মূল ধারায় পরিচালিত করতে হবে। এমনটিই হোক ১৫ই আগস্ট পালনে আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক : শিক্ষাবিদ।

# দুর্যোগ ব্যবস্থপনা প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শামীম আযাদ

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সারা বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বিশ্বব্যাপী আলাদা পরিচিতি রয়েছে। Would Risk Index-2016 অনুসারে পৃথিবীর ১৭১ টি দেশের মধ্যে অবকাঠামো ও ফসলাদি,মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকূলের আপদ উন্মুক্ততা,দুর্দশা, বিপদগ্রস্ততা,সহনশীলতা ও অভিযোজন সূচকের সামগ্রিক ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম। সকল দুর্যোগেই দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্যোগকালে দুঃস্থ লোকজনকে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য, পানি, চিকিৎসা, সেবা,আশ্রয় বস্ত্র ইত্যাদি জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহ করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়াও দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগণকে বছরব্যাপী অর্থ ও খাদ্য সরবরাহ করাসহ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাও এ মন্ত্রণালয়ের কাজ। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তুতি ও জনগোষ্ঠীর সচেতনতার কারণে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবনের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। নগর অবকাঠামো, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে সরকার বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ প্রতিবেশ সংরক্ষণে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা " চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ' পেয়ে দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। দুর্যেগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি দর্শন হচ্ছে প্রাকৃতিক,পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদ হতে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং বড়ো ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম এমন জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সরকার দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, দুর্যোগ মোকাবিলায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, যেমন- বন্য আশ্রয়কেন্দ্র, উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘরবাড়ি, ছোটো ও মাঝারি আকারের সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় ও উদ্ধার কাজে সার্বিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্য ১,১১ ও ১৩, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০২১-২৫) এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ১৭ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ টি প্রকল্প এবং বিভিন্ন ত্রাণ ও সামাজিক সহায়তা কার্যক্রম সরকার

পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রমে নারীরা বেশি উপকৃত হবে। কারণ দুর্যোগের সময় নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং এরই ধারাবাহিকতায় 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি' প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা,উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর 'Practicing Gender and Social Inclusion in Disaster Risk Reduction 'শীর্ষক একটি ফ্যাসিলিটেটর গাইডলাইন প্রকাশ করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন ঝুঁকি পর্যালোচনা করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা। গাইডলাইনটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে,সম্ভব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এলাকার মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রসে সহায়তা করছে। গাইডলাইনটি দুর্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং জরুরি সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্তকরণে দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করায় এবং এসব কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন ও জীবিকার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। দুর্যোগের সর্তক বার্তার পর নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং দুর্যোগকালে ওষুধ ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে নারীর দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায়,যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দুর্যোগ সম্ভবনাকালে বিশেষত নারী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। এর ফলে দারিদ্র ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।

বন্যায় আক্রান্তদের বিশেষ করে নারী, শিশু,বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের উদ্ধার ও তাদের মালামাল পরিবহণের জন্য ইতোমধ্যে ৩০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে আরও ৩০ টি এ ধরনের বোট সংগ্রহ করা হবে। এছাড়াও Procurement of Equipment for Search and Rescue Operation on Earthquake and Other Disaster (Phasa II) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৫৮ কোটি টাকা ব্যায়ে উদ্ধার ও অনুসন্ধান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ২ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা ব্যায়ে নতুন নতুন উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে। দুর্যোগকালীন সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন - তিতাস গ্যাস,আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার ৩৫০ জন কর্মকর্তাকে উন্নত জিআইএস সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, এদের মধ্যে ২০ শতাংশ নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। Harmonized Training Module এর আওতায়

জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪ হাজার ৯৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৫ হাজার নগর দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক এবং Cyclone Preparedness Programme (CPP) এর আওতায় ৭৬ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে,যার মধ্যে ৩৮ হাজারেরও বেশি নারী।

সীমিত সমর্থ নিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বে কাছে এক রোল মডেল। দুর্যোগপ্রবন এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত নানারকম প্রাকৃতিক ও মানুষ্যসৃষ্ঠ দুর্যোগের মোকাবিলা করে বেঁচে আছে। দুর্যোগ পূর্ব ব্যবস্থাপনা,দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা অত্যান্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব সীমিত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা সরকারি- বেসরকারি সকল পর্যায়ের ব্যক্তিরা করে থাকেন। আর এর মাধ্যমেই আমাদের সামাজিক ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেখক: সদস্য, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)।

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার

জাহিদ হোসেন

ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের প্রকোপ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর ক্ষতির মাত্রা ও ক্ষতির পরিধি এবং সাথে সাথে প্রতিনিয়ত বাড়ছে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি। বিগত দশকে দুর্যোগ ঘটনের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘুর্ণিঝড়ের পথ পরিবর্তন ও ঘটনের সংখ্যা, তীব্রতা বৃদ্ধিতে দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৭ কোটির বেশি জনগণের বসবাস যা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির দেশ হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩ কোটি লোক সমুদ্র উপকূলে বসবাস করে যাদেরকে প্রতিনিয়ত ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততাসহ অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয়। প্রায় ৪ কোটি লোক বন্যার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। সেই সঙ্গে খরা, লবণাক্ততা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ধীরগতির (Slow onset) দুর্যোগসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে প্রকটতর হচ্ছে। এতদসত্বেও বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের মৃতের সংখ্যা সাফল্যজনকভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে যেখানে ৩ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল, ২০০৭ সালের সুপার সাইক্লোন সিডরএ সেই মৃতের সংখ্যা মাত্র ৩ হাজারে নেমে এসেছে। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এ সফলতা ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে ব্যাপক সাফল্য থাকলেও আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন দুর্যোগের হুমকি ও চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হচ্ছি। এ রকম একটা পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য, উপাত্ত ও যথাযথ প্রযুক্তি। ঠিক একইভাবে এসব তথ্য, উপাত্ত ও প্রযুক্তি সব ক্ষেত্রের, সব পর্যায়ের ব্যবহারকারী ও উপকারভোগীদের উপযোগী করে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল, তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহারের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক, সময়োপযোগী ও সব পর্যায়ের জন্য ব্যবহারোপযোগী করে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির পিতা ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ওয়ারলেস এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম বার্তা প্রদানের ব্যবস্থা সংযোজন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে ব্যবহার শুরু করেছিলেন, তারই সুযোগ্য কন্যা

ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উদ্যোগ, সম্মেলন ও প্রক্রিয়া যেমন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে UNISDR এর World Conference on Disaster Risk Reduction এর সাম্প্রতিক যে ঘোষণা অর্থাৎ Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (২০১৫-২০৩০) দলিলেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও নানা পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক দিক, কার্যক্রম ও উল্লেখযোগ্য সফল উদ্যোগ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

আধুনিক ও যুগোপযোগী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মডেলের ব্যবহার করে দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আদ্রতা ও বায়ুর গতিবেগ বিষয়ক গবেষণা কাজে আঞ্চলিক জলবায়ু মডেল (Egional Climate Model) প্রেসিস (PRECIS) ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। যেমন - Inundation Map/Risk Map for Storm Surge - বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়, ফলে জীবন-জীবিকা এবং অবকাঠামোর ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যার স্থান ভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর Inundation Map/Risk Map for Storm Surge তৈরি করা হয়েছে, এ মানচিত্র হতে এ সকল এলাকার ঘর বাড়ির ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচুতে করতে হবে, তার ধারণা পাওয়া যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষত খরার জন্য Global Circulation Model (GCM) I MAGICC/ SCENGEN Software ব্যবহার করে খরার গতি-প্রকৃতির চিত্র (Trend) নির্ণয় করা হয়েছে; যার মাধ্যমে ২০১৫ সাল থেকে ২০৬৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের খরার চিত্র (Trend) সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। Hydrodznamics/ Fluid Dynamics - MIKE 11 ও GBM বেসিন মডেল ব্যবহার করে বন্যা পূর্বাভাসে পূর্বের ৩ দিনের স্থানে লিড টাইম আরও ২ বাড়িয়ে ৫ দিনে উন্নীত করা হয়েছে যা এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ লিড টাইম। বন্যা পূর্বাভাস স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধায় আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের ফ্লাড ভলান্টিয়ার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়াও Hydrodznamics/Fluid Dynamics Model ব্যবহারের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গনের ভবিষ্যত চিত্র (Trend) নির্ণয় করা হয়েছে যা বিশ্লেষণ করে ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। HAZUS Software ব্যবহার করে ভূমিকম্পের বিপদাপন্নতা (Vulnerability) ও

ঝুঁকির (Risk) Scenario প্রস্তুত করা হয়েছে যার ফলাফল নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন – Risk I Vulnerability এটলাস।

Active Fault Modeling - Active Fault Model ব্যবহার করে বাংলাদেশ ও এর আশেপাশে Active Fault Line চিহ্নিত করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে দেশে প্রথমবারের মতো ৩টি বড়ো এবং ৬টি ছোটো শহরের জন্য ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। কোন Fault Line G কি মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পাশাপাশি প্রতিটি শহরের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য শহরভিত্তিক কন্টিনজেন্সিপ্লান তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ভূমিধ্বস, Subsidence এবং Liquefaction এর গতি-প্রকৃতি অনুধাবনে Geoscience এর ব্যবহার করা হচ্ছে।

Geoscience ব্যবহার করে দেশে প্রথমবারের মতো ভূমিকম্প জনিত বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ করে দেশের ৩ (তিন) বড়ো শহর যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট Microzonation Map তৈরি করা হয়েছে এবং আরও ৬ টি শহরে Microzonation Map তৈরি করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। Microzonation Map টি কন্টিনজেন্সি প্লান ও বিল্ডিং কোড হাল-নাগাদ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

Geographical Information System and Remote Sensing প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন আপদ ও দুর্যোগের ঝুঁকি নিরূপণ করা হচ্ছে। এছাড়াও GIS পদ্ধতিতে বিভিন্ন আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মানচিত্র ও তথ্য সমৃদ্ধ ডিজিটাল এটলাস তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং দুর্যোগের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) এর কারিগরি ও Asian Development Bank (ADB) এর আর্থিক সহযোগিতায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তি (SBT) ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারে 'বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়' মনিটরিং ও পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নয়নে বাংলাদেশ, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামে যুগপৎভাবে 'Applying Remote Sensing Technology in River Basin Management' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) - যে কোনো দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়াদান এবং বিশেষতঃ আগাম সতর্ক সংকেত প্রচার সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ সাড়াদান কেন্দ্রগুলো, যথা- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র ইত্যাদি এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমকে পরিবর্তন করে 'জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র' (NDRCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে প্রয়োজনীয় ইকেলট্রনিক যন্ত্রপাতি ও টেলিফোন স্থাপন করে Video Workshop অনুষ্ঠানের উপযোগী করা হয়েছে। কেন্দ্রটি সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয় এবং প্রতিদিন 'দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন' প্রকাশ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (CDMP-II) সহায়তায়

জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) স্থাপন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৪৮৫টি উপজেলায় ও সকল জেলায় যথাক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসের সাথে Network স্থাপন করা হয়েছে। মোবাইল ফোন ভিত্তিক প্রযুক্তি যথা: SMS (Short Message Service) ও IVR (Inter-active Voice Response) ভিত্তিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। বর্তমানে যে কোনো মোবাইল থেকে ১০৯৪১ নম্বর ডায়াল করে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা ও সতর্কীকরণ বার্তা জানা যায়।

উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ওয়েবসাইট ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলির কাঠামোগত এবং আনুষাঙ্গিক তথ্য যেমন: ভৌগোলিক অবস্থান (অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ), ব্যবহার উপযোগিতা, ধারনক্ষমতা, ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটির তথ্য ব্যবহার করে নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মানের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা, ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনার জন্য উপযুক্ত পথ নির্ধারণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণ করা যাবে।

দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে বিভিন্ন দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণের উদ্দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে একটি ডিএনএ সেল (Damage and Need Assessment- DNA Cell) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ডিএনএ সেলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার স্থাপন ও সংযোজন করা হয়েছে। এই সেলের মাধ্যমে একটি Web-based Damage and Need Assessment Application তৈরির কাজ চলমান রয়েছে, যার মাধ্যমে অনলাইনে দ্রুততার সাথে মাঠ পর্যায় থেকে যেকোনো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সরাসরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সার্ভারে সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে আরও উন্নত শিক্ষা ও গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে; এরমধ্যে সক্ষমতার (Capacity) অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, অপ্রতুল বিনিয়োগ এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকলেই সমন্বিতভাবে কাজ করছে। দেশীয় উদ্যোগের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আগামী দিনে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর করার প্রয়াশে সব চেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং একটি দুর্যোগ সহনশীল ও সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

লেখক : শিক্ষক, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

# তথ্যাপ্রযুক্তির যুগে জনগণকে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে

## ইমদাদ ইসলাম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনৈক আবুল হাশিম, প্রাক্তন সাব পোস্টমাস্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপ-ডাকঘর ০৬.১০.২০২০ তারিখে ডাক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট তার ১৫.০৯.১৯৮৮ তারিখের দাখিলকৃত রিভিশন পিটিশন পরবর্তী সুদীর্ঘ ৩২(বত্রিশ) বৎসর অতিবাহিত হলেও তিনি প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোনো সিদ্ধান্ত না পেয়ে শারিরীক, মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দায়ী কর্মকর্তার নাম, পদবীসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা লিখিতভাবে জানাতে আবেদন করেন।

ডাক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে "সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট সার্কেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো কর্মকর্তা দায়ী নয় মর্মে পরিলক্ষিত হয়" মর্মে একটি জবাব প্রেরণ করেন। উক্ত জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পেরে অভিযোগকারী সচিব, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর বিধি ৪(২), বিধি ৪(৩) ও বিধি ৬(২) এর আলোকে ডাক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গৃহীত কার্যক্রম যথাযথ হওয়ায় আপীল আবেদনটি তথ্য অধিকার আইন এর অনুচ্ছেদ ২৪(৩)(খ) মোতাবেক খারিজ করে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়। উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে এবং তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে। তথ্য কমিশনের অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানির জন্য গ্রহণ করে অভিযোগকারী এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালক (ডাক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; যুগ্মসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়সহ মোট পাঁচ (০৫) জনের প্রতি সমন জারি করে। তথ্য কমিশন উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য ৩২ বছর ধরে বিলম্ব করা হয়েছে এটা সংশ্লিষ্টদের অকর্মন্যতার পরিচয় বহন করে যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং আবেদনকারীর চাহিত হালনাগাদ তথ্য দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করেন।

তথ্য কমিশন সূচনালগ্ন থেকে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ধারা ২৫ এর আলোকে দেশের নাগরিকগণ তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে আসছে। কমিশন অনেক ক্ষেত্রে স্ব-প্রণোদিতভাবেও অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৪৩২৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫৪৯টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় প্রচলিত পদ্ধতিতে শুনানি গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, সাধারণ মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ভার্চুয়াল শুনানি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভার্চুয়াল শুনানি গ্রহণ শুরু হয়। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১৩০টি অভিযোগের মধ্যে ১২৫টি অভিযোগ অভিযোগকারীকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি, পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ভার্চুয়াল শুনানি গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৫৪ এবং স্ব-শরীরে উপস্থিতিতে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৮টিসহ মোট নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা ৬২। ২০২০ সালের ৯৭টি অভিযোগের বিষয়ে ২০২১ সালে শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং নিষ্পত্তি করা হয়। ০১ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৪৬৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এরমধ্যে ২৩৪টি অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৩০টি অভিযোগ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এবং ০৪ টি অভিযোগ শারীরিক উপস্থিতিতে শুনানি করা হয়।

তথ্য কমিশন দেশের নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব সময়ে সচেষ্ট। ভার্চুয়াল শুনানি গ্রহণের ক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে তথ্য কমিশনকে। ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানি গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে গতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে। ভার্চুয়াল শুনানি গ্রহণের কারণে পক্ষগণ দেশের দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থান করলেও তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে ভার্চুয়াল শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। যার ফলে একদিকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুনানিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে এবং অপরদিকে দেশের প্রান্তিক এলাকা থেকে তথ্য কমিশনে হাজিরার প্রয়োজন না থাকায় জনগণের অর্থনৈতিক সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে। এ পদ্ধতিতে শুনানিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টারের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে (ক) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনটি পাস হওয়ার এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার এক যুগ অতিবাহিত হলেও দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই আইনটির চর্চা খুবই সীমিত। সমগ্র জনগণকে আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত করা সম্ভব হয়নি তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল এবং সীমিত অবকাঠামোর কারণে। (খ) Official Secrecy Act, 1923 - এই আইনটি দাপ্তরিক গোপনীয়তা বজায় রাখা সংক্রান্ত। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালে পাস হলেও Secrecy Act দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলনের কারণে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে দাপ্তরিক গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রবণতাটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। (গ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত কোনো আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না। (ঘ) তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষসমূহের স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ অফিসে অজ্ঞতার কারণে সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হয় না ফলে 'স্ব-প্রণোদিত' তথ্য প্রকাশের বিষয়ে কর্তৃপক্ষসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। (ঙ) তথ্য অধিকার আইনে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে, সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা যেমন- অন্যান্য কর্মকর্তাগণের যথাসময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহকরণসহ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। (চ) তথ্য কমিশন সময়ে সময়ে জনঅবহিতকরণ সভার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে। তদুপরি সমগ্র দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ এখনও এই আইন সম্পর্কে অবগত নয়। (ছ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কমিটিসমূহ মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব রয়েছে। (জ) বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। এ সময়ে বিভিন্ন সেক্টরে প্রযুক্তির বহুল প্রয়োগ শুরু হলেও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে Online Tracking System সহ তথ্য প্রযুক্তির কার্যকরী প্রয়োগ পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। (ঝ) সারা বিশ্ব কোভিড-১৯ মহামারির ভয়াল থাবায় আক্রান্ত। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনলাইনে জুম অ্যাপ্স এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল শুনানি গ্রহণের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলেও এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সাধারণ মানুষের এখনো সেভাবে সক্ষমতা তৈরি হয়নি।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর মূল লক্ষ্য হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ। এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির একটি আইনি ভিত্তি তৈরি হয়েছে। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ এবং সরকারি ও বিদেশি

অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতিমুক্ত দায়িত্ব পালন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বজায় রাখতে তথ্য কমিশন একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেলেও এই প্রবাহমানতা বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের। সকল প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব স্ব তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে এই প্রবাহ বজায় রাখলে তবেই এই আইনটির প্রণয়ন সফল হবে, তৈরি হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি, প্রতিষ্ঠা পাবে সুশাসন। আর এই স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে না কোনো বৈষম্য, সবার জন্য সমান অধিকার।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি।

# খাদ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশের প্রস্তুতি

## কামাল হোসেন

চালের দাম হ্রাস বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা আর সমালোচনা হাত ধরাধরি করে চলে। একটি পক্ষ মনে করে যে করেই হোক চালের দাম কম হতে হবে। আর একটি পক্ষ মনে করে সব কিছুর দাম বাড়লে চালের দামও বাড়া উচিত। প্রথম পক্ষের যুক্তি চাল এদেশের মানুষের প্রধান খাবার। প্রয়োজনে প্রণোদনা দিয়ে হলেও তা ভোক্তার কাছে কম দামে পৌঁছে দিতে হবে। দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি কৃষক যদি ধান চাষাবাদের মাধ্যমে লাভবান না হন তাহলে কৃষক চাষাবাদ কমিয়ে বিকল্প চাষাবাদে ঝুঁকবে। ফলে ধানের উৎপাদন কমে যাবে আমাদের দেশের চাল আমদানি বা পরনির্ভরতা বাড়বে। দুই পক্ষের যুক্তিগুলোকে সমন্বয় করে সরকার পরিকল্পনা সাজায় কীভাবে কৃষকের নায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায় আবার ভোক্তাকেও স্বস্তি দেওয়া যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে দেশের বাজারেও চালের মূল্য প্রতিনিয়ত বেড়েছে। কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা বলছেন সারা পৃথিবীজুড়ে জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব ও যুদ্ধাবস্থায় উৎপাদন কমে যাওয়া ও সরবরাহ চেইন সঠিকভাবে কাজ না করা। এ অবস্থায় সকলের মাঝে ভীতি কাজ করছে। চাল উৎপাদনকারী দেশ দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে কোনো কোনো দেশ আবার অতিরিক্ত মজুতের পথে হাটছে। ফলে নিত্য ভোগ্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছে জাতিসংঘ। আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বলছে, বিশ্ব 'মন্দার দ্বারপ্রান্তে'। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো মন্দার ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা (আঙ্কটাড) এক প্রতিবেদনে বলেছে, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি, সুদের হার বাড়ানোসহ নানাকারণ বিশ্বকে একটি বৈশ্বিক মন্দা ও স্থবিরতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এর আগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক কয়েক মাস ধরেই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছে। সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনেও গুরুত্ব পেয়েছে এ প্রসঙ্গ। তিনিও এ বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

খাদ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন দুই বছরের করোনা মহামারির পর ইউক্রেন যুদ্ধের জের ধরেই বিশ্বে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের সামনে কয়েকটি বিষয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসবে। আর তাই মন্দা মোকাবিলায় খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকির মাত্রা ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী অভুক্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ছে। একইসঙ্গে আগামী দুই বছর

বিশ্বের প্রায় সব দেশে দারিদ্র্যের সংখ্যাও বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খাদ্য দুষ্পাপ্য হওয়ায় অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধি যেমন বাড়বে, তেমনি মানুষের মধ্যে পুষ্টিহীনতাও বাড়বে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা খাদ্য নিরাপত্তার বড়ো ঝুঁকিতে পড়েছে। তবে এই ঝুঁকিতে বাংলাদেশ নেই। কিন্তু বাংলাদেশসহ অনেক দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত 'হালনাগাদ খাদ্য নিরাপত্তা সূচক' প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি। এতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো দেশ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে সেগুলোও তুলে ধরেছে। ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলো যাতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে সেজন্য তারা কিছু সুপারিশও করেছে প্রতিবেদনে।

ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও গম আমদানিতে সংকটে পড়ে। এরই মধ্যে গত মে মাসে বাংলাদশে গমের সবচেয়ে বড়ো সরবরাহকারী দেশ ভারত রফতানি বন্ধ করে দিলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। এমন পরিস্থিতিতে জিটুজি পদ্ধতিতে রাশিয়া থেকে পাঁচ লাখ টন গম আমদানির সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বন্দরে ইতোমধ্যে প্রথম চালানের ৫০ হাজার টন গম এসে পৌঁছেছে। পর্যায়ক্রমে দেশে অবশিষ্ট গম পৌঁছাবে। এছাড়া ভিয়েতনাম থেকে ২ লাখ ৩০ হাজার টন চাল, মিয়ানমার থেকে ২ লাখ টন চাল এবং ভারত থেকে এক লাখ টন চাল কেনা হচ্ছে। ভিয়েতনাম, ভারত ও রাশিয়া থেকে চাল আমদানিতে ইতোমধ্যে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন দিয়েছে। ইতোমধ্যে এলসি খোলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আমদানি করা চালও সময়মতো দেশে চলে আসবে। এই গম ও চাল কিন্তু আমাদের এখনই প্রয়োজন হচ্ছে না। আগাম সতর্কতা হিসেবেই এটা সংগ্রহ করে মজুত শক্তিশালী করা হচ্ছে।

বিগত বোরো মৌসুমে ১১ লাখ ২১ হাজার ৯১০ টন সিদ্ধ চাল এবং ৫৫ হাজার ২০৮ টন আতপ চাল সংগ্রহ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। তবে ধান কেনায় সরকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ৬ লাখ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও কেনা হয়েছে ২ লাখ ৬৮ হাজার ২৪৮ টন। তবে এতে কৃষকের লাভ হয়েছে। বাজারে ধানের মূল্য বেশি হওয়ায় সরকারি পর্যায়ে ধান সংগ্রহ কম হলেও সরকারের একটি উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সেটা হচ্ছে কৃষকের ধানের নায্যমূল্য প্রাপ্তি। সরকার ধানের দাম নির্ধারণ করে এবং বাজারে ক্রেতা হিসেবে থাকায় ফড়িয়া শ্রেণি কৃষককে ঠকাতে পারেনি। তাছাড়া সরকারি খাদ্য গুদামে মজুতের পরিমাণও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর বেশি আছে। আগস্টের শুরুতে মোট মজুতের পরিমাণ ছিলো প্রায় কুড়ি লাখ মেট্রিক টন।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার

নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিপালন করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিজমি কমে যাওয়ায় সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সারের একাধিকবার মূল্য হ্রাসে করেছে। একইসঙ্গে কৃষি ঋণ বিতরণ, গবেষণায় অগ্রাধিকার ও প্রণোদনা দেওয়ার ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে দেশ। জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে। তাপমাত্রা ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে দেশে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির কারণে শুধু কৃষিই নয়, মানুষের চিরচেনা স্বাভাবিক জীবন প্রবাহই আজ ব্যহত। এদেশের ৪০ শতাংশ লোক কৃষির সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তাই সমস্যার সরাসরি ভুক্তভোগীর সংখ্যাও এখানে বেশি।

ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পরাশক্তিগুলোর নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার কারণে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকরি মুখে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের মানুষকে প্রতি ইঞ্চি জমিতে শস্য আবাদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সামনে আরও কঠিন সময় আসতে পারে জানিয়ে তিনি জনগণকে মিতব্যায়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সাথে আশ্বস্ত করে বলেছেন, বাংলাদেশের এই মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ভালো যা দিয়ে পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে। মানুষের কষ্ট লাঘবে যা করা দরকার তার সব উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি করার নির্দেশও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

করোনার অভিঘাতের পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারাবিশ্বে খাবার ও জ্বালানির দাম বেড়েছে। বাড়তি মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক দেশই হিমশিম খাচ্ছে। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিলাসি পণ্য আমদানি কমানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমাতে হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। এই সঙ্কটের মধ্যে নিত্যপণ্যের দাম যেন আরও বেশি অস্থির না হয়, সেজন্যই খাদ্য মজুত ঠিক রাখার ওপর জোর দিচ্ছে সরকার। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে কাঁচাবাজারে প্রায় সব ধরনের সবজি, চালসহ বেশির ভাগ নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। চালের দাম বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশে খুচরা বিক্রতারা পাইকারদের দোষ দেন। আর পাইকারি বিক্রতেরা মিলারদের দোষারোপ করেন। চালের বাজারে কারসাজি রোধে মিলগেট ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের দৈনিক দাম ঘোষণার জন্য ওয়েবসাইট তৈরির জন্য বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো স্থানে কে কত দামে চাল ক্রয় বিক্রয় করছেন তা সহজেই জানা যাবে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, সারা বিশ্বে চাল ও গমের মূল্য ইচ্ছা করলে যে কোনো প্রান্তে বসে তা জানার সুযোগ আছে। কিন্তু আমাদের দেশের চাল ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যের সঠিক তথ্য গোপন করা হয়। উদ্দেশ্য থাকে অতি মুনাফা লাভ।

পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের (পিএফডিএস) আওতায় খোলা বাজারে

খাদ্যশস্য বিক্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রবণতা রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা দেওয়া এবং বাজার দর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এক যোগে ওএমএস এবং খাদ্যবন্ধব কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে মাসে ১০ কেজি করে চাল দেওয়া হচ্ছে। ওএমএস কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৪ হাজার টনের বেশি চাল বিক্রি করা হচ্ছে।

১ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের বিভিন্ন শহরে এক যোগে ২৩৭৩টি ডিলারের মাধ্যমে ওএমএস-এর কার্যক্রম চলছে। প্রতি ডিলার দিনে দুই টন করে চাল বরাদ্দ পাবেন। একজন ডিলার দিনে ৪০০ পরিবারের কাছে এই চাল বিক্রি করবেন। এতে দিনে মোট ১৬ লাখ ১০ হাজার ৪০০ পরিবার ৩০ টাকা কেজি দরে ৫ কেজি করে চাল কিনতে পারছেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে। এই কর্মসূচির আওতায় দিনে মোট ৪ হাজার ৭শত ৬৫ মেট্রিক টন চাল খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে মোট ৫০ লাখ পরিবার সুবিধা পাচ্ছেন। দেশের ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ১৫ টাকা কেজি দরে তারা এই চাল সংগ্রহ করতে পারছেন। এই কর্মসূচির আওতায় এক পরিবার মাসে ৩০ কেজি করে চাল সংগ্রহ করতে পারবেন। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় বছরের কর্মাভাবকালীন ৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নবেম্বর) পরিবার প্রতি ১৫ টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়া হয়। অন্যদিকে ওএমএস কর্মসূচির আওতায় যে কেউ ডিলারের কাছ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে সর্বোচ্চ ৫ কেজি চাল কিনতে পারেন।

সরকারের এ কর্মসূচির দৃশ্যমান প্রভাব পড়েছে চালের বাজারে। তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে অযৌক্তিকভাবে বাড়ানো চালের দাম নিয়ন্ত্রণে যেমন এসেছে তেমনি স্বস্তিতে আছে স্বল্প আয়ের মানুষ। এছাড়াও বাজারে ঊর্ধ্বগতির লাগাম টানতে আমদানি শুল্ক উঠিয়ে দিয়েছে সরকার। চাল আমদানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে বাজারে চালের দাম কমতির দিকে। সব মিলিয়ে বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি বেশ ভালো এতে সন্দেহ নেই।

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

# জাজ্বল্যমান জ্বালানি নিরাপত্তায় পিতা থেকে তনয়া

## আফরোজা নাইচ রিমা

জ্বালানি শক্তির উপরই নির্ভর করে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব। বাংলাদেশে জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রের অধিকাংশই স্থলভাগে অবস্থিত। এজন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির জন্য স্থলভাগের পাশাপাশি দেশের বিশাল সমুদ্রসীমায় অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার এবং উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। বহুমুখী জ্বালানির সাহায্যে সমৃদ্ধ আগামী গড়াই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট নিরসনে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ভালো। প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন,গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জ্বালানি স্বল্পতার বিপর্যয়ের খাদে পা দিয়েছে বিশ্ব।

তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা বলেন,দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে কখনো বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়নি। সেখানেও সাশ্রয়ের জন্য বলা হয়েছে এবং অনেক শহরে পানি গরম করার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। আর ৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশের বাজারে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কমছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এক প্রজ্ঞাপনে আগামী ৩১/১২/২০২২ পর্যন্ত ডিজেলের উপর আরোপণীয় সমুদয় আগাম কর থেকে অব্যাহতি এবং আমদানি শুল্ক ১০% এর পরিবর্তে ৫% নির্ধারণ করার ফলে ভোক্তা পর্যায় জ্বালানি তেল ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রোল -এর মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ কিনে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ইএসএসও ইস্টার্ন ইন-কে সরকারিকরণ করে জ্বালানি তেলের মজুত, সরবরাহ ও বিতরণে পদক্ষেপ নেন। তার এ যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সরকারের সময়ে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ ও জকিগঞ্জ নামে মোট ৫টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার লাইন কিলোমিটার

২-ডি সিইসমিক জরিপ এবং ১ হাজার ৫৩৬ বর্গকিলোমিটার ৩-ডি সিইসমিক জরিপ কার্যক্রম চলছে। সরকার জ্বালানি খাতকে আধুনিক ও ডিজিটালাইজড করতে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং প্রবর্তন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বাড়াতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণে গ্যাস উত্তোলন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ কয়লার মজুত নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যাবসাবাণিজ্যে বর্ধিত হারে গ্যাস সরবরাহ করার ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। গ্যাসের অপচয় রোধে আবাসিক গ্রাহকদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় চার লাখ প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশীয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা (Permanent Sovereignty Over Natural Resources) প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতা গ্রামীণ উন্নয়ন এবং নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের বিষয়টিকে সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন (অনুচ্ছেদ-১৬)। বঙ্গবন্ধুর এই বৈপ্লবিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) গঠন করেন।

দেশের জ্বালানি সম্পদ আরোহণ, উৎপাদন, বিতরণের নীতিমালা তৈরি করে কীভাবে বিপুল পরিমাণ বেসরকারি বিনিয়োগ আনা যায় তার সম্বন্ধেও ভেবেছিলেন। ১৯৭৪ সালে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট এ ভাবনা চিন্তারই ফসল। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আরবের দেশগুলো তেল উৎপাদনে অবরোধ সৃষ্টি করে এবং ২ ডলার ব্যারেলের তেলের মূল্য ১২ ডলারে গিয়ে ঠেকে। বাংলাদেশের অর্থনীতি তখন সম্পূর্ণ তেলের ওপর নির্ভরশীল। এ মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের আমদানি খরচের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শুধু তেল আমদানিতে চলে যেতে শুরু করে। এ রকম পটভূমিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৭৪ সালে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোকে বঙ্গোপসাগরে তেল অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ জানানোটা সাহসী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের পরিচায়ক। ১৯৭৪এর পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের আওতায় এশল্যান্ড, আরকো (ARCO), বিওডিসি (জাপান), ইউনিয়ন অয়েল, কানাডিয়ান সুপিরিয়র অয়েল ও ইনা নাপটাপ্লিন নামের ছয়টি কোম্পানিকে বঙ্গোপসগারে মূলত তেল অনুসন্ধানের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এ কোম্পানিগুলো প্রায় ৩২ হাজার কিমি গ্র্যাভিটি, ম্যাগনেটিক ও সাইসমিক সার্ভে করে এবং সাগরে মোট সাতটি কূপ

খনন করে। ইউনিয়ন অয়েল ১৯৭৭ সালে কুতুবদিয়া গ্যাস খনি আবিষ্কার করে। ১৯৭৮ সালে এ কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ ত্যাগ করে। যুদ্ধ-পরবর্তী গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে বঙ্গবন্ধু রাশিয়া সরকারেরও সাহায্য নেয়।

বঙ্গবন্ধু জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে পেট্রোলিয়াম আইন ও পেট্রোলিয়াম পলিসি প্রণয়ন করেন। উক্ত আইন ও পলিসির আওতায় তিনি দেশীয় কোনো মূলধন বা বিনিয়োগ ছাড়াই বিদেশি/বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের লক্ষ্যে 'উৎপাদন বণ্টন চুক্তি' পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৫৯ এর মাধ্যমে দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বিদ্যুৎখাত পুর্ণগঠন করেন। জাতির পিতা ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertaking Acquisition Ordinance 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc-কে অধিগ্রহণ করে এদেশে জ্বালানি তেল মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত এই সকল স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানসমূহই আজও এদেশের তেল সেক্টরের জ্বালানি নিরাপত্তা বলয় হিসেবে কাজ করছে।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প- ২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সরকার জ্বালানির বহুমুখীকরণের (Diversification) নীতি গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থায় দেশের জ্বালানি মিশ্রণে দেশীয় গ্যাস সম্পদের পাশাপাশি কয়লা, আমদানিকৃত এলএনজি, পারমাণবিক বিদ্যুৎ, তরল জ্বালানি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় জ্বালানি বাণিজ্যের মাধ্যমে আহরিত জ্বালানি/বিদ্যুৎ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে একটি টেকসই 'জ্বালানি ঝুড়ি' (Fuel Basket) গড়ে তোলা হচ্ছে। জ্বালানিভিত্তিক প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বর্তমান সরকার মহেশখালী ও মাতারবাড়িতে একটি এবং পায়রাতে একটি 'এনার্জি হাব' গড়ে তুলছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি 'এনার্জি ডিপ্লোম্যাসি'কে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে প্রধান্য দিয়ে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ভারত থেকে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ আনার জন্যে ভেড়ামারায় যে ক্রসবর্ডার ইন্টারকানেকশন স্থাপিত হয়েছে, সেটি শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়া তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এছাড়া ভারতের ত্রিপুরার সাথেও ক্রসবর্ডার ইন্টারকানেকশন স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের মোট সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ ভারত থেকে আসছে যা দেশের উৎপাদিত বিদ্যুতের গড় মূল্যের তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী। এছাড়া ভারতের ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরা থেকে যথাক্রমে ১৪৯৬ ও ৩৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎসহ মোট ১৮৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি হয়েছে। বর্তমানে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে ক্রসবর্ডার ইন্টারকানেকশন স্থাপিত হয়েছে, বাংলাদেশের জ্বালানি

নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ইন্টারকানেকশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ভুটান ও নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আনার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে জ্বালানিভিত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে সরকার 'সার্ক ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ফর এনার্জি কো-অপারেশন (ইলেকট্রিসিটি)'তে যুক্ত হয় এবং বিমসটেক এর সদস্য দেশগুলোর সাথে গ্রিড ইন্টারকানেকশন বিষয়ে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই উদ্যোগের ফলে ২০৪১ সাল নাগাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্য ও রিজিওনাল গ্রিড থেকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ পাবে।

জাতির পিতা ১৯৭২ সালে সংবিধানের ১৪৩ (১) (খ) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তভর্তী মহাসাগর ও বাংলাদেশের মহিসোপানে অবস্থিত রক্ষার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে 'The Territorial Waters and Maritime Zones Act' প্রণয়ন করেন। সমুদ্র ও সমুদ্রসীমা রক্ষায় শেখ হাসিনা ২০০১ সালে জাতিসংঘের ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন (UNCLOS) অনুসমর্থন (Ratification) করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও সাহসী নেতৃত্ব এবং সফল এনার্জি ডিপ্লোম্যাসির কারণে আমরা মিয়ানমার ও ভারতের দাবির বিরুদ্ধে বিশাল সমুদ্রসীমা অর্জন করেছি। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সালে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করে, যার আওতায় দেশের গ্যাস সেক্টরে বর্তমানে ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া গ্যাস সেক্টরকে সার্বিক সহায়তার জন্য ২০১৫ সালে সরকার 'এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ড' নামে আরেকটি তহবিল গঠন করে। সকল খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন।

আগামীর সমৃদ্ধ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ার জন্য নতুন সরকারের কাছে এখন একমাত্র চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে বিশ্বের শীর্ষ ১১টি অর্থনীতির দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। জাতির পিতার পরে শেখ হাসিনাই একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যিনি সকল বাধা উপেক্ষা করে জাতির পিতার এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানামুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে জাজ্বল্যমান- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁরই তনয়া শেখ হাসিনা।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি।

# চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, আমাদের করণীয়

## ড. এম সুয়াইব

তথ্যপ্রযুক্তিসহ সকল প্রযুক্তি নানা মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীর আর্থসামাজিক মানচিত্রকে গত তিন-চার দশকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিজ্ঞানের নানা অভূতপূর্ব আবিষ্কার ও উন্নয়নের কারণে মানুষ দিন দিন বেশি সক্ষমতা অর্জন করছে। বর্তমান প্রযুক্তির অভাবিত উদ্ভাবন সমাজের ব্যাপক আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমাদের দেশেও আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। আমাদের দেশে এখন আর আগের মতো সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে হাট বসে না। এখন সপ্তাহের প্রতিদিনই বাজার বসে। মহাসড়কের দুই পাশে দোকান বেড়েই চলছে। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। গ্রামের রাস্তায় এখন আর গরুর গাড়ি দেখা যায় না, এমন কী প্যাডেল রিকশা ভ্যানের জায়গা দখল করে নিয়েছে ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক। গ্রামে খুব কম পরিবার আছে যাদের ফ্রিজ,টিভি নেই। মোবাইল ছাড়া পরিবার এখন খুঁজে পাওয়া দায়। আর এ সবই হয়েছে আমাদের চোখের সামনে গত দুই দশকেরও কম সময়ের মধ্যে। নতুন নতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবন ব্যাবস্থাকে পাল্টে দিচ্ছে। আমরা, আমাদের অজান্তেই পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। এ সব প্রযুক্তি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থায় যা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। বলা হচ্ছে এ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। যার প্রভাব ইতোমধ্যেই সীমিত আকারে হলেও পড়তে শুরু করেছে। সময়ের পরিক্রমায় এটি আরও বেশি দৃশ্যমান হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব আমরা মিস করেছি। ১৭৮৪ সালে প্রথম শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে বাষ্পীয় ইঞ্জিন মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিল গতিকে। মূলত পানি আর বাষ্পের ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এ শিল্পের মাধ্যমে। এর পর ১৮৭০ সালে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বাতি মানুষকে দেয় এক আলোকিত বিশ্ব। আর এ বিদুৎ শক্তি ব্যবহার করে গণ-উৎপাদন শুরু হয়। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের আর্শীবাদ বিদ্যুৎ-কে আমরা মানুষের ঘরে পৌছে দিলাম ২০২১ সালে। বিদুৎ নির্ভর শিল্পবিপ্লবকে আমরা ধরতে ব্যর্থ হলাম। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে আমেরিকা। ইন্টারনেট বিশ্বকে গোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত করলো। কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়ে গেলো। ১৯৬৪ সালে আমাদের এ ভূখণ্ডে প্রথম কম্পিউটার এলো। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবকেও আমরা যথা সময়ে ধরতে পারিনি। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কুদরত-ই-খোদা কমিশন

গঠন করেন। কুদরত-ই-খোদা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে টি এন্ড টি বোর্ড গঠন করা হয়। বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু সরকার কিছু কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করেছিলেন। ৩য় শিল্পবিপ্লবকে মোকাবিলার জন্য সদ্য স্বাধীন দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং স্বল্প, মধ্যে ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করে, এ-সব কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু সরকারের পর এ-সব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি।

এমন কী আমাদের অজ্ঞতার কারণে বিনামূল্যে সাবমেরিন ক্যাবল কানেক্টিভিটি সুযোগও হাত ছাড়া হয়েছে। যা পরে আমাদের অর্থের বিনিময়ে নিতে হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গুরুত্বপূর্ণ চারটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,যার সুদূরপ্রসারি প্রভাব তখন সবাই বুঝতে পারেনি। সেই চারটি সিদ্ধান্ত হলো কম্পিউটারের উপর থেকে সকল প্রকার ভ্যাট,ট্যাক্স প্রত্যাহার, মোবাইল ফোনের লাইসেন্স একটি আপরেটরের পরিবর্তে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। এর ফলে গ্রামীণসহ অনেকগুলো কোম্পানি মোবাইল সেবায় চলে আসে এবং লাখ টাকার মোবাইল কয়েক হাজার টাকায় মানুষের হাতে পৌঁছে যায়। তৃতীয় সিদ্ধান্ত হলো ইন্টারনেট সংযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। চতুর্থ সিদ্ধান্ত ছিলো কারিগরি শিক্ষার প্রসার। এসবই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। পৃথিবীর কোনো দেশই সময় নির্ধারণ করে ঘোষণা দিয়ে ডিজিটাল দেশ হয়নি,এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। আগামী এক দশকে ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে আমরা এমনসব পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, যা এর আগে পাঁচ দশকেও সম্ভব হয়নি।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিষয়ে কেউ ধারণাও করতে পারছে না ভবিষ্যতে কী হবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা কম। এসব দেশে কাজ করার মতো জনবলের ঘাটতি রয়েছে। তাদের অন্যের শ্রমের উপর নির্ভর করতে হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হলো জনশক্তির অভাবকে রোবট ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি দিয়ে পূরণ করা। পৃথিবীর সব দেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব একই মাত্রায় হবে না। জাপান ইতোমধ্যেই বলেছে আমরা যান্ত্রিক সভ্যতা চাইনা,মানবিক সভ্যতা চাই। এই যান্ত্রিক সভ্যতা দিয়ে মানবজাতি এগুতে পারেনা। সেই কারণে তারা বলছে সোসাইটি ৫০ গড়ে তুলতে হবে। জাপান মনে করে প্রযুক্তি হতে হবে মানবিক। বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রয়োগ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো ঐ পর্যায়ে এ মূহুর্তে হবে না। এর প্রয়োগ ভিন্ন পর্যায়ে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পড়তে শুরু করেছে। আগামী কম-বেশি এক দশকের মধ্যে শিল্প খাতের ৫৩ লাখ পেশাজীবীর পেশা পরিবর্তন করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের ৬০ ভাগ,আসবাবপত্র

শিল্পের ৫৫ ভাগ,প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও কৃষিতে ৪০ ভাগ, চামড়া শিল্পের ৩৫ ভাগ এবং পর্যটন শিল্পের ২০ ভাগ জনবলের চাকরি পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ চাকরি হারাবে। আমরা পৃথিবীতে এক অসাধারণ ভালো সময়ে বসবাস করছি। পৃথিবীতে ১২ বিলিয়ন ড্রাইভার লাগে। এখন ড্রাইভার লেস গাড়ি চলবে। এই টেকনোলজি উন্নত বিশ্বের ড্রাইভারের চাহিদা পূরণ করবে। যারা ড্রাইভারের কাজ করতো তারা দ্রুত প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ জনশক্তি হয়ে অন্য সেক্টরে কাজ করবে। প্রশ্ন হলো সবাই কী প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে কাজ যোগাড় করতে পারবে,যারা পারবে না তাদের কী হবে। তবে আশার কথা হলো এই কাজ হারানো চাপ একসাথে আসবে না। পর্যায়ক্রমে আসবে। আর এজন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। যাতে শ্রম বাজারের চাহিদা মোতাবেক দক্ষ জনবল তৈরি করা যায়।

বিশ্বের দুই শত কোটি মানুষের অপূরণকৃত প্রয়োজন বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করার সুযোগ এনে দেবে এটাই হলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক দিক। এর মাধ্যমে অতিরিক্ত চাহিদা ও যোগান সৃষ্টি হবে। ডিজিটাল সক্ষমতা অর্জনে সবার আগ্রহ থাকবে। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনশক্তির দেশগুলো তাদের শ্রমশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা নিতে পারবে। তবে এ জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই অদক্ষতাকে কেন্দ্র করে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যারা চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করবে। এরা ভূঁইফোড়, এরা অদক্ষ জনবল তৈরি করছে,মানুষকে ঠকাচ্ছে, দেশের ক্ষতি করে লাভবান হচ্ছে। দ্রুতই পরিকল্পনা মাফিক সঠিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, তাহলে এসব ভূয়া প্রতিষ্ঠান এমনিতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় সরকারি, বেসরকারিসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সাথে ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে, যা খুবই ইতিবাচক দিক। দেশের জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং এগুলো মোকাবিলার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। বিষয়টি খুব সহজ নয়, এজন্য বিশ্বের উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। জ্ঞান যদি কাজেই না লাগে, সে জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। তাই উন্নত দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান উন্নয়নশীল দেশসহ সকল দেশে সহজে এবং বাধাহীনভাবে বিনিময় করতে হবে। এভাবেই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। জাতির আশা আমাদের ডিজিটাল প্রজন্ম হাত ধরে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করে স্বপ্ন পূরণের নতুন যুগে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ।

লেখক : শিক্ষক, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

# প্রসব পরবর্তী বিষণ্নতা ও করণীয়

## সিরাজুম মুনিরা

প্রসব-পরবর্তী বিষণ্নতা বা পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন হলো সন্তান জন্মদান-পরবর্তী মায়েদের এক ধরনের মানসিক সমস্যা যা সাধারণ-বিষণ্নতার পর্যায়ে থাকে না এবং যে সমস্যার চিকিৎসা/ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন (ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক তথ্য থেকে জানা যায় ১০ শতাংশ নারী গর্ভাবস্থায় এবং ১৩ শতাংশ নারী সন্তানের জন্মের পর বিষণ্নতায় ভোগেন। মনোবিজ্ঞানী ক্যারেন ক্লেইমান (প্রসব পরবর্তী স্ট্রেস সেন্টার এর প্রতিষ্ঠাতা এবং কার্যনির্বাহী পরিচালক, (LLC) প্রসব পরবর্তীকালে মায়ের বিষণ্নতা এবং হতাশার ওপর বিভিন্ন গবেষণা করেন। তার গবেষণায় দেখা যায়, নতুন মায়েরা সবাই কমবেশি হতাশায় ভোগেন। আর হতাশার কারণ হলো সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে সারাক্ষণ মনে করে কিছু ভুল করেছি কী। এক ধরনের অস্থিরতা ভোগে। আবার নিজের সমস্যা কারো সাথে শেয়ার করে না হীনমন্যতার কারণে। নিজেকে গুটিয়ে রাখে সবকিছু থেকে। প্রাথমিকভাবে পরিবারের সহযোগিতায় এ সমস্যার সমাধান করা যায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি হলে মনোরোগের চিকিৎসা করতে হয়।

প্রসব পরবর্তী সময়ে নবজাতকের মায়েরা যে ৫ ধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকেন সেগুলো হচ্ছে বেবি ব্লু- (Baby blue); পোস্টপার্টাম সাইকোসিস (Postpartum psychosis); পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন (Postpartum depression); পোস্টপার্টাম এনক্সাইটি (Postpartum Anxiety); পোস্ট ট্রমাটিক এবং স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (Post traumatic stress disorder).

সন্তান জন্মের পর ৮০ শতাংশ মা বেবি ব্লু তে ভুগে। এ ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের তিন-চার দিন পর প্রসূতি মায়ের যে লক্ষণ দেখা যায় তা হলো মন খারাপ থাকা বা অকারণে কান্নাকাটি করা। রাতে ঘুম হয় না। নিজের সন্তানটি পেটের ভিতরে না থাকায় শূন্যতা বোধ করা এবং সন্তানের প্রতি অমনোযোগী হওয়া। নারীদের হরমোনের তারতম্য, প্রসবজনিত মানসিক চাপ, মাতৃত্বের দায়িত্ববোধের উপলব্ধি সব মিলিয়েই নারীর এই বিশেষ মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। স্বস্তির সংবাদ হচ্ছে, এর অধিকাংশই হয়ে থাকে ক্ষনস্থায়ী। কয়েক দিন থেকে সপ্তাহ পর্যন্ত লক্ষণগুলো স্থায়ী হতে পারে। এ সময় নতুন মায়ের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সমর্থন, সহমর্মিতা আর শিক্ষা। শিক্ষা-সন্তান প্রতিপালনের, শিক্ষা-দায়িত্বশীলতার, শিক্ষা-দৃঢ়তার সঙ্গে মানসিক চাপ মোকাবিলার এক্ষেত্রে পরিবারের, বিশেষ করে স্বামীর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

গবেষকরা বলেন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ প্রসূতি আক্রান্ত হন পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশন বা প্রসব-পরবর্তী বিষণ্নতায়। সাধারণত প্রসবের তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে

নারী আক্রান্ত হতে পারেন বিষণ্নতায়। বেবি ব্লুর মত ক্ষণস্থায়ী হয় না এই রোগ, উপসর্গগুলোও হয় তীব্রতর। প্রায় সার্বক্ষণিক মন খারাপ ভাব, হতাশা, অতিরিক্ত উদ্বেগ, অনিদ্রায় ভোগেন নতুন মা। দৈনন্দিন কাজকর্মে উৎসাহ হারান, মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন না কোনো কিছুতে। এমনকি নিজের শখের বা পছন্দের কাজগুলো করতে আর ভালো লাগে না। অল্প পরিশ্রমে বা বিনা পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ করেন। খাদ্যাভ্যাসে আসে পরিবর্তন। বেশিরভাগেরই খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যায়। স্বল্পাহারে থাকার ফলে কিছুদিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে ওজন কমে যায়। কেউ কেউ আবার বেশি বেশি খেতে শুরু করেন। ফলে ওজন বেড়ে যেতে পারে অস্বাভাবিক হারে। অনেকেই অকারণে অপরাধ বোধে ভোগেন, বিগত দিনের তুচ্ছ প্রায় ঘটনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার ফলে নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করেন। সবার মাঝে থেকেও নারী একাকীত্বে ভোগেন, নিজেকে অসহায় লাগে, ধীরে ধীরে পরিবারের সকলের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে খোলস বন্দি হয়ে পড়েন। এতে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিজীবন। নারী তার নিজের জীবন সম্পর্কেই এক সময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন, হয়ে ওঠেন আত্মহত্যা প্রবণ। গুরুতর পর্যায়ে গেলে মা তার নিজের সন্তানকে বোঝা মনে করেন, এমনকি তাকে মেরেও ফেলতে চান।

প্রসব পরবর্তী বিষণ্নতা সাধারণত হরমোন, জৈব, পারিপার্শ্বিক, মানসিক, ও জন্মগত বিভিন্ন উপাদানের কারণে এ ধরনের সমস্যার হতে পারে যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কেউ কেউ হয়তো নিজেকে প্রসব-পরবর্তী বিষণ্নতার জন্য দায়ী করতে পারেন কিন্তু এটি আসলে মায়ের কিছু করা বা না করার কারণে হয় না। প্রত্যেকটি নতুন মা-ই প্রসব-পরবর্তী বিষণ্নতার বা পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশন এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। তবে কিছু কিছু মায়েদের ঝুঁকি বেশি থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বয়স কম ও অল্প শিক্ষিত নারীদের প্রসবোত্তর বিষণ্নতায় ভোগার সম্ভাবনা বেশি।

গর্ভবতী নারীদের যেসব কারণে ঝুঁকি বেশি হতে পারে সেগুলো হলো- পূর্ববর্তী বিষণ্নতা বা অন্যান্য মানসিক ব্যাধির ইতিহাস, বিষণ্নতার পারিবারিক ইতিহাস, গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা, সাম্প্রতিক মানসিক চাপ, যেমনঃ বিবাহ বিচ্ছেদ, মৃত্যু বা প্রিয়জনের গুরুতর অসুস্থতা। অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ / মৃত সন্তান প্রসব, জমজ, ট্রিপলেট বা অন্যান্য জটিলতা। সময়ের আগে শিশুর জন্ম বা স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে জন্ম হওয়া। একাকীত্ব বোধ বা মানসিক সহযোগিতায় অভাব। ঘুমের সমস্যা এবং ক্লান্তি, বিশ্রামের অভাব। আর্থিক অনটন, কম থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা, মাদক ব্যবহার ইত্যাদি।

গর্ভবতী মায়েদের রোগটি ধরতে পারাই চিকিৎসার প্রথম শর্ত। কাঙ্ক্ষিত সন্তান জন্মের পর একজন মায়ের মনে বিষণ্নতা বাসা বাঁধতে পারে, এ বিষয়টি কারো মাথায় আসেনা। মা নিজেও তার অনুভূতির এ পরিবর্তনের জন্য সংকোচ বোধ

করেন। ফলে বেশিরভাগ মা মাসের পর মাস এ অসুস্থতায় কষ্ট পেতে থাকেন। সুতরাং শিশু জন্মের পর মায়ের আচার আচরণে পরিবর্তন দেখা দিলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সাধারণ সাইকোথেরাপি ও ঔষধের যৌথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির মাধ্যমে রোগীর ভ্রান্ত ধারণাকে চিহ্নিত করা হয় ও তার বদলে সুস্থ ও বাস্তবসম্মত ধারণা গঠনে সাহায্য করা হয়।

মায়ের এই বিষণ্নতা থেকে হতে পারে ক্রনিক ডিপ্রেশন বা দীর্ঘমেয়াদি বিষণ্নতা কিংবা মেজর ডিপ্রেশন। পারিবারিক বিপর্যয়, ডিভোর্স এবং রোগীর আত্মহত্যা। নিরাপত্তাহীনতা এবং মায়ের অস্বাভাবিকতার কারণে নবজাতকের মানসিক ভারসাম্য এবং মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে যা ভবিষ্যতে অন্য অনেক বিপর্যয়ের জন্ম দিতে পারে। বাচ্চা নিজেও ভবিষ্যতে বিষণ্নতায় ভুগতে পারে। শিশু নির্যাতন (Child Abuse), শিশুকে রেগে গিয়ে ঝাঁকানো/ছুঁড়ে মারা যার ফলে হতে পারে মায়ের হাতে নবজাতক হত্যার মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনা যা আশেপাশের মানুষের খালি চোখে কখনোই ব্যাখ্যা করা যাবে না।

পরিবারের কারও এরকম সমস্যা হলে তাকে যথাসম্ভব মানসিক সাপোর্ট দিতে হবে। প্রসূতি যদি বেবি ব্লুজনিত খিটখিটে আচরণ করে তাকে ভরসা দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা তাকে সহযোগিতা করবে। কঠিন পরিশ্রম হয় এমন কাজের দায়িত্ব প্রসূতিকে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, এতে সে মানসিক স্বস্তি পাবে। মাকে নিয়মিত কিছু ব্যায়াম ও ঔষধ সেবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, নতুন রুটিনে অভ্যস্ত হতে উৎসাহ দিতে হবে। মা ও শিশুকে নিরিবিলি কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, এবং কিছু ভালো বই পড়তে উৎসাহ দিলে বিষণ্নতা অনেকটা কমে যাবে। তার ছোটো ছোটো ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনা। এতে সে মানসিক সুখ লাভ করবে। তাকে বিশ্বাস করা এবং তার ভালো কাজগুলোর প্রতি প্রশংসা করা উচিত। শিশুর যত্ন নিতে তাকে সাহায্য করা উচিত। বাড়ির পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে মায়ের ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। উদাহরণস্বরূপ- তাদের জন্য পর্যাপ্ত আলো, বাতাস ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ এর ব্যবস্থা করা। মা যাতে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে, এই জন্য পরিবারের সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ারও প্রয়োজন হয়।

পরিবারে সদস্যরা প্রায়ই অধিক সচেতনতা ও সাহায্য করতে যেয়ে প্রসূতির বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে। প্রসূতি মাকে কখনো মানসিকভাবে আঘাত করা যাবে না, এবং কোনো ব্যাপারে দায়ী করা যাবে না। সন্তান জন্মদানের প্রসূতির দৈহিক গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করা থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

নতুন মায়েদের জন্য করণীয় হলো বিভিন্ন কাজে অন্যের সাহায্য নিতে হবে। সেই সাথে নিজের সমস্যা অন্যের সাথে শেয়ার করলে তারা কী ধারণা করবে এই জাতীয়

চিন্তা বাদ না দিলে সমস্যা বরং আরও বাড়বে। সমস্যা শেয়ার করতে হবে এবং সাহায্য চাইতে হবে। চারপাশের পরিবেশ হয়তো কিছুদিনের জন্য প্রতিকূল হতে পারে, কিন্তু মাকে বিশ্বাস করতে হবে তার বাচ্চার জন্য সেরাটা শুধু তিনিই ভাবতে বা করতে পারেন। প্রসব পরবর্তী বিষণ্নতা বা পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন এর উপসর্গ দেখা গেলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসক কিংবা কনসালটেন্ট এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই সমস্যা একেবারে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয় যা শুধু নিজের সাথেই ঘটেছে এবং এটি সম্পূর্ণভাবে নিরাময়যোগ্য। পৃথিবীর সকল মা অসাধারণ হয়তো একেক জন একেক রকমের।

প্রসব একটি কষ্টকর প্রক্রিয়া এবং প্রসূতি এতে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়তে পারে। পারিবারিক সমর্থন ও প্রসবোত্তর বিষণ্নতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ব্যক্তিভেদে প্রসূতি মায়ের সমস্যা বিভিন্নভাবে হতে পারে। তাই পরিবারের সদস্যদের সতর্ক থাকতে হবে এবং যতটা সম্ভব তাকে সহায়তা করতে হবে। আমাদের সমাজে সন্তান প্রসবের পর মা ও শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে উপেক্ষিত থাকে মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য। একজন সদ্য প্রসূতি মা যেন বিষণ্নতায় না ভোগেন এবং তিনি যেন শিশুর যত্ন নিতে পারেন, এ কারণেই প্রসব-পরবর্তী বিষণ্নতায় পরার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিষণ্নতায় নারী ও তার সন্তানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। মায়ের বিষণ্নতার কারণে সন্তান বঞ্চিত হয় উপযুক্ত মাতৃস্নেহ ও সেবা থেকে। বিষণ্ন নারী যেমন নিজের যত্ন নেন না তেমন সন্তানের যত্নেও উদাসীন থাকেন। তাই সন্তান জন্মের আনন্দ উৎসবের মাঝে লক্ষ্য রাখতে হবে সদ্য মা হওয়া নারীটির মানসিক অবস্থার দিকে। উপযুক্ত সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে হবে নতুন মাকে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা করতে হবে বিশেষজ্ঞ সহায়তার। মাতৃত্ব হোক নিরাপদ এবং আনন্দের।

লেখক: সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ সচিবালয়।

# Noise Pollution and its Probable Impacts on Public Health in Dhaka City

## Dr. Sharmeen Jahan

Noise is a “loud and unpleasant” sound that exceeds the acceptable level and creates Annoyance. With urbanization and increasing human activities, the problem of noise pollution in Dhaka, the capital city of Bangladesh, is worsening day by day. Along with water and air pollution, noise pollution has also become a hazard to the quality of life. Noise pollution is a subtle killer. Even a relatively low noise level affects human health adversely. In Dhaka, the average sound level is 80-110dB in prime areas such as Farmgate, Karwan Bazar, Shahbagh, Gabtoli, and Mohakhali Bus Terminal, says the studz report. This is almost twice the maximum noise level that can be tolerated by humans – 60dB – without suffering a gradual loss of hearing, according to the World Health Organization (WHO).

UN Environment Program (UNEP, 2022) report declared Dhaka the worldÕs noisiest city. Against the permissible limits of 55 decibels as set by the WHO, the noise levels in Dhaka were found to be at least twice that, at 110-132 decibels.75% of noise pollution in Dhaka originates from vehicles. According to the WHO, around 5% of the worldÕs population is facing several kinds of health hazards due to complexities related to noise pollution. Around 11.7% of the population in Bangladesh has lost their hearing due to noise pollution, says the Department of Environment (DoE) studz, which was conducted in order to check noise pollution, the government has introduced Bangladesh Sound Pollution (Control) Rules, 2006. According to the guidelines, exceeding the maximum noise level in a certain area is a punishable offense.

Also, using a stone breaker machine in a residential area is prohibited, and a permit from the DoE is required to organize any social or religious event that could generate loud noise in a residential area. However, the rules have never been properly implemented anywhere in the country, the studz has found. The department of environment occasionally monitors traffic and industrial noise pollution. The major sources of noise pollution in urban areas are traffic and loud horns. The DoE found that in Dhaka, 500-1,000 vehicles honk at the same time when stuck in traffic. Other causes of noise pollution include loud music during social, political, and religious programs, construction work, and factory noise.

It may cause hypertension, disrupt sleep, and/or hinder cognitive development in children. The effects of excessive noise could be so severe that either there is a permanent loss of hearing and memory or a psychiatric disorder. Besides, World Health Organization identified many other adverse effects of long exposure to moderate-level noise or sudden exposure to excessive noise. Due to the environmentalist 17th International Congress on Sound and Vibration (ICSV17), Cairo, Egypt, 18-22 July 2010 movements in different countries, some remarkable initiatives have been taken to check the noise level. For example, the USA has established sites where human-caused noise pollution is not tolerated. Similarly, the European Union prepared 'noise maps' of big cities. The laws of the Netherlands do not permit the construction of houses in areas where 24-hour average noise levels exceed 50dB. In Great Britain and India, the Noise Act empowers the local authorities to confiscate noisy equipment and take legal action against people who create excessive noise at night. Several countries are also investing in newer technology, which can curtail noise pollution. It is reported that most of the dwellers of Dhaka city are not aware of the ill effects of noise pollution. They even do not consider noise a pollutant and take it as a part of routine life. The environmentalist movements here are also not much serious about noise pollution. However, it has been recognized as a pollutant in some recent studies. In Bangladesh, a set of guidelines for regulation and control of noise and for establishing 'silent zones' around educational and medical institutions has been formulated in Bangladesh Environment Conservation Act, of 1995. Bangladesh High Court gave a ruling on 27 March 2002 banning hydraulic and all sorts of excessively noisy horns in vehicles. In a gazette notification in 2006, the ministry of environment and forest affairs empowered the authorities to confiscate noisy equipment or vehicle and fine people guilty of causing noise pollution.

Maximum noise levels in different areas

| Areas | Maximum noise level (dB) |
|---|---|
| Sensitive areas (Education, Hospital, Mosque) | 40-50 |
| Residential Zones | 45-55 |
| Mixed areas | 60-70 |
| Commercial areas | 65-70 |
| Industrial areas | 70-75 |

*Source: Bangladesh Noise Pollution (Control) Rules, 2006.*

**Measured Noise Levels in Some Sensitive Areas of Dhaka**

| Location ( Inside the facility) | Measured noise level average (dB) | |
|---|---|---|
| | Morning | Afternoon |
| Eden Mohila College | 69 | 67 |
| Udayan School | 57 | 55 |
| Willes Little Flower School and College | 66 | 69 |
| Motijheel Ideal School and College | 77 | 72 |
| Curzon Hall ( Dhaka University) | 87 | 77 |
| Dhaka medical college hospital | 89 | 91 |
| Bangabandhu Sheikh Mojib Medical College Hospital | 90 | 95 |
| Ever care Hospital | 55 | 53 |
| Ramna park | 57 | 54 |

*Source: Field survey, 2022*

According to table, it can be observed that the sensitive areas have a maximum sound level of 95 dB in Bangabandhu Sheikh Mojib Medical College Hospital followed by Dhaka medical college hospital, Curzon Hall (Dhaka University), Motijheel Ideal School and College, Willes Little Flower School and College, Eden Mohila College, Udayan School, Ever care Hospital, Ramna park. A significantly high amount can cause health issues such as hearing and sleeping problems, and cardiovascular problems/ heart problems.

**Effects of noise pollution on Traffic police, Driver**

| Sex | Traffic police | | | Driver | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, Yrs. | Below 30 | 30-40 | 40-50 | Below 30 | 30-40 | 40-50 |
| Respondent (total) 297 | 25 | 73 | 52 | 35 | 77 | 35 |
| Loses of attention and performance | 10 (40%) | 23 (32%) | 7 (13%) | 14 (40%) | 23 (29%) | 8 (23%) |
| Insomnia. Stress-related illness | 3 (12%) | 11 (15%) | 15 (29%) | 7 (20%) | 11 (14%) | 5 (14%) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High blood pressure | 2 (8%) | 12 (16%) | 10 (19%) | 3 (8%) | 16 (21%) | 7 (20%) |
| Hearing and Sleeping disturbance | 6 (24%) | 17 (23%) | 7 (13%) | 8 (23%) | 19 (25%) | 8 (23%) |
| Annoyance and Aggression | 3 (12%) | 7 (10%) | 8 (16%) | 2 (6%) | 6 (8%) | 3 (8%) |
| Cardiovascular problems/ Heart problems | 1 (4%) | 3 (4%) | 5 (10%) | 1(3%) | 2(3%) | 4 (12%) |

*Source: Field survey, 2022*

The World Health Organization (WHO) has documented seven categories of adverse health effects of noise pollution on humans which are: hearing loss, interference in speech communication, sleep disturbance, cardiovascular and physiological effects, mental health disturbance, impaired task performance, negative social behavior and, annoyance. These are grouped into 6 groups as shown in these Tables. The respondents are asked to choose the kind of problem he/she is facing due to noise pollution. The identified most dominant problems caused by noise pollution are loss of attention and performance in studz or job and bad temper/annoyance, hearing, and sleeping disturbance. Both are, in fact, interrelated. It is difficult for a disturbed mind to concentrate on a job and perform properly.

Significantly, among the Traffic police, Drivers interviewed, almost all of both said that hearing loss, interference in speech communication, sleep disturbance, mental health disturbance, negative social behavior and annoyance. They face a family crisis. About 9% of traffic police are at risk of permanent hearing loss, while 20% are suffering from temporary hearing problems due to acute noise pollution. About 10 % of drivers are at risk of permanent hearing loss, 17% are suffering from temporary hearing problems, 7% high blood pressure due to acute noise

The survey indicates that the noise pollution level is perceived to be high all day long and the principal source of noise pollution is vehicle horns. It also reveals that noise results in reduced efficiency and causes annoyance or bad temper, interference in speech communication, sleeplessness, etc. Nowadays people are becoming more aware of noise pollution's bad impacts and the significance of noise pollution control. However, this much awareness is not enough to make them proactive in taking steps to abate the problem.

**Recommendations**

* Make a conscious effort, and/or instruct your drivers, to honk as little as possible. *Work with others in your neighborhood (home/ office) to control noise pollution. Post a sign banning honking, and ask those who work outside to help enforce it. If a special source of noise is present-such as a shop selling music, or a brick-breaking machine –approach the owner as a group, and demand that the noise be reduced. *Ban industrial activity in urban areas. This would have a double benefit: reduce both noise and air pollution.*Visit neighborhood schools, and give the teachers and students leaflets about noise pollution and the need to reduce it.*Work with media, or personally write a letter or article, about noise pollution. Stress the damages it causes, the need to reduce it through our own actions, and the importance of having strong noise pollution laws, to make Dhaka a more livable city.*Try to get a local camera or cable TV station to air ads for free or with minimal cost, on the importance of action to reduce noise pollution.

Writer: (Ph.D. in Air Quality in Bangladesh), Assistant Prof., Department of Geography & Environment, Eden Mohila College, Dhaka.

# গুজব যখন হাতিয়ার

## নাসরীন মুস্তাফা

এখন যার ইন্টারনেট সংযোগ আছে, সে চাইলেই সত্য-মিথ্যা যা কিছু গল্পকে সত্যের মতো করে ছড়িয়ে দিতে পারে। তথ্য পাওয়ার অধিকার সব নাগরিকের। অবশ্যই তা সঠিক ও সত্য তথ্য। মিথ্যে ও ভুয়া তথ্য ছড়ানো কখনোই নাগরিক অধিকার হতে পারে না। এতে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নাগরিকের আস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলা হয়। মানুষ ভরসা করতে ভয় পায়। এতে ব্যক্তি পর্যায়ে সামাজিক ও মানসিক ক্ষতি যেমন বাড়ে, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃহত্তর অর্থে।

বিভিন্ন দেশের নির্বাচন সামনে রেখে ফেসবুক, টিকটক ও টুইটারের মতো নানারকমের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে দেওয়ার প্রমাণ মিলেছে মজিলা ফাউন্ডেশন পরিচালিত এক জরিপে। উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যে ও ভুয়া তথ্য ব্যবহার করে এসব গুজব ছড়ানো হয়েছে। এ বছরের ৯ আগস্ট কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময়ে ও পরে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তথ্য লুকিয়ে, মিথ্যে ও ভুয়া তথ্য দিয়ে গুজব ছড়ানোর প্রচুর প্রমাণ উল্লেখ করে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হয়েছিল, আরও কত ভয়াবহ হতে পারত, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। মে মাস থেকে শুরু হয়েছিল গুজব তৈরির সর্বাত্মক চেষ্টা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ছেড়ে, ভুয়া জরিপভিত্তিক ভুয়া নিউজ সাইট খুলে ব্যক্তিবিশেষ এবং গ্রুপ গুজব সৃষ্টি করেছে। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এলগরিদম ভুয়া ও মিথ্যে তথ্যকে বহুগুণে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছে।

৯ আগস্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর রাষ্ট্রপতি, জাতীয় ও কাউন্টি প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য কেনিয়ার নির্বাচন কমিশন ছয় দিন সময় নিয়েছিল ভোট গণনা, যাচাই বাছাই ও ভোটের ফলাফল ঘোষণার জন্য। প্রথমবারের মতো কমিশন সর্বসাধারণের প্রবেশযোগ্য অনলাইন পোর্টাল চালু করেছিল, যেখান থেকে জনগণ ভোট গণনা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে। এই সময়ে পাল্লা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'বুনো জানোয়ার' হেরে যাওয়ার, 'বীর যোদ্ধা' জয়লাভ করার ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ে ভোটারদের অস্থির করে তুলেছিল। এই মাত্র নাইরোবিতে সেনাবাহিনী নেমেছে জাতীয় মিথ্যে খবর প্রচার করে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল। নির্বাচন কমিশন কোনো একজন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য ভোটের ফলাফল কারচুপি করছে, এই অসত্য তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা হয়েছে।

কেনিয়ার নির্বাচনের সব পক্ষের প্রার্থীরা নিজের পছন্দ বা মতের সাথে মিললেই তথ্য ও খবর শেয়ার করছিলেন, যার বেশিরভাগই মিথ্যে তথ্য। এর অর্থ পছন্দ

হলে যাচাই না করেই গুজব ছড়িয়ে দিতে সব পক্ষই সমানভাবে আগ্রহী। রাষ্ট্রপতি উহুরু কেনিয়াত্তা দুই দফায় দায়িত্ব পালন করেছেন বলে প্রার্থী হতে পারলেন না। উপরাষ্ট্রপতি উইলিয়াম রুটো প্রার্থী হলেন, বিপক্ষে ছিলেন রায়লা ওডিঙ্গা। বিবিসি নিউজ স্টোরির ভাষ্যে এরকম একটি টিকটক ভিডিও এল বাজারে যে আমেরিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা জনাব রুটোর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়- বাক্য অশুদ্ধ, বারাক ওবামার মুখাবয়ব অস্বাভাবিক, বিবিসি স্টুডিও'র ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যানারের সাথে ভিডিওতে দেখানো ব্যানারের রং মিলছে না। পুরোপুরি গুজব ছিল এটি। ২০১৮ সালে ওয়াশিংটনে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে বারাক ওবামা ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই খবরের ভিডিওকে মনমতো ব্যবহার করেছে গুজবসৃষ্টিকারী ব্যক্তি অথবা গ্রুপ। আবার উইলিয়াম রুটোর বিরুদ্ধ পক্ষ পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর এনে দিল যে, রুটোর এইচআইভি পরীক্ষার পয়সা দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি কেনিয়াত্তা। জনাব রুটো সত্যি সত্যি এইচআইভি পজিটিভ কি না, খবরে তার উত্তর না মিললেও গুজব কিন্তু তৈরি হয়ে গেল।

মজিলা ফাউন্ডেশনের সম্মানিত ফেলো ওডাঙ্গা মাদুং গবেষণা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি চীনের ভিডিও প্ল্যাটফর্ম টিকটক-কে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে রাজনৈতিক তথ্যের বিকৃত রূপকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম বলে উল্লেখ করেছেন। এই বিকৃতি এতটাই ভয়ংকর, জয়লাভ করলেও উইলিয়াম রুটো যাতে ক্ষমতা নিতে না পারেন সেজন্য সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়েছে বলে ছবি দিয়ে খবর প্রচার করা হয়, যদিও এরকম কোনো পিটিশন আদৌ করা হয়নি। জনগণ কিন্তু পিটিশন করা হয়েছে, এই খবরেই মেতে উঠেছিল। কেনিয়াতে ঘটলেও মজিলা ফাউন্ডেশন মনে করছে, ঘটনাটি সব দেশের জন্যই চিন্তার বিষয়। রয়টার কেনিয়ার জনগণের উপর একটি জরিপ করে দেখেছে, শতকরা ৭৫ ভাগ কেনিয়ান অনলাইনে সত্য ও মিথ্যে খবরের মাঝে পার্থক্য ধরতে অক্ষম। বাংলাদেশের কত জন সত্য ও মিথ্যে তথ্যের পার্থক্য বুঝতে পারেন এবং বোঝাটা জরুরি বলে ভাবেন? গুজব বিষয়ে সচেতনতার অভাব কেনিয়াতে আছে, আমাদেরও যে আছে তা বুঝতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। যত দ্রুত যে কোনো তথ্য ছড়িয়ে পড়ে, সেরকম দ্রুততার সাথে ফ্যাক্ট চেকিং করা হয় না বলে সময়ের দৌড়ে গুজব প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়, লাভবান হয় গুজবসৃষ্টিকারী পক্ষ। গুজবের জন্য মিথ্যে ও ভুয়া খবর তৈরির পরিমাণও বেশি, সে তুলনায় সত্য খবর কম। কেনিয়ার নির্বাচনের আগের সপ্তাহে দশ মিলিয়ন ভুয়া পোস্ট, খবর, ভিডিও, বিজ্ঞাপন ছড়ানো হলেও সত্য খবর ছিল মাত্র কয়েক শ'! নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্যের খন্ডিত, কখনো বিকৃত, কখনো পুরো মিথ্যে বক্তব্যের স্ক্রিনশটকে কাজে লাগিয়ে গুজব তৈরি করার হিড়িক পড়েছিল। তদন্তে জানা গেছে, এরকম বক্তব্য তারা আদৌ দেননি। কিন্তু সেই সত্য জানতে তো সময় লেগেছে। এর মধ্যে ভোটারদের প্রভাবিত করা সম্ভব হয়েছে,

জনগণকে বিভ্রান্ত করা গেছে, অপেক্ষাকৃত তরুণ-অশিক্ষিত-বিভ্রান্ত অংশ পরিকল্পনা মাফিক উত্তেজিত হয়েছে। পুলিশের গুলিতে ১০০ জন মানুষ মারা গেছে বলে তথ্য ছড়িয়ে পড়লেও নির্বাচন কমিশনের হিসেবে এই সংখ্যা ২৪। গুজব ছড়িয়ে একটি মানুষেরও মৃত্যু হলে এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হতে পারে?

গুজবসৃষ্টিকারী পক্ষের চাওয়া কিন্তু সহিংসতা, মানুষের মাঝে বিভেদ তৈরি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বেতার-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের খবরকে প্রচার করে এর বিস্তৃতি আরও ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রাখছে। আবার মূলধারার মিডিয়া জনগণের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সঠিক তথ্য প্রচার করতে পারছে না বলে অস্থির হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে তথ্য জানতে চাইছে সাধারণ মানুষ। মূলধারার মিডিয়া সব সময় সত্যি বলছে, এই ধারণাতেও ফাটল ধরেছে নানা কারণে। সাধারণ মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার এখন সত্যিই বড়ো বিপদে আছে। কেনিয়ার কথা বাদ দিন। ২০১৬ সালে ইউরোপিয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসতে বৃটেনকে প্রভাবিত করেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া নানা গুজব, যাতে লাভবান হয়েছিল রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক সুযোগসন্ধানী পক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পকে জিতিয়ে দিতে একই রকম ঘটনা ঘটলেও এসব নিয়ে খোলাখুলি আলোচনায় বসেনি সব পক্ষ। গুজব ছড়িয়ে একটি দেশের নির্বাচনের ফলাফল বদলে দেওয়া যায় কিংবা সুযোগসন্ধানীদের স্বার্থসিদ্ধি হয়, এমন তথ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে বলে গুজবসৃষ্টিতে উৎসাহী পক্ষের দাপট দিনকে দিন বাড়ছে বিশ্বের সব দেশেই। বিশেষ করে যেসব দেশের জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষায় সচেতন নয়, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে জনগণের মতামতকে পরিচালিত করতে চায়, স্বার্থসন্ধানী ব্যবসায়ী-পেশাজীবী-আমলাদের সুযোগ নেওয়ার ধান্দা থাকে, সেসব দেশে গুজবের চাষাবাদে ফলন হয় ভালো। করোনা অতিমারিতে বিপর্যস্ত ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের মানসিক স্বাস্থ্য, অর্থনেতিক অবস্থা পরবর্তীতে যখন রাশিয়া-ইউক্রেনের মাধ্যমে ঘটিয়ে দেওয়া বিশ্ব মোড়লদের স্বার্থসিদ্ধির যুদ্ধে আরও বিপর্যস্ত হতে থাকল, তখন মিথ্যে ও ভুয়া তথ্যের উদ্দেশ্যমুলক ব্যবহারের আগ্রহ যেন আরও বেড়ে গেছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, গুজব সৃষ্টিতে এখন মোটা অংকের অর্থের লেনদেন চলছে যা জনগণের কোনো কাজে আসছে না। কেনিয়াতে গুজব সৃষ্টির কাজটি স্পেনভিত্তিক ডানপন্থি সংগঠন সিটিজেনগো নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে অভিযোগ ওঠার পর এক দেশে অবস্থান করে আরেক দেশের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অপচেষ্টা ডিজিটাল মাধ্যম সম্বন্ধে ভীতিই তৈরি করছে। ডিজিটাল মাধ্যমের সুফল নয় বরং এর কুফল জনগণের বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থাকে আরও সঙ্গিন করে তুলছে। সমস্যা কাটিয়ে ওঠার ইতিবাচক চিন্তাকে গ্রহণ না করার পরোক্ষ তাড়না তৈরি করছে এমনভাবে যেন সমস্যাকে ভয়াবহ আকারে সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারাটাই আসল

কাজ, সমাধানের জন্য কোনো চেষ্টার দরকার নেই। জনগণের মাঝে স্পষ্টতঃ বিভক্তি তৈরি হচ্ছে। হতাশা চর্চাকারী আরেকজন হতাশাবাদীকেই বন্ধু মনে করছে, এর অন্যথা হলে ভাষার ব্যবহার কদর্য পর্যায়ে নিতেও আপত্তি নেই। সুযোগ পেলে মাঠেও নেমে যায় এরকম বন্ধুর দল। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকার কংগ্রেস ভবনে হামলা কিংবা কিছুদিন আগে শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি ভবনে হামলা করতে যারা ছুটে গিয়েছিল, তারা কি সমাধানের খোঁজে গিয়েছিল? জনগণকে ম্যাংগো পিপল বলার দিন কবে শেষ হবে? সাধারণ মানুষকে কেন পুতুলের মতো নাচাবে অদৃশ্য হাত?

সহিংস ঘটনা ঘটাতে জনগণকে উস্কে দিতে গুজবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অবসান হোক।

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর।

# পরিবেশ ও সুরক্ষা

## মো. মাসুদুর রহমান

শিল্পবিপ্লবের কারণে মানুষের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনযাত্রারও পরিবর্তন ঘটছে। বিভিন্ন কলকারখানা তৈরি হচ্ছে। এসব কলকারখানা শুধু মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, তা কিন্তু নয়। পাশাপাশি এসব কলকারখানা থেকে নানারকম বর্জ্য মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। একটি দেশের মানুষের স্বাস্থ্য, গড় আয়ুসহ অনেক কিছুই নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। তাই পরিবেশকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের একদিকে যেমন শিল্পবিপ্লবের সুবিধা নিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠা শিল্পকে গ্রহণ করতে হবে ঠিক তেমনি সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তা না হলে পরিবেশ তার প্রাকৃতিক নিয়মেই আমাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম একটি উদ্যোগ হলো পরিবেশ সুরক্ষা। পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে বেশি উপযোগী ও সাশ্রয়ী হলো ব্যপকভাবে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে বনায়ন করা। এজন্য শুধু গাছ লাগালেই হবে না,গাছ যাতে টিকে থাকে সে জন্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দেশকে আরও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে সবুজ বনায়ন ছাড়া কোনো উপায় নেই। তাই দেশবাসীকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে এবং পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে নাজুক অবস্থানে থেকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নানা উদ্যোগের কারণে পরিবেশ রক্ষায় অনেক ইতিবাচক কাজ অতীতে হয়েছে এবং হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসকল ইতিবাচক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। 'পলিসি লিডারশিপ' ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ এ পুরস্কার। এরও আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে ইউনেস্কো শান্তিবৃক্ষ পুরস্কার পান। এসব পুরস্কার পরিবেশ রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর কাজের স্বীকৃতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সত্তর এর দশকের শুরু থেকেই পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। তখন থেকেই বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো পরিবেশ রক্ষায় জনগণকে সচেতন এবং ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সবসময় চাপ প্রয়োগ করে আসছে।

১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম কনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গঠন ও জাতীয় পরিবেশ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রজিলের রিও-ডি- জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবিলায় অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে ধরা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে, কিয়োটো প্রটোকল সম্পাদিত হয়। এ প্রটোকলের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড ও গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণকারী বিশ্বের প্রথম দশটি দেশ হলো চীন(২৩.৯২%), যুক্তরাষ্ট্র(১১. ৮৪%), ইউরোপ(৬.৮৪%), ভারত(৬.৮১%), রাশিয়া (৪.০৭%), জাপান (২.৯০%), ব্রাজিল(২.৩৬%), ইন্দোনেশিয়া (১.৬৯%), ইরান (১.৫৯%), ও দক্ষিণ কোরিয়া (১.৫৬%)। এই দেশগুলো থেকে বিশ্বের গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের ৬৫ শতাংশ হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ ২০১৮ সালে বৈশ্বিক গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ছিল ৪৮ হাজার ৯৩৯.৭১ মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড।

সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস প্লান্ট, এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মতো পরিবেশবান্ধব খাতের উন্নয়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব খাতের জন্য ২ শত কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে। পরবর্তী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০২০ সালে তহবিলটি বৃদ্ধি করে ৪ শত কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে মোট ৮ টি পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট,গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি, ভার্মি কম্পোস্ট, সোলার হোম সিস্টেম, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট, সোলার মিনি গ্রিড,জ্বালানি অদক্ষ সামগ্রী প্রতিস্থাপন এবং কারখানা কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সর্বমোট ৫৩.৪০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ এবং যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও ক্রমশ বাড়ছে। মানব স্বাস্থ্যের ওপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন,যানবাহন ও কলকারখানাসৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর অবৈধ পরিবেশ দূষণকারী ইটভাটার বিরুদ্ধে বিগত জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে মোট ১ হাজার ৪৪২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২ হাজার ৩৬০ টি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এবং জরিমানা আরোপপূর্বক ৫৬ কোটি ২৩ লাখ ৮১ হাজার ৪ শত টাকা আদায় করেছে। এছাড়াও ৭৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদানসহ ৭৬১ টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙে ফেলেছে। বিগত জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী

যানবাহনের বিরুদ্ধে ৮৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৫৮৮ টি মামলা দায়ের করেছে এবং ১৬ লাখ টাকারও বেশি জরিমানা আদায় করেছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা,শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা,বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করে থাকে। ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত কম-বেশি ৬৫ হাজার শিল্প কলকারখানার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং কম বেশি ১ লাখ ১০ হাজার শিল্প কলকারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়েছে। পানি দূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প কলকারখানাকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অব্যাহত থাকায় অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প কলকারখানায় ইতোমধ্যে ইটিপি স্থাপন করেছে। ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ইটিপি স্থাপনযোগ্য ২ হাজার ৬৭৮ টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ২ হাজার ২৪৯ টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। তরল বর্জ্য নির্মাণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার আওতায় শিল্প কলকারখানায় উৎপন্ন তরল বর্জ্য প্রকৃতিতে নির্গমন না করে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৪ থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর মোট ৬ শত তরল বর্জ্য নির্মাণকারী শিল্প কলকারখানার অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন দিয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর অন্যান্য অভীষ্টের ন্যায় পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নভেম্বর ২২ এ গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনের ( কপ-২৬) লিডার সামিটে দেওয়া জাতীয় বিবৃতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ সুরক্ষায় চার দফা দাবি তুলে ধরে বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের নৈতিক কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছেন। বাংলাদেশের স্বপ্নবাজ মানুষ কখনোই হারেনি। আমাদের পরিবেশ আমাদের নিজের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ রাখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সোনার বাংলা সবুজ করার যে প্রচেষ্ঠা তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষকে। তবেই রক্ষিত হবে আমাদের পরিবেশ এবং আমরা আবারও প্রমাণ করতে পারব আমরাই বিশ্বের কাছে রোল মডেল।

লেখক : পরিবেশবিদ।

# রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম

## এম এ খালেক

করোনা অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট নানা সঙ্কট সত্ত্বেও বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ঊর্ধ্বমুখি প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (২০২১-২০২২) বাংলাদেশের রপ্তানি আয় প্রথমবারের মতো পঞ্চাশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করেছে। জুলাই-জুন,২০২২ সময়ে বাংলাদেশ পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে মোট ৫২দশমিক ০৮ বিলিয়ন (৫ হাজার ২০৮ কোটি) মার্কিন ডলার আয় করেছে। আগের অর্থবছরের তুলনায় রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩৫ দশমিক ১৪শতাংশ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি করে মোট আয় করেছিল ৩ হাজার ৮৭৬ কোটি মার্কিন ডলার। করোনার কারণে গত অর্থবছরে রপ্তানি আয় কিছুটা কমে গিয়েছিল। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছিল ৪ হাজার ৫৪ কোটি মার্কিন ডলার। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে বাংলাদেশ যে রপ্তানি আয় করেছে তা ইতোপূর্বেকার রপ্তানি আয়ের ধারাবাহিক সাফল্যকে অতিক্রম করে গেছে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি আয় একযোগে ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। বরাবরের মতোই বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক খাত তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এই খাতে আয় হয়েছে ৪ হাজার ২৬১ কোটি মার্কিন ডলার। তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয়ের এই সাফল্যে উদ্বৃদ্ধ হয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সংস্থাটি ২০৩০ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) মার্কিন ডলার। অর্থাৎ আগামী নয় বছরের মধ্যে ৫ হাজার ৭৮৪ কোটি মার্কিন ডলার অতিরিক্ত আয় করা হবে তৈরি পোশাক খাত থেকে।

পণ্য রপ্তানি আয়ের এই অভূতপূর্ব সাফল্য সামগ্রিক অর্থনীতির সচলতারই পরিচয় বহন করে। করোনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বাভাবিক গতিতেই পরিচালিত হচ্ছে। রপ্তানি আয়ের একটি সাফল্য অনেকের নিকটই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন হলো, বিশ্বব্যাপী যেখানে অর্থনৈতিক মন্দার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ কীভাবে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এই সাফল্য অর্জন করেছে? বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের এই সাফল্যের পেছনে অন্যতম

নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে রপ্তানি পণ্য তালিকার বহুমুখীকরণের প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি বড়ো প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে সীমিত সংখ্যক পণ্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। এবং যেসব পণ্য রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে রয়েছে তাদের বেশির ভাগই আমদানিকৃত কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজ নির্ভর। ফলে এসব পণ্য রপ্তানি করে যে আয় হয় তার একটি বড়ো অংশই কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি বাবদ দেশের বাইরে চলে যায়। এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য সরকার রপ্তানি পণ্য তালিকা বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর পণ্যগুলোর রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্য প্রায় শতভাগ স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর। ফলে এসব পণ্য থেকে যে অর্থ আয় হয় তার প্রায় পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। আগামীতে সম্ভাবনাময় অথচ স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর অপ্রচলিত পণ্য বেশি করে রপ্তানি পণ্য তালিকায় স্থান দেবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

করোনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি ব্যাপক মাত্রায় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালি অর্থনীতিও ৯ দশমিক ১ শতাংশ মূল্যস্ফীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। বিগত ৪০ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এত উচ্চমাত্রায় মূল্যস্ফীতির আর কখনোই সৃষ্টি হয়নি। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ আশঙ্কাজনকভাবে কমতে শুরু করেছে। এটা হচ্ছে মূলত উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতির কারণে। কয়েকদিন আগে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্বল্পতার কারণে অন্তত ১৭টি দেশ মারাত্মক সঙ্কটে পতিত হয়েছে। এসব দেশ যে কোনো মুহূর্তে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশকে এই তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কিছু কম। এই পরিমাণ রিজার্ভ দিয়ে দেশের পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। একটি দেশের তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থাকলেই তাকে স্বস্তিদায়ক বলে মনে করা হয়। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কমে যাবার কারণে দেশগুলো তাদের আমদানি ব্যয় সংকুচিত করতে বাধ্য হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সব ধরনের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলে জনগণের ভোগ প্রবণতা এবং ভোগ ব্যয়ের সামর্থ্য সাংঘাতিকভাবে কমে গেছে। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের উপস্থিতি কমাতে বাধ্য হচ্ছেন। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হ্রাসের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে দেশগুলো বাইরে থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভোক্তাদের এই

আচরণ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য 'শাপে বর' হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড়ো অংশ জুড়ে আছে তৈরি পোশাক। আন্তর্জাতিক বাজারে ভোক্তাগণ এখন উন্নতমানের উচ্চ মূল্যের তৈরি পোশাক ক্রয় কমিয়ে দিয়েছেন। তারা বাধ্য হচ্ছেন তুলনামূলক কম মূল্যের তৈরি পোশাক ক্রয় করে তাদের চাহিদা মেটাতে। ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল ২০০৭-২০০৮ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সৃষ্ট মন্দার কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য তেমন এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কারণ বাংলাদেশ তুলনামূলক কম মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এবারও ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে সেই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সরকার রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে সীমিত সংখ্যক দেশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। বাংলাদেশ অন্তত ১৭৫টি দেশে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা(জেনারালাইডজ সিস্টেম অব প্রেফারেন্স) দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের কোনো শুল্ক প্রদান করতে হয় না। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকগণ ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিপুল পরিমাণে পণ্য রপ্তানি করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ যে বিপুল পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে তার প্রায় ৫৫ শতাংশই যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তীর্ণ হবে। এটা হবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো অর্জন।

কিন্তু বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার পর আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে জিএসপি সুবিধা পাবে। তারপর বাংলাদেশের পণ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশ করতে হলে নির্ধারিত হারে শুল্ক দিতে হবে। বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা আরও প্রায় এক দশক বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে নতুন নতুন রপ্তানি গন্তব্য অনুসন্ধান করছে। বেশ কিছু নতুন দেশ ও অঞ্চলে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি শুরু করেছে। এমন কী রাশিয়া এবং ইউক্রেনে বাংলাদেশ বর্ধিত হারে পণ্য রপ্তানি শুরু করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের কারণে তা বর্তমানে কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বাংলাদেশ জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারত ইত্যাদি দেশে বর্ধিত হারে পণ্য

রপ্তানির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'লুক ইস্ট' নীতির আওতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। রপ্তানি ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করে বাংলাদেশ আগামীতে তার রপ্তানি সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা ১২ থেকে ২৬টিতে উন্নীত করেছে। এছাড়া ১২৩টি পণ্যের আমদানি শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। ফলে আগামীতে অভ্যন্তরীণ এসব পণ্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা জোরদার হবে। অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের প্রতি মনোনিবেশ করা হলে উৎপাদন নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাবে। আর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সেই পণ্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে।

দেশের বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলে দেশের পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লব সূচিত হবে। গত ২৫ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্নের পদ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। এতে রাজধানীর সঙ্গে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ২১টি জেলার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আগামীতে এই জেলাগুলোতে উৎপাদিত পণ্য আমাদের রপ্তানি পণ্য তালিকাকে আরও সমৃদ্ধ করবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড়ো পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করায় উৎপাদকগণ নিশ্চিতভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেন। আগামীতে আমাদের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সেই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আমাদের এখনই কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে তাদের নিকট থেকে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক।

# চা- শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা

## সেলিম মাসুদ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর একটি জনপ্রিয় স্লোগান হলো ' কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না ' । সকলকে নিয়েই সবার জন্য টেকসই উন্নয়ন। চা বাগানের অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তারা এখনো সমাজের মূল ধারা থেকে অনেক পিছিয়ে, এখানে দারিদ্র্যের হারও অনেক বেশি। চা শ্রমিকরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গর্ভবতী নারীর সেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তাসহ প্রায় সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে। এ খাতে কর্মরত শ্রমিক কম-বেশি পনে তিন লক্ষ। এ সব শ্রমিকের বেশির ভাগই নারী শ্রমিক। এসব নারী চা শ্রমিকরা বংশ পরম্পরায় এ খাতে কাজ করে থাকে।

চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নবম,প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন এবং ভারত। বাংলাদেশে নিবন্ধিত চা বাগান ও টি স্টেট রয়েছে ১৬৭ টি, এর মধ্যে সিলেট বিভাগে রয়েছে ১২৯ টি। চা বাগান করতে গেলে ন্যূনতম ২৫ একর জমি লাগে। সে হিসেবে ৪ হাজার একরেরও বেশি নিবন্ধিত জমিতে চা চাষ হচ্ছে। তবে অনিবন্ধিত ক্ষুদ্র পরিসরের বাগান এর দ্বিগুণেরও বেশি। ২০২১ সালে দেশে মোট চা উৎপাদন হয়েছে ৯ কোটি ৬৫ লাখ কেজি। চা এর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চা এর চাহিদা প্রায় ১০ কোটি কেজি। আমাদের দেশিয় উৎপাদন থেকে চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ হয়না, কিছুটা ঘাটতি থাকে, তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। দুই দশক আগেও বাংলাদেশ থেকে কম বেশি এক কোটি ৩০ লাখ কেজি চা রপ্তানি হতো। আর এখন সেখানে খুবই সীমিত আকারে ৬ লাখ থেকে ২০ লাখ কেজি রপ্তানি করা হয়। কারণ আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতি রয়েছে। তাই ২০২৫ সাল নাগাদ সরকার চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ১৪ কোটি কেজি। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার ইতোমধ্যে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের চা চাষিদের 'ক্যামেলিয়া খোলা আবাশ স্কুলে'র মাধ্যমে চা আবাদ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিতকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে সমতলে চা বাগান ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের চা উৎপাদন ২০২০ এর থেকে ২০২১ সালে ৪১ শতাংশ বেশি হয়েছে, যা এ খাতের জন্য আশাব্যাঞ্জক। সত্তর দশকে প্রতি হেক্টর জমিতে ৭৫০ কেজির মতো চা উৎপাদন হতো। আধুনিক প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে চা উৎপাদনের ফলে এখন জমি ভেদে প্রতি একরে কম বেশি ১ হাজার ৫ শত থেকে ৩ হাজার ৫ শত কেজি চা উৎপাদন হচ্ছে। চা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হলো প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উঁচু জমি। যেন প্রচুর বৃষ্টি হলেও দ্রুত পানি নিষ্কাশন হয়ে যায়।

নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এ ছয় মাস হলো শুষ্ক মৌসুম, এসময় চা এর ফলন ঠিক রাখতে খরা সহিষ্ণু চা এর দুইটি জাত উদ্ভাবন করছে আমাদের চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিরা। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয়গুলোর একটি হলো চা। চা পান সর্বপ্রথম শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ চীনে। পৃথিবীতে যত ধরনের চা উৎপাদন হয় তার সবই তৈরি হয় ক্যামেলিয়া সিনেসিস থেকে। এই চির হরিৎ গুল্ম বা ছোটো গাছ থেকে পাতা এবং এর কুঁড়ি সংগ্রহ করে তা চা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের চা এর মধ্যে উদ্ভিদের ধরনের এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে ভিন্নতা রয়েছে।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের আসাম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রথম চা চাষ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর তীরে চা আবাদের জন্য ১৮২৮ সালে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেখানে চা চাষ শুরু করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা কুন্ডদের বাগান নামে পরিচিত। তারপর ১৮৫৪ সালে মতান্তরে ১৮৪৭ সালে বর্তমান সিলেট শহরের এয়ারপোর্ট রোড়ের কাছে মালিনীছড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠা হয়। মূলত মালিনীছড়া চা-বাগানই বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান। দেশ স্বাধীনের পূর্বে বাংলাদেশে মূলত দুইটি জেলায় চা বাগান ছিল। এর একটি সিলেট জেলায়, যা সুরমা ভ্যালি এবং অপরটি চট্টগ্রাম জেলায় যা হালদা ভ্যালি নামে পরিচিত ছিল।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটা বড়ো চা উৎপাদনকারী দেশ। চা শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্বের বড়ো দশটি চা বাগান আছে আমাদের দেশে। চা শিল্পের সাথে জড়িত অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং হচ্ছেন। পাশাপাশি একশ্রেণির দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু চা বাগানের দরিদ্র শ্রমিকদের বছরের পর বছর তাদের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হচ্ছেনা। নারী প্রধান চা শ্রমিক পরিবারের দারিদ্র্যের হার খুব বেশি। চা শ্রমিকদের মধ্যে বাল্যবিবাহের হার খুব বেশি। যদিও সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও চা শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করতে নানারকম কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাল্যবিবাহের হার কিছুটা কমেছে। তবে তা কোনোভাবেই যথেষ্ঠ না। চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। একজন চা শ্রমিক দৈনিক ১২০ টাকা হারে মজুরি পান, এর সাথে রেশন পান। বাগানে সাধারণত একটি পরিবারের দুই তিনজন আয় করে। কিছু সীমিত চিকিৎসা সুবিধা, শিশুদের জন্য লেখাপড়াসহ আরও কিছু সুযোগ সুবিধা আছে। তবে বাগান ভেদে এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চা বাগানের মালিকরা স্থায়ী চা শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করেছে। ৬০ বছর বয়সে অবসরে যাওয়ার সময় তারা একটা এককালীন আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং ১৫০-২০০ টাকা

মতো সাপ্তাহিক ভাতা পেয়ে থাকেন। যিনি অবসরে যান তার শূন্য পদে পরিবারের সদস্যদের চাকরির ব্যবস্থাও করা হয়। চা শ্রমিকদের কম বেশি ৬০ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেশের প্রায় শতভাগ শিশু প্রাথমিকে ভর্তি হয়। চা বাগানগুলোতে ১৭০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়াও আছে এনজিওদের নানারকম শিক্ষা কর্মসূচি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক শিক্ষাভাতা চালু আছে, কিন্তু এনজিও স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন ভাতার ব্যবস্থা নেই। তবে চা বাগানের দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ইতোমধ্যে শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান কার্যক্রম। চা বাগানে ১৯৩৯ সাল থেকে মাতৃত্ব আইন চালু আছে। একজন গর্ভবতী নারী ৮ থেকে ১৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন সুবিধা পান। তাদের জন্য প্রশিক্ষিত মিডওয়াইভস, নার্স ও চিকিৎসক রয়েছে। তবে এ সুবিধা শুধু মাত্র নিবন্ধিত শ্রমিকদের জন্য। চা বাগানের অবস্থান প্রান্তিক অঞ্চলে হওয়ায় এ বাগানগুলোর আশেপাশের তেমন কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি। চা বাগানে বিশ্রামের জন্য কোন বিশ্রামাগার নেই, পানির ব্যবস্থা নেই। দূষণের কারণে সাধারণত কোন ফসলের পাশে শৌচাগার থাকে না। এজন্য চা বাগানের থেকে শৌচাগার দূরে রাখা হয়। এতে চা বাগানের নারী শ্রমিকদের জন্য সমস্যা হয়ে থাকে। চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকার ২০১৬ সালে চা শিল্পের জন্য একটি রোড়ম্যাপ করে যা ২০১৭ সালে অনুমোদন পায়। এখানে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উল্লেখ রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ৫০ হাজার চা শ্রমিককে সরকার প্রতিবছর এককালীন পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও সারা দেশের ন্যায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী, শিক্ষা উপবৃত্তি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী জীবনমান উন্নয়ন ভাতাসহ সকল সরকারি সুবিধা চা বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলো পেয়ে থাকে।

বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি এবং ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে চা শিল্পের উন্নয়ন এবং এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন অংশীজনের কল্যাণে চাহিদার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গর্ভবতী নারীদের সেবাসহ চা বাগানের দরিদ্র শ্রমিকদের জাতীয় গড় উন্নয়নের মূল ধারায় সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে। এসকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে বসবাস করবে,এটাই প্রত্যাশা।

লেখক : শিক্ষাবিদ।

# Padma Bridge and Fulfilling Vision-2041: Perspective Realizing SDGs

## Md. Jahangir Alam

Bangladesh is a riverine country and most of the public transport and business depends on rivers. Padma is one of the vital rivers to influence the country's economy as well as GDP. The Padma Multipurpose Bridge has significant impacts on the whole country that contributes to the socio-economic and industrial development on southern-west region Bangladesh. It has improved the connectivity of southern-west parts of the country with the capital. The bridge is very special as it has been built on a most complex river system which was a divide between the south-western region and the most important economic hubs of Bangladesh. The Padma Bridge changed the lives of nearly 30 million people living in the southwestern region of the country, promoted modern and commercial activities, and expanded economic and job opportunities. Bangladesh government has been rigorously working towards achieving the SDGs by 2030 and attaining middle-income status by 2031. It also attempts to be an economically developed, socially inclusive and environment-friendly country by the year 2041. The country has reached several milestones, among which the self-financed Padma Bridge is the most significant and thaus the self-financed Padma Bridge will contribute to fulfilling Vision-2041 as well as realizing SDGs.

Economists and policymakers claim communication system is called the pillar of economic development. In this aspect, definitely Padma bridge will play the dominant role in the overall economic development of the country. In fact, economic growth and development of a country depends upon a good transport and communication system and all economic activity recycle it. Due to Padma bridge, our economic activities especially agricultural product, raw materials and finished goods of industry will transfer easily and at the low-cost. comperatively, This bridge directly has connected the 21 districts of the southern part with Dhaka and its adjoining industrial towns like Narayanganj, Narsingdi and Gazipur. Direct connectivity with Dhaka will expand industrialization, trade and commerce and ease the supply of raw materials. Swift transportation will result in a quick return of investment and economic expansion.

Bangladesh steps into a new era of development as a communication's mega infrastructure, the Padma multiple bridge, becomes a reality undeterred by multiple headwinds. Our Prime Minister Sheikh Hasina

mentioned that the Padma bridge is not merely a structure of steel, cement and concrete, it is a symbol of the country's capability, pride and dignity. The Premier also mentioned that this bridge belongs to the people of Bangladesh and it encapsulates our passion, creativity, courage, endurance and perseverance. Bangladesh's foreign friends continue to congratulate Bangladesh on the completion of the Padma Bridge and appreciate its determination and courage under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.

To improve lives and livelihoods of the people, role of this bridge is very significant. The bridge will have its positive impact on achieving the UN's SDGs by 2030. According to the economists, the inauguration of the Padma bridge will reduce the overall poverty index in the country. They mentioned that once the communication and investment environment is improved with the Padma bridge, the poverty rate in this region would be reduced by 1.01 percent every year while the countrywide poverty rate would be reduced by 0.84 percent every year and thus, our people's income will increase. Experts also mentioned that around 1.04 percent of the country's total workforce would be employed while around 10 lakh new employments would be created in the next five years which would be triple after 10 years. Various structures would be built on both side of the Padma Bridge. As a result, there will be a lot of progress in the human development index. Alreadz, the collection of vehicle tolls contributed to our national growth. So far taka- has been collecht from Padma Bridge toll plaza.

The Padma Multipurpose Bridge is going to be a miracle or the world in many ways. It will be able to bring a radical change in the economic dznamics of the country. Economists said, the bridge wound junction on a 'game changer' of the country's economy. They cited that due to the improvement in regional and international communication connectivity, the GDP growth of the southern region would be increased by 2.3 percent every year while that in national level by 1.23 percent per year. Besides, there will be additional on percent GDP growth once the rail communication is launched at the bridge (BSS, 25th June 2022).

In several ways, the Padma bridge is one of the highest achievements of independent Bangladesh. The bridge has opened up huge possibilities in the tourism sector in Bangladesh. It will have significant positive impacts on the tourism industry, a sector which contributes about 4% to the GDP of Bangladesh. Since this Padma multipurpose bridge has improved the communication system between Dhaka to Kuakata, as a result, many tourists will visit Kuakata, Sunderban and its surrounding area very offen that  a strong communication network will be built. After

the inauguration of the Padma bridge, the number of then tourists in Kuakata and Sunderban, will be increased which is much less than that of the Cox's Bazar and then the potential of tourists Spots in southern parts.

The Padma Bridge is expected to save nearly two hours in travel time between Dhaka division and the south-west for cars and buses and from five to ten hours for trucks. The bridge also cuts the travel time between Dhaka and the Mongla Port as the distance will come down to an unbroken 170 Kilometres, lonly which is much shorter than the Dhaka-Chattogram Seaport distance of 264 Kilometres. It will encourage landlocked countries like Nepal and Bhutan to use these ports. The bridge will contribute to creating a multi-dimensional international road and rail transport network for the eastern region of the Indian Subcontinent. It will establish the missing link (Trans-Asian Highway and the Trans-Asian Railway). These are expected to transform Bangladesh into a regional hub for development, connectivity, trade and investment and thereby boosting its geopolitical value. The international road and rail transport network will promote our trans-border ties as well as cultural development of the eastern region of the Indian Subcontinent.

Over the past few years, economic progress, GDP growth, and the gradually improvement of various social indicators have gained international recognition. Of course, this bridge will reduce overall poverty and contribute to industrial development, regional trade, agricultural expansion, and connectivity. Setting up economic zones, industrial cities and high-tech parks have alreadz been initiated in the southern region. Gradually investment and employment will be increasing which will eventually develop the living standards of the people of the southern-west parts of the country. Foreign investors will be encouraged to invest in infrastructure and trade in Bangladesh. Therefore, the Padma Multipurpose Bridge will support Bangladesh towards achieving the SDGs by 2030, attaining middle-income status by 2031 and being a developed country by 2041.

The writer : Senior Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs.

# উন্নয়নে নারী শিক্ষা

## সেলিনা আক্তার

যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত- একথা আমরা সবাই জানি। এছাড়া, উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিতে নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা নেপোলিয়নের উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়- 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।' বিশ্ব নেপোলিয়নের এই উক্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই বর্তমানে নারী শিক্ষার হার বেড়েছে। কারণ, একজন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা। বৃহদার্থে সমাজ ও দেশকে উন্নত করা। তাই, জাতির কল্যাণ অগ্রগতিতে নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া , নারীরা পেছনে পড়ে থাকলে কোনো দেশই উন্নতি করতে পারবে না। নারী শিক্ষা ও উন্নয়ন পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। কেননা, প্রকৃত উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে হলে সমাজের সার্বিক কার্যক্রমে দেশের নারী জনশক্তির অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। পূর্বে নারী শিক্ষা গ্রহণকে অলাভজনকভাবে দেখা হতো। মেয়েদের লেখাপড়া করাতে খরচ হবে, বিয়ে দেওয়ারও খরচ আছে - এসবের জন্য পূর্বে কন্যা শিশুর শিক্ষার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু , কবি কাজী নজরুলের মত আমারও আজ বলতে ইচ্ছে করে- 'সে যুগ হয়েছে বাসি, যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী।' নারী মুক্তি ও নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য অবসান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ CEDAW সনদে স্বাক্ষর করেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) প্রণয়নে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মোট ১৭ টি অভিষ্ঠের মধ্যে ১১ টি অভীষ্ঠের ধারণা বাংলাদেশই দিয়েছে। এসডিজির ৫ নং অভীষ্ট হলো 'জেন্ডার সমতা অর্জন' এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন' যা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে নারী শিক্ষার মূল ভিত্তি শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। কারণ- বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে - 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা - যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা হইবে।' সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ

করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও স্বদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' এছাড়াও সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন।'

জাতির পিতার পথ অনুসরণ করেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণসহ সময়োপযোগী নানাধরনের নীতি ও কৌশল গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গৃহীত ১০ টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন 'নারীর ক্ষমতায়ন'। তাই, দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও আজ অংশগ্রহণ করতে পারছে। ফলে দ্রুত সরকারের রূপকল্প- ২০৪১ বাস্তবায়িত হবে যার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সংবিধানের আলোকে নারী শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। কারণ, শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা কন্যা শিশুর সার্বিক উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুমৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। শিশুর শিক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য সরকার নারীবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান অন্তরায়। সরকারের প্রণীত- শিশুআইন, শিশুশ্রম নিরসন আইন, জাতীয় শিশুনীতি - ২০১১, শিক্ষানীতি - ২০১০, স্বাস্থ্যনীতি, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন - ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন - ২০১৮, ইত্যাদি আইন নারী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও, সরকার বিনামূল্যে বই প্রদান, উপবৃত্তি, মিড - ডে - মিল, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণসহ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ - ২০২৫ প্রণয়ন করেছে। সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯ হটলাইন সেবাও চালু করেছে। এর ফলে নারীরা শিক্ষা ও উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়ন অংশীদারিত্ব বেড়েছে, দারিদ্র্যমোচন হয়েছে, সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মজুরি, কর্মে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব, শীর্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্যেক সমাজে কোনো না কোনোভাবে নারী- পুরুষ বৈষম্য বিদ্যমান। এ বৈষম্য নিরসনে করে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২১ -

২২ অর্থবছরের নারী উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ৯৮ হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা যা ২০২২- ২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ২৯ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকায়, যা মোট বাজেটের ৩৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ এবং জিডিপির ৫ দশমিক ১৬ শতাংশ। এছাড়া, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত , দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষায় বর্তমানে ১০০ ভাগ ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে, ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ হার বর্তমানে ৭০ শতাংশ। ডিপ্লোমা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলে ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের ২০ শতাংশ কোটা দেওয়া হয়েছে যা পূর্বে ছিল ১০ শতাংশ। মানসম্মত ও আধুনিক প্রযুক্তি সহায়ক সমৃদ্ধ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন( ইতোমধ্যে দেশে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে মহিলা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান।

স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বিগত তিন অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৫২ হাজার ২২২ জন স্নাতক(পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪৫ কোটি ৬৯ লাখ টাকার বেশি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রী ৭৫ শতাংশ। এর ফলে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে এবং এ পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে হ্রাস পাবে। নারীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য চট্টগ্রামে Asian University for Women শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন দেশের মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে।

সরকার বিদেশ গমনেচ্ছু ডাক্তার, নার্স ও বেকারদের জন্য আরবি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও মালয় ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশের ৬ টি বিভাগে ১১ টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছে। এর ফলে নারীদের কর্মসংস্থান দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী- '১৯৯১সালে জনশক্তি রপ্তানিতে নারী কর্মী যুক্ত করা হয় ১৯৯১ সালে মোট ১২টি দেশে ২ হাজার ১৮৯ জন কর্মী পাঠানো হয়। ২০২০ সালে করোনা মহামারির মধ্যেও ২১ হাজার ৯৩৪ জন নারী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন। যেখানে পুরুষ কর্মী এর অর্ধেকও যেতে পারেন নি। ২০২১ সালে কাজ নিয়ে বিদেশ গেছেন ৮০ হাজার ১৪৩ জন নারী। ' (তথ্যসূত্র- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ওয়েবসাইট) গত তিন বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২২ লাখ ৪০ হাজার নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

৮ লাখ কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ৩১ লাখ ২০ হাজার নারীকে ভিজিডি সহায়তা প্রদান

করা হয়েছে। ১ হাজার ৬৫০ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীদের সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ ও অস্থায়ী আবাসন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা এক স্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশ ও আইনি সহায়তা, মানসিক ও সামাজিক কাউন্সিলিং, আশ্রয় সেবা এবং ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ওসিসি হতে প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে তিন দশকেরও বেশি সময় যাবৎ নারী নেতৃত্ব দেশ পরিচালনা করছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বের রোল মডেল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে থেকে তো বটেই উন্নত অনেক দেশ থেকেও এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী নেতৃত্বে বাংলাদেশের নারী সমাজ আজ ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যোগ্য জনশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নারীদের অবাধ প্রবেশের সুযোগ হয়েছে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে যুক্ত হচ্ছে এদেশের নারীরা। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের প্রশংসা করছে। ফলে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, 'প্ল্যানেট ৫০ : ৫০ চ্যাম্পিয়ন', 'পিস ট্রি ' 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড ' 'সাউথ-সাউথ' 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' 'চ্যাম্পিয়ন অভ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ' 'এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড ২০২১' এবং তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত 'উইটসা ২০২১' অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

আজকে বাংলাদেশে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করবে ২০৪১ সালে তার বয়স হবে ১৯ বছর। এই শিশুটিই হবে আগামীর বাংলাদেশের মূল চালিকাশক্তি। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা শুধু সরকারের লক্ষ্য নয়,বরং উন্নত দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা, যার জন্য প্রয়োজন হবে শারীরিকভাবে সক্ষম ও মানসিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত মানবসম্পদ। সেখানে থাকবেনা কোনো বৈষম্য, নারীর অধিকার নিশ্চিত হবে সকল ক্ষেত্রে, সামাজিক সুরক্ষা পাবে প্রতিটি নাগরিক, দেশ হবে দারিদ্র্য শূন্য, রাষ্ট্র হবে কল্যাণকর এটাই প্রত্যাশা।

লেখক : সহকারী তথ্য অফিসার, পিআইডি।

# অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে নারী

## ফারজানা ইয়াসমীন

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে সোনার বাংলার। পাকবাহিনীর অত্যাচারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির স্বীকার হয়েছিল এ দেশের নারী সমাজ। এসব বেঁচে যাওয়া নির্যাতিত নারীদের তিনি নিজ সন্তানের মর্যাদা দিয়েছিলেন। নির্যাতিত সকল নারীদের দায়-দায়িত্ব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা তাদের কাঁদে তুলে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীর সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৪ লাখ নারীই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। কোনো নারী রাজাকার ছিল না। রাজাকারের কোনো কাজে সমর্থনও করেনি কোনো নারী (বেগম পত্রিকা, ২০০০)। আমাদের আছে গর্বের তারামন বিবি বীরপ্রতীক, মুক্তিযোদ্ধা ডা. সেতারা বেগম, কাকন বিবি, ফোরকান বেগম, আশালতা বৈদ্য, শোভা রাণী, করুনা বেগম, বীথিকা বিশ্বাস, শিরিন বানু মিতিল ও আলেয়া বেগমসহ আরও অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা। একাধিক সম্মুখযুদ্ধে তাদের অনেকেরই ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁরা প্রত্যেকেই একেকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

বাংলাদেশের নারীর সাফল্য আজ বিশ্ব জুড়ে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। একজন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা। জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিতে নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এর মূল ভিত্তি শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। জাতির পিতার পথ অনুসরণ করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী উন্নয়ন,কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ, মধ্যে ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণসহ সময়োপযোগী নানা ধরনের নীতি - কৌশল গ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গৃহীত ১০ টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন " নারীর ক্ষমতায়ন'। সে লক্ষ্যে চলছে নারী উন্নয়নের নানা কার্যক্রম। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যুক্ত হয়েছে উন্নয়নের মহাসড়কে। এরই ধারাবাহিকতায় গত এক দশকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যপক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। যার সুফল সমাজের সকল স্তরের মানুষ পেয়েছে, পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে। গ্রামীণ নারীসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থানকে মজবুত করার জন্য সহজ শর্তে বিভিন্ন রকম ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং আয়বর্ধক কর্মে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বর্তমান সরকার 'আমার বাড়ি, আমার খামার' প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে।

গার্মেন্টস শিল্পে ৪০ লক্ষ কর্মরত নারী পুরুষের মধ্যে ৮০ ভাগই নারী। নারীর ক্ষমতায়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০ এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও নারীরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী সংসদ অর্থাৎ ২২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে। এছাড়াও সরাসরি নির্বাচনের সুযোগতো রয়েছেই। চাকরিতেও নারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুবিধা। উচ্চ আদালত এবং নিম্ন আদালতে আসীন রয়েছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী বিচারক। তাঁরা দক্ষতার সাথে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। প্রশাসনে আছেন বেশ কয়েক জন নারী সচিব। বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সামলাচ্ছেন একজন নারী সচিব। নারীরা এখন পুলিশ, সেনাবাহিনী কিংবা জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীর মতো চ্যালেঞ্জিং কাজে উচ্চপদে দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। নারী বিজ্ঞানী,গবেষক, উদ্ভাবক,রাষ্টদূত সবক্ষেত্রেই যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও বিরোধীদলীয় নেত্রীও নারী। এছাড়াও শিক্ষকতা,ডাক্তারি পেশাসহ গণমাধ্যমেও নারীদের আধিপত্য চোখে পড়ার মতো।

রাষ্ট্র ও জনজীবনের মূলধারায় নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারী পুরুষের সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের সংবিধানসহ বিদ্যমান আইন,পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণী দলিলপত্রে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি' র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জেন্ডার সমতাভিত্তিক এক উন্নত - সমৃদ্ধ বিশ্বে প্রবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মহাসোপানে বাংলাদেশের নারীরা আজ আদর্শ ও নির্ভরযোগ্য। ৮ কোটি ২২ লাখ নারীর কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ আজ আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় কম -বেশি ৮৬ কোটি নারীর বসবাস,যার মধ্যে প্রায় ৬৩ কোটি নারী ভারতীয়। জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে ২০২১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬৫ তম (সামগ্রিক স্কোর ছিলো ০.৭১৯)। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যা বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ সূচকে শীর্ষ ১০০ এ স্থান পেয়েছে। এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর মধ্যে ভুটান ১০৬, শ্রীলংকা ১১৬, মালদ্বীপ ১২৮, ভারত ১৪০ ও পাকিস্তানের অবস্থান ১৫৩। বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৬.৩ শতাংশ। দেশে মোট শ্রমশক্তির আকার ৬ কোটি ৩৫ লাখ, যার মধ্যে

পুরুষ ৪ কোটি ৩৫ লাখ এবং নারী ২ কোটি। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৫১ শতাংশ, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫৪ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৮.৩৮ শতাংশ নারী। বিগত সময়ের তুলনায় নারীরা শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে অনেক এগিয়েছে। তবে এখানেই আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই, আমাদের যেতে হবে অনেক দূর, করতে হবে অনেক কিছু। বর্তমান সরকার " প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' ফান্ড গঠন করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নারীদের শিক্ষা বৃত্তিসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের ভর্তির হার বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আরও ৬২ টি দেশের সাথে সমন্বিতভাবে প্রথম। ২০২১ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার শতকরা হার ছিল ৬৪.৪১ শতাংশ আর পুরুষ শিক্ষকের হার ছিল ৩৫.৫৯ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষায় বর্তমানে শতভাগ ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে,ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ হার ৭০ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষায় নারীদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে গত এক দশকে অধিক সংখ্যায় নারী শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং সাফল্যের সাথে শ্রমবাজারে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছেন।

বিগত এক দশকে সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নারীদের জীবনমানে ব্যপক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। নারী শিক্ষার হার বেড়েছে, গড় আয়ু বেড়েছে, সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। শিশু মৃত্যুরহার এবং মাতৃমৃত্যুর হারও অনেক কমেছে। সামগ্রিকভাবে দেশের দারিদ্র্যের হার কমেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, নারী ক্ষমতায়িত হচ্ছে। এতকিছুর পরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা এখনও পিছিয়ে রয়েছে। তাদেরকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনার জন্য সরকার ইতোমধ্যে টার্গেট ওরিয়েন্টেড কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত সকল নাগরিকদের সমাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা কর্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ রয়েছে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ। বর্তমান অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতা ৫৭.০১ লক্ষ, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ২৪.৭৫ লাখ, প্রতিবন্ধী ২৩.৬৫ লাখ, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ৮৬ হাজার জন উপকারভোগী নির্ধারিত হারে ভাতা পাবেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা কর্যক্রমের আওতায় নগদ সহায়তা পাবেন মোট ১ কোটি ২২ লাখ ৮৬ হাজার জন উপকারভোগী। এছাড়াও দরিদ্র মানুষের জন্য ভিডব্লিউবি কার্যক্রম, ভিজিএফ,জিআর,কাবিখাসহ নানাবিধ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। খাদ্য সহায়তাসহ অন্যান্য সুবিধা পাবেন ৩ কোটি ৫৯ লাখ ২৫ হাজার জন উপকারভোগী। বিভিন্ন প্রকার উপবৃত্তি পাবে ২ কোটি ৩৮ হাজার জন।

খুব সাধারণীকরণ মনে হলেও এখনো ধর্মীয় অনুশাসনের অপব্যবহার, ইভটিজিং, যৌন হয়রানি, কর্ম বা শিক্ষা ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব,অসৌজন্যমূলক

ব্যবহার,আনওয়েলকামিং এটিচ্যুড, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের নেতৃত্ব বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এদেশের নারীরা সকল বৈষম্যকে ছাপিয়ে নিজ যোগ্যতায় দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দক্ষতার সাথে তাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবেন এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন এটাই প্রত্যাশা। নারী শিক্ষা ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি অর্জনের স্বীকৃতি হিসেব যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা 'গ্লোবাল সামিট অব উইমেন'- এর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ' অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারও পেয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

আজকে বাংলাদেশে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করবে ২০৪১ সালে তার বয়স হবে ১৯ বছর। এই শিশুটিই হবে আগামীর বাংলাদেশের মূল চালিকাশক্তি। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা শুধু সরকারের লক্ষ্য নয়,বরং উন্নত দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা, যার জন্য প্রয়োজন হবে শারীরিকভাবে সক্ষম ও মানসিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত মানবসম্পদ। সেখানে থাকবেনা কোনো বৈষম্য, নারীর অধিকার নিশ্চিত হবে সকল ক্ষেত্রে, সামাজিক সুরক্ষা পাবে প্রতিটি নাগরিক, দেশ হবে দারিদ্র্য শূন্য, রাষ্ট্র হবে কল্যাণকর এটাই প্রত্যাশা।

লেখক : ফ্রিল্যান্সার

# বাংলাদেশে প্রসবজনিত ফিস্টুলা নির্মূলে করণীয়

ডাঃ সিরাজুম মুনিরা

একজন সুস্থ মা দেশ ও জাতি গঠনে একটি বড়ো ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রসবকালীন জটিলতায় সবচেয়ে গুরুতর ও বেদনাদায়ক যেসব ক্ষতি নারীর হয়ে থাকে, সেগুলোর একটি হলো প্রসবজনিত (অবস্টেট্রিক) ফিস্টুলা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য বলছে, বাংলাদেশে আনুমানিক ১ লাখ ২০ হাজার নারী প্রসবজনিত ফিস্টুলায় ভুগছেন। প্রতি ১ হাজার বিবাহিত নারীর মাঝে ১ দশমিক ৬৯ জন প্রসবজনিত ফিস্টুলায় আক্রান্ত। গত ২৩শে মে ইউএনএফপিএর কর্মসূচি, ক্যাম্পেইন টু এন্ড ফিস্টুলার আওতায় বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রসবজনিত ফিস্টুলা নির্মূল দিবস। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমরা এখনও ফিস্টুলা নির্মূলে অনেক পিছিয়ে আছি।

প্রসবজনিত জটিলতার কারণে মাসিকের রাস্তার সাথে মূত্রথলি বা মলাশয়ের এক বা একাধিক অস্বাভাবিক ছিদ্র হয়ে যুক্ত হওয়া। এর ফলে কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রস্রাব-পায়খানা বের হয়ে যায়। বিব্রতকর গন্ধ এবং সার্বক্ষণিক ভেজাভাব স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা হয়ে দাড়ায়।

বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত প্রসব বেদনার ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে জরুরি ও উন্নত চিকিৎসা না পেলে বাচ্চার মাথা যদি প্রসব পথে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকে তাহলে মূত্রনালী, প্রস্রাবের পথ এবং পায়ুপথের নরম অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পচন ধরে, ফলস্বরূপ ছিদ্রহয়ে প্রসবজনিত ফিস্টুলা সৃষ্টি হয় এবং সাধারণত ডেলিভারির ৭-৮ দিন পর থেকেই অনবরত প্রস্রাব-পায়খানা ঝরতে থাকে। এমন অবস্থায় অধিকাংশ নারী মৃত সন্তান প্রসব করে। সিজার বা অপারেশনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম, অন্য যে কোনো কারণে তলপেট, যোনিপথ বা জরায়ুতে অপারেশনের সময় অসাবধানতাবশত ফিস্টুলা হতে পারে। বাংলাদেশে অপারেশনেরজনিত ফিস্টুলার সংখ্যাও কম নয়, যা বর্তমানে ফিস্টুলার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। নারীদের জনেন্দ্রিয়ের ফিস্টুলার আরও কিছু কারণ আছে, যেমন- যৌন সহিংসতা, সড়ক দুর্ঘটনা, জন্মগত ত্রুটি, ক্যান্সার, সংক্রমণ ইত্যাদি।

প্রসবজনিত ফিস্টুলা কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। সেগুলো হলো ভেসিকো-ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা (Vesico-Vagainal Fistula)- এটি মূত্রাশয় এবং যোনিপথের মাঝে সংঘটিত হয়। ইউরেথ্রো- ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা (Urethro-Vaginal Fistula)- এটি মূত্রনালী এবং যোনিপথের মধ্যে হয়ে থাকে। রেক্টো-ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা (Recto-Vaginal Fistula)- মলদ্বার এবং যোনি পথের মধ্যে হয়ে থাকে।

প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধযোগ্য, ফিস্টুলা নির্মূলে প্রতিরোধই সব থেকে

গুরুত্বপূর্ণ। প্রসবকালে সব নারীর পাশে দক্ষ সেবাদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং প্রসবজনিত জটিলতায় জরুরি সেবা দেওয়ার মাধ্যমে সার্বজনীন মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ও ফিস্টুলা প্রায় নির্মূল করা যেতে পারে। বাল্যবিবাহের অবসান ঘটিয়ে এবং মেয়েদের প্রথম গর্ভধারণের সময়টা পিছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রসবজনিত ফিস্টুলার হার কমানো সম্ভব। নারীদের পরিবার পরিকল্পনার সেবার আওতায় আসার সুযোগ দেওয়া এবং তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে অধিকার নিশ্চিত করা। প্রসবজনিত ফিস্টুলা টিকে থাকা মানে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে অবকাঠামোর উন্নয়ন, দ্রুতগামী পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কর্মীদের উপস্থিতি জরুরি। যে কোনো অপারেশন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা উচিত। আর্থসামাজিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন সবচেয়ে প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ নারীসহ সবাইকে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। দেশব্যাপী সব সম্প্রদায়ের নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, যাতে পরিবারের অবহেলার শিকার না হতে হয়।

সমাজের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে ফিস্টুলা প্রতিরোধের উপায় এবং বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। অনেক নারী সঠিক চিকিৎসা নিয়ে ফিস্টুলা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিটি ফিস্টুলা এডভোকেট হয়ে রোগটির ঝুঁকি ও চিকিৎসা সম্পর্কে প্রচার চালাতে এবং সচেতনতা বাড়াতে পারেন। একটি তথ্যের প্রচার দরকার- প্রসব বেদনা ওঠার ১২ ঘণ্টার মধ্যে সন্তানের জন্ম না হলে গর্ভবতী নারীকে জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে নিতে হবে। বাড়িতে নয়, নিকটস্থ হাসপাতালেই ডেলিভারির জন্য উত্তম স্থান।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সরকার ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ এর টেকনিক্যাল সহায়তায় ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে ফিস্টুলা মুক্ত করার একটি বড়ো উদ্যোগ নিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ এর সহায়তায় প্রসবজনিত ফিস্টুলা নির্মূলের দ্বিতীয় কৌশল পত্র প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইতোমধ্যে অসংখ্য প্রশিক্ষিত মিড-ওয়াইফ নিয়োগ করা হয়েছে। মাতৃ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি ক্লিনিক এর সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৮ বছরের আগে বিয়ে নয় ২০ বছর এর আগে সন্তান ধারণ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির হার বাড়ানো ও সিজারিয়ান ডেলিভারির সংখ্যা কমানোর প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে বিনামূল্যে দক্ষ ধাত্রী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচিও বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফিস্টুলা কেয়ার প্লাস সাপোর্টেড সাইটের মাধ্যমে ফিস্টুলা রোগীদের বাড়ি থেকে হাসপাতালে আনা থেকে শুরু করে সব ধরনের

চিকিৎসা ব্যয় বহন করা হয়। প্রসবজনিত ফিস্টুলার চিকিৎসা কি? আমি কবে শুকনো বিছানায় শুতে পারব? ফিস্টুলা রোগীদের কাছ থেকে এমন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়তই। কারণ একজন ফিস্টুলা রোগীর অনবরত প্রস্রাব ঝরতে থাকে।

প্রসবজনিত ফিস্টুলার ভুক্তভোগী একজন নারীর মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কের উন্নয়ন করা, সহানুভূতিশীল আচরণ করা কথিত বিশ্বাস আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের করে নিয়ে আসা এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা অত্যন্ত জরুরি এবং তাকে বোঝাতে হবে যে, প্রসবজনিত ফিস্টুলার চিকিৎসা সম্ভব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার করে ফিস্টুলা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব। এখানে যোনিপথ ও প্রস্রাবের পথকে আলাদা করে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানটি অপারেশন এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে এই জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত ন্যাশনাল ফিস্টুলা সেন্টার কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। ইউএনএফপি এর সহায়তায় বর্তমানে প্রায় ১০ টি সরকারি মেডিকেল কলেজে বিনামূল্যে ফিস্টুলা রোগীদের সেবা দেওয়া হয়। এছাড়াও আরও সাতটি বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান ফিস্টুলা নিরাময়ে বিশেষ সেবা দিয়ে থাকে। যেমনঃ হোপ ফাউন্ডেশন, ল্যাম্ব হসপিটাল, ম্যামস ইনস্টিটিউট, কুমুদিনী হাসপাতাল, আদদ্বীন হাসপাতাল, ইত্যাদি।

যদি ফিস্টুলা হওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা পাওয়া যায় তখন বিনা সার্জারিতে এন্টিবায়োটিক দিয়ে এবং মূত্রথলিতে কয়েক সপ্তাহ catheter দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারের ফিস্টুলা ভালো করা সম্ভব। ফিস্টুলা অপারেশন জটিল এবং দক্ষ সার্জনরাই এই অপারেশন করতে পারে। ফিস্টুলা সারাতে অস্ত্রোপচারের পাশাপাশি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় রোগীদের পরামর্শ ও অন্যান্য সহযোগিতা দেওয়া হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন। এতে ওই নারীরা সমাজের সঙ্গে আবার নিজেদের যুক্ত করে, নতুন করে জীবন শুরু করার মর্যাদা ও আশা ফিরে পান।

অবস্টেট্রিক ফিস্টুলার চিকিৎসা না নিলে তা থেকে নানান ধরনের শারীরিক দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হতে পারে। যেমনঃ যোনি পথে চুলকানি, ক্ষত, বারবার মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ, স্নায়বিক ক্ষতি (ফুট ড্রপ, হাটার সমস্যা) শারীরিক মিলন ও সন্তান ধারণে অক্ষমতা, কিডনিতে পাথর, ঘুম ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাবের ফলে নিদ্রাহীনতা অবসন্নতা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে সামাজিক লজ্জা প্রায় সময় নারীদের বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়, ফলে তারা পরিত্যক্ত হয়ে পরেন। অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্যা আক্রান্ত নারীদের তালাক দিয়ে দেন তাদের স্বামীরা। পরিবার ও সমাজও তাদের আলাদা করে দেয়। এতে ওই নারীরা আরও বেশি করে দারিদ্র্যের কবলে পড়েন। প্রসবজনিত ফিস্টুলাকে তাই প্রায়ই একটি লুকানো যন্ত্রণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা নারী ও তাদের পরিবারের উপর প্রভাব ফেলে। ফিস্টুলায় আক্রান্ত নারীরা

এই সমস্যাটি নিয়ে লজ্জিত থাকেন এবং এ নিয়ে খুব একটা কথা বলেন না তাদের ভোগান্তি টা আড়ালে রয়ে যায়। এসবের জন্য অনেকে নিজেকে অপরাধী মনে করে, তারা মনে করে এটি তাদের কোনো পাপের ফল। অনেক নারী এই দুর্বিষহ জীবন সহ্য করতে পারে না, পরে এমনকি আত্মহত্যার পথও বেছে নেন।

আমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে পারি, বাংলাদেশ সরকার মাতৃস্বাস্থ্যে অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেছে এবং এই কৃতিত্বের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। এখন সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ সবার সহযোগিতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের সমস্ত ফিস্টুলা রোগীকে চিকিৎসার আওতায় এনে ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর মতো দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে ফিস্টুলা মুক্ত করা সময়ের দাবি। আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে প্রসবজনিত ফিস্টুলা এমন একটি সমস্যা যা একজন নারীকে সার্বক্ষণিক শারীরিক ও মানসিক কষ্টের পাশাপাশি তাকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অনেক সময় তারা জীবিত থেকেও মৃত। তাই তার প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রতিটি সচেতন নাগরিকের কর্তব্য।

লেখক- সিভিল সার্জন বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ঢাকা।

# সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পদ্মা সেতু বিশ্বের জন্য অনুকরনীয়

## মোতাহার হোসেন

প্রমত্ত পদ্মার দুই কূল এক করে দিয়েছে বহুল প্রত্যাশিত পদ্মা সেতু। নকশা প্রণয়ন, নদীশাসন থেকে শুরু করে এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। এ কারণেই সেতুটি হয়ে উঠেছে নান্দনিক ও টেকসই। অন্যদিকে এমন খরস্রোতা নদীতে এ ধরনের সেতু নির্মাণ বিশ্বের কাছেও রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ এই সেতু নির্মাণে ৫টি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে। যা ইতোপূর্বে কোন সেতুতে ব্যবহার করা হয়নি। এ ধরনের খবর বিশ্ব গণমাধ্যমের প্রকাশিত হয়েছে। মূলত:প্রমত্ত পদ্মার বুকে অত্যাধুনিক সেতু গড়ে তুলতে ব্যবহার করা হয়েছে ১৩ ধরনের প্রযুক্তি। স্মার্ট সেন্সর, স্যাটেলাইট, জিপিএস, পেন্ডুলাম বিয়ারিংসহ সেতু নির্মাণে প্রতিটি পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে নানাপ্রযুক্তি ও ডিভাইস। ২৫ জুন উদ্‌বোধন হওয়া পদ্মা সেতুর টোল আদায়েও ব্যবহৃত হয়েছে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি। মূল অবকাঠামোর পাশাপাশি নিরাপত্তায় পদ্মা সেতুতে রয়েছে অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা।

প্রচলিত ব্রিজে কোথাও ফাটল কিংবা অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না তা ম্যানুয়ালি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে এ রকম কিছু ধরা পড়লে তা ঠিকঠাক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে পদ্মা সেতুকে বলা হচ্ছে, স্মার্ট সেতু। কেননা সেতুটির বিভিন্ন পয়েন্টে বসানো হয়েছে স্মার্ট সেন্সরভিত্তিক গেজেট। এ সেন্সরগুলো সার্বক্ষণিক সেতুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। একে বলা হচ্ছে, সেতুর 'হেলথ মনিটরিং সিস্টেম'। কোনো কারণে সেতুর কোনো অংশে ত্রুটি দেখা দিলে তাৎক্ষণিক জানিয়ে দেবে এ সেন্সর। সেতু রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বরতদের কম্পিউটার সিস্টেমে ভেসে উঠবে তাৎক্ষণিক সর্তক বার্তা। আর এটি দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবেন প্রকৌশলীরা। বিশেষ করে ভূমিকম্প কিংবা এ ধরনের বড়ো কোনো দুর্যোগে সেতুর স্টিলের ট্রাস বেঁকে যেতে পারে, ভেতরে ভেঙে যেতে পারে, সাব-স্ট্রাকচার কিংবা সুপার স্ট্রাকচারের ক্ষতি হতে পারে, পিয়ারের ক্ষতি হতে পারে, বিয়ারিংয়ের ক্ষতি হতে পারে, ট্রাসের ক্ষতি হতে পারে, ডেকের ক্ষতি হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এসব ছোটো সমস্যা থেকে বড়ো সমস্যা হওয়ার শঙ্কা থাকলেও সেটি জানিয়ে দেবে এ সেন্সর। এতে ক্ষতি এড়াতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। সেতুর এ স্মার্ট ফিচারটি সেতু রক্ষণাবেক্ষণে তাৎক্ষণিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় এ ফিচার সেতুর জীবনকাল নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেবে।

অন্যদিকে পদ্মা সেতু নির্মাণে জটিল প্রক্রিয়া পার হতে হয়েছে নদীশাসন অংশে। শত শত বছর ধরে বাধাহীন প্রবহমান নদীকে পদ্মা সেতু নির্মাণবান্ধব করতে নানা কারিগরি প্রযুক্তি সংযুক্ত করতে হয়েছে। বেপরোয়া চঞ্চল নদীকে বশে আনতে এ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে প্রযুক্তি। নদীশাসনে 'গাইড ব্যান্ড উইথ ফলিং অ্যাপ্রোন' কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। নদীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে স্যাটেলাইট খুবই কার্যকর প্রযুক্তি। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে কোনো নদীর কাঠামোগত মানচিত্র জানা যায়। তবে সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল স্যাটেলাইট মানচিত্রের বিস্তারিত তথ্য। সুইজারল্যান্ড থেকে স্যাটেলাইট মানচিত্র থেকে বিস্তারিত নিয়ে কাজ শুরু করে সেতুর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। সেতুর নকশা প্রণয়নে নদীর গতিপথ বদলানোর চিত্র স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বহুরূপী পদ্মার গতিপথ আর চরিত্র নির্ণয়ে জিপিএসের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। নদীশাসন আর পাইলিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে জিপিএস প্রযুক্তি। নদীর পাড়ে যে বৃহৎ আকৃতির পাথর ও জিওব্যাগ বসানো হয়েছে, সেগুলো জিপিএসের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ করে বসানো হয়েছে।

ভূমিকম্প প্রতিরোধে পদ্মা সেতুতে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পেন্ডুলার বিয়ারিং (এফপিবি) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। স্টিল সুপার স্ট্রাকচার ও কংক্রিটের ফাউন্ডেশনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কাজটি করেছে এই ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিং। এই বিয়ারিং থাকার ফলে নদীর তলদেশে শক্তিশালী ভূমিকম্পন হলেও এর পুরো মাত্রা সেতুর স্টিলের সুপার স্ট্রাকচারে যাবে না। ফলে ব্রিজটি বর্ধিত মাত্রার ভূমিকম্পও সহ্য করতে পারবে। সেতু কর্তৃপক্ষ বলেছে, পদ্মা সেতুটি ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর ভূমিকম্প প্রতিরোধে অন্যতম ভূমিকা রাখবে এই দোদুল্যমান বিয়ারিং। সাধারণত প্রচলিত কংক্রিটের ব্রিজ জীবনকাল শেষ হয়ে গেলে একে পুনর্ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু পদ্মা সেতু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এটি স্টিলের ট্রাস ব্রিজ। তবে সড়কে এবং রেলপথেও আছে কংক্রিটের ব্যবহার। ফলে একে বলা হচ্ছে, কম্পোজিট ব্রিজ। এটি শতভাগ ওয়েল্ডেড (ঝালাই করা)। স্টিলের ব্রিজের বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি কংক্রিটের চেয়ে অনেক হালকা ব্রিজ। জীবনকাল শেষ হলে একে পুনর্ব্যবহার করা যাবে এবং এটি পরিবেশবান্ধব।

পদ্মা সেতুর মাধ্যমে সহজেই অপেক্ষাকৃত কম খরচে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাবে। কুয়াকাটায় অবস্থিত ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ ছড়িয়ে পড়ে। তবে পদ্মা সেতু হওয়ায় বিকল্প সংযোগ স্থাপন সহজ হবে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে পদ্মা সেতুর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ কানেক্টিভিটির দূরত্বও কমে যাবে। এর ফলে ইন্টারনেটের গতি বাড়বে। পাশাপাশি গুগলের ম্যাপিং অ্যাপ্লিকেশন গুগল ম্যাপেও দেখা যাচ্ছে পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু সংলগ্ন রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন স্থাপনা চলে এসেছে গুগল ম্যাপে। স্যাটেলাইট ভিউতেও দেখা যাচ্ছে সেতুটি। ফলে সেতুর রুট ম্যাপ, সেতুর ওপর যানবাহনের অবস্থা জানা যাবে।

পদ্মা হচ্ছে আমাজনের পর পৃথিবীর অন্যতম খরস্রোতা নদী। বিশ্বের এই বৃহত্তম ডেল্টার মাঝামাঝি এসে বিশাল যমুনা মিশেছে প্রমত্তা পদ্মার সঙ্গে। তৈরি করেছে স্রোতস্বিনী এক বিশাল জলরাশির যা দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে আলাদা করে রেখেছে এর উত্তর পূর্বে অবস্থিত রাজধানী ও প্রধান সমুদ্রবন্দর থেকে। তাই সড়কপথে যাতায়াতে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে প্রতিনিয়ত নদী পাড়ি দিতে হয়। এ কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলাকে উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করতে প্রায় এসব অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পদ্মার দুই পাড়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের। এসব মানুষের দাবি পূরণে সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পর সেতু ডিজাইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'AECOM MAUNSEL'-কে নিয়োগ দেয়। সেতু ডিজাইনের ক্ষেত্রে পদ্মা নদীর তিনটি বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সদা পরিবর্তিত পদ্মার মূল স্রোতধারা, প্রচুর পলিবাহিত পদ্মার তলদেশে তীব্র স্রোত এবং পদ্মার তীর ভাঙন।

পরিবেশ রাক্ষায় প্রকল্প এলাকায় বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় ৯০ এর অধিক প্রজাতির প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজারের অধিক ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প এলাকাকে সরকার থেকে পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকার জীববৈচিত্রের ইতিহাস ও নমুনা সংরক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি অস্থায়ী জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু এখন দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি এই সেতুর সুফল বয়ে আনবে এ অঞ্চলের কৃষিসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে, জিডিপিতে অবদান রাখায় অর্থনৈতিকভাবে দেশের মনুষ উপকৃত হবে। একই সঙ্গে সর্বাধুনিক প্রযুনির্ভর সেতু হিসেবে এটি বিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে অনাগত দিনেও।

লেখক: সাংবাদিক,সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম।

# হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালঃ আকাশ পথে আধুনিকতার ছোঁয়া

## এম জসীম উদ্দিন

বিশ্বায়নের এযুগে সময়ের সাথে তাল মেলাতে উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ উন্নয়ন হতে হবে টেকসই এবং সময়োপযোগী। বর্তমান সরকার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে গত ১৩ বছরে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ তার মধ্যে অন্যতম। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের গুরুত্ব, প্রতিবছর আকাশপথে যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি, কার্গো পরিবহণে চাহিদা বৃদ্ধি, বিদ্যমান টার্মিনালে ধারণক্ষমতার অধিক যাত্রী চলাচল, দেশের বর্তমান পরিবহণ চাহিদা এবং হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অপর্যাপ্ত অবকাঠামোকে বিবেচনা করে আকাশপথে চলাচলকারী যাত্রীদের আধুনিক সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টার্মিনালটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ৩০ লাখ বর্গফুট জায়গায় তিনতলা বিশিষ্ট এ টার্মিনাল ভবনটির আয়তন হবে ২ লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটার এবং লম্বা ৭০০ মিটার ও চওড়া ২০০ মিটার। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে এ বিমানবন্দরকে।

২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদিত হয়। এর আগে ২০১৫ সালে বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ ও সম্প্রসারণের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন ও খসড়া মাস্টারপ্ল্যান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন। ২০১৭ সালের ১১ জুন এ প্রকল্পের জন্য চারটি প্রতিষ্ঠানকে যৌথভাবে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত। কিন্তু নানা কারণে নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু করা যায়নি। ২০১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে কাজ ধারণার চেয়েও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রতিদিন কয়েকটি শিফটে ভাগ করে দেশি বিদেশি চার হাজার শ্রমিক কাজ করছে প্রকল্পটিতে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ প্রত্যাশার চেয়ে ১ দশমিক ৯ শতাংশ এগিয়েছে। ৮ এপ্রিলের ২০২২ এর মধ্যে টার্মিনালের নির্মাণ কাজের ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষে ২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে তৃতীয় টার্মিনালটি উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঢাকার হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ করছে স্যামসাং গ্রুপের কন্সট্রাকশন ইউনিট স্যামসাং কনস্ট্রাকশন এবং ট্রেডিং (সিঅ্যান্ডটি) করপোরেশন। অত্যাধুনিক নির্মাণ কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্যামসাং সিঅ্যান্ডটি করপোরেশন আকর্ষণীয় নির্মাণ সাফল্যের বিস্তৃত পোর্টফোলিও তৈরি করেছে। ইতোমধ্যে, প্রতিষ্ঠানটি প্রকৌশল ও নির্মাণসংস্থা হিসেবে বিভিন্ন খাতে নিজেদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করেছে। স্যামসাং সিঅ্যান্ডটি করপোরেশন উঁচু ভবন থেকে বিমানবন্দর, চিকিৎসা সুবিধা এবং অত্যাধুনিক উৎপাদন সুবিধাসম্পন্ন স্থাপনা নির্মাণ করতে সক্ষম। বুর্জ খলিফা, পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার, তাইপে ১০১, সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরের ৪ নম্বর টার্মিনাল, দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচেওন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, আবুধাবির ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকসহ আরও অনেক স্থাপনার সফল নির্মাতা এই স্যামসাং সিঅ্যান্ডটি করপোরেশন।

বিমান বন্দরের প্রধান টার্মিনালের দক্ষিণ পাশে তৃতীয় টার্মিনালটি নির্মাণ করা হচ্ছে, যার আনুমানিক নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে বাংলাদেশি টাকায় ২১ হাজার ৪০০ কোটি। টার্মিনালটি নির্মাণে ৫ হাজার কোটি টাকা দেবে বাংলাদেশ সরকার এবং নির্মাণ ব্যয়ের বাকি অংশ আসবে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা'র (জাইকা) তহবিল থেকে। টার্মিনালটি নির্মাণে স্যামসাং সিঅ্যান্ডটি করপোরেশন ৫ হাজার কোটি (১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার) টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। অত্যাধুনিক নতুন টার্মিনালটি চালু হলে বছরে দুই কোটির বেশি যাত্রী এই বিমানবন্দর দিয়ে দেশ-বিদেশে চলাচল করতে পারবেন। বর্তমানে চলাচল করছে ৮০ লাখ যাত্রী। রাজধানীর কাওলা রেলস্টেশনকে তৈরি করা হচ্ছে শুধু হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে যাওয়ার জন্য। দেশ থেকে যাঁরা বিদেশ যাবেন বা বিদেশ থেকে যাঁরা দেশে আসবেন তাঁদের যাত্রা সহজ করতে বিমানবন্দরকে সাজানো হচ্ছে। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে যেতে আরও একটি পথ ব্যবহার করা যাবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে সরাসরি চলে যাওয়া যাবে নির্মিতব্য নতুন টার্মিনালে। বিমানবন্দর এলাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে টার্মিনালে নামার জন্য রাখা হচ্ছে আলাদা ব্যবস্থা। ঠিক একই পথ ব্যবহার করে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। সিঙ্গাপুরের একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা রোহানি বাহরিনের নকশায় এভাবেই তৈরি করা হচ্ছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালটি।

বেবিচকের তথ্য অনুযায়ী, তৃতীয় টার্মিনালে থাকবে ২৬টি বোর্ডিং ব্রিজ। প্রথম ধাপে ১২টি বোর্ডিং ব্রিজ চালু হবে। উড়োজাহাজ রাখার জন্য ৩৭টি এপ্রোন পার্কিং থাকবে। বর্তমানে এপ্রোন পার্কিং আছে ২৯টি তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ শেষে এপ্রোন পার্কিং এর সংখ্যা হবে ৬৬টি। বহির্গমনের জন্য ১৫টি সেলফ সার্ভিস চেক ইন কাউন্টারসহ মোট ১১৫টি চেক ইন কাউন্টার থাকবে তৃতীয় টার্মিনালে।

নির্মিতব্য তৃতীয় টার্মিনালে ১০টি স্বয়ংক্রিয় পাসপোর্ট কন্ট্রোল কাউন্টারসহ ৬৬টি ডিপারচার ইমিগ্রেশন কাউন্টার থাকবে। আগমনীর ক্ষেত্রে পাঁচটি স্বয়ংক্রিয় চেক ইন কাউন্টারসহ মোট ৫৯টি পাসপোর্ট ও ১৯টি চেক ইন অ্যারাইভাল কাউন্টার থাকবে। এর বাইরে টার্মিনালে ১৬টি আগমনী ব্যাগেজ বেল্ট স্থাপন করা হচ্ছে। বছরে দুই কোটি যাত্রীসেবা দিতে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য তৃতীয় টার্মিনালের সঙ্গে মাল্টিলেভেল কার পার্কিং ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে ১৩৫০টি গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। তৃতীয় টার্মিনাল ভবনের সঙ্গে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথ ও উড়াল সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মেট্রোরেল ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সংযোগ ব্যবস্থা থাকবে। এতে থাকবে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা। রানওয়েতে উড়োজাহাজের চাপ কমাতে তৈরি হচ্ছে দুটি হাইস্পিড টেক্সিওয়ে। তৃতীয় টার্মিনাল প্রকল্পের প্রথম ধাপের সঙ্গে বর্তমান টার্মিনাল ভবনগুলোর আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে না। তবে প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে কানেকটিং করিডোরের মাধ্যমে পুরনো টার্মিনাল ভবনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উত্তর পাশে রয়েছে আমদানি ও রফতানি কার্গো ভিলেজ। বর্তমান কার্গো ভিলেজের উত্তর পাশে যথাক্রমে ৩৬ হাজার বর্গমিটার ও ২৭ হাজার বর্গমিটার আয়োতনের সর্বাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন দুটি পৃথক আমদানি ও রফতানি কার্গো ভিলেজ নির্মিত হচ্ছে। টার্মিনালের কাজ শেষ হলে বিমানবন্দরটি বর্তমান দুই লাখ টন থেকে পাঁচ লাখ টন কার্গো হ্যান্ডলিং করতে পারবে।

লেখক : তথ্য অফিসার, পিআইডি।

# বদলে গেছে আবাসন খাত

## রেজাউল করিম সিদ্দিকী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানে বাসস্থানকে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষার ন্যায় অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৭০০ কোটিরও বেশি। এ বিশাল জনসংখ্যার মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করা ধনী-দরিদ্র, উন্নত-অনুন্নত বা উন্নয়নশীল যেকোনো দেশের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারি ও সংঘাতপূর্ণ বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বৈশ্বিক সংকট এই চ্যালেঞ্জের সাথে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রতিবছর নতুন করে বাসস্থানের সংকটে পতিত হচ্ছে। করোনা মহামারির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে কর্মহীন হয়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। এতে অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি বাসস্থানের সংকট তৈরি হয়েছে নতুন করে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলোতে উদ্বাস্তু সংকটের পাশাপাশি নানাবিধ অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে যার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশেও। সামগ্রিকভাবে আবাসনখাতে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এ সংকট উত্তরণে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও আন্তরিক সহযোগিতা। এ সহযোগিতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন। কোনো একক ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য একক প্রচেষ্টা অপেক্ষা সম্মিলিত প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে অধিকতর সফলতা নিশ্চিতে সক্ষম।

'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' স্লোগানকে সামনে নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভূমিহীন এবং গৃহহীন মানুষের আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। একটি ঘর এখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি বিচ্ছিন্ন পরিবারের দারিদ্র্যমোচন। প্রতিটি নিরাপদ বাড়ি পরিবারের সবাইকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আত্মবিশ্বাসী এবং সক্রিয় করে তোলে। ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রথম আশ্রয়ণ প্রকল্প চালু করে, গৃহহীন ও অসহায় দরিদ্র মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন। ভূমিহীন, গৃহহীন, দুঃখী এবং উদ্বাস্তু পরিবারের স্বামী -স্ত্রীর যৌথ নামে জমি ও বাড়ির মালিকানা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা এবং স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত মহিলাদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবারকে মালিকানা নিয়ে ভবিষ্যতে বিবাদে জড়াতে না দেওয়ার

জন্য জমির মালিকানা দলিল, বরাদ্দপত্র এবং শিরোনাম দলিল হস্তান্তর করা হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবারগুলিকে ৩ মাসের জন্য ভিজিএফ প্রোগ্রামের আওতায় আনা হচ্ছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সামাজিক সুবিধা কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক, বিধবা এবং প্রতিবন্ধীদের সুবিধা অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনশীল এবং আয় সৃষ্টিকারী কাজে নিয়োজিত করার জন্য ব্যবহারিক এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিভাগ, সমাজসেবা বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা থেকে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং এনজিওগুলিও এই কর্মসূচির সাথে জড়িত। পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয় এবং প্রকল্পস্থলে নিরাপদ পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন করা হচ্ছে। কমিউনিটি সেন্টার, নামাজের কক্ষ, কবরস্থান, পুকুর এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের রাস্তাগুলিও সহজতর করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ফল, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো হচ্ছে। গৃহহীন মানুষদেরও কৃষি কাজে যুক্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুভূত আবাসন কার্যক্রমের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখা। একা ঘর নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব হতে পারে। কিন্তু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমন্বিত উন্নয়ন এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত। এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এবং একটি সমন্বিত নীতি কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। একই সাথে, এসডিজিকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) সাথে একীভূত করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমাজের দরিদ্র, অনগ্রসর এবং পিছিয়ে পড়া অংশকে বৃহৎ পরিসরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে একীভূত করা হয়েছে। মুজিব বর্ষের বিশেষ উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে জমি ও বাড়ি প্রদান করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত অগ্রাধিকার নীতি "যিনি পিছনে আছেন তাকে অবশ্যই সামনে আসতে হবে' দেশের সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করবে।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে অতি সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত বাংলাদেশের আবাসন খাতে গত এক যুগে ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহদ আশ্রয়ণ প্রকল্প। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১ লাখ ৮৫ হাজার ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতক করে ভূমি প্রদান ও গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী (বর্তমান লক্ষীপুর) জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশী ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের মতো জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো স্থবির হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেন। তাই তিনি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল' সামনে এনে পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন এবং একই বছর তিনি সারা দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন "আশ্রয়ণ প্রকল্প"।

১৯৯৭ সালে প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যারাক, ফ্ল্যাট, বিভিন্ন প্রকার ঘর ও মুজিববর্ষের একক গৃহে মোট ৫ লক্ষ ৭ হাজার ২৪৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে সারাদেশে বিপুল সংখ্যক ফ্ল্যাট নির্মাণ ও প্লট উন্নয়ন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে নির্মিত এসব প্লট বিভিন্ন ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্লটে ব্যক্তি উদ্যোগে ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। এছার রাজধানীর কেরানীগঞ্জে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে পিপিপির ভিত্তিতে ২৫ হাজারের বেশি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি চাকুরিজীবী কর্মকর্তাদের জন্য জরাজীর্ণ আবাসিক ভবনের স্থলে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকার পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ, ২০১৫-২০৩৫) এর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। হালনাগাদ করা হয়েছে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০। দেশের বড়ো বড়ো শহর ও গ্রোথ সেন্টারের পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে মাস্টার প্লান। এছাড়া আবাসন খাতের উন্নয়নে কাজ করছে এমন বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে এই খাতে সরকার নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশেষ করে অতি সাম্প্রতিক সময়ে নির্মাণ সামগ্রিক অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, ভূমির ব্যবহারে সর্তকতা অবলম্বন, মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের নতুন মাত্রা এবং করোনা মহামারির কারণে দেশের আবাসন শিল্প নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সংকট উত্তরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার সর্বাত্মক

প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই এই সংকট উত্তরণে সফলতা আসবে এবং সবার জন্য মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতে সরকারের যে লক্ষ্য তা যথাসময়ে অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আবাসন কর্মসূচির প্রধান সুবিধাভোগীরা হলেন বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের (১০.৫ শতাংশ) বসবাসকারী মানুষ। ফলে দারিদ্র্যমোচনে এই প্রকল্প অবশ্যই কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। দেশের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলো এই কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে। একই সময়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হরিজন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, চা শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, তৃতীয় লিঙ্গ, জলবায়ু শরণার্থী, প্রতিবন্ধী, অসহায় এবং অত্যন্ত দরিদ্র মহিলারা এই কর্মসূচির প্রধান সুবিধাভোগী। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আয় ও উৎপাদনশীল সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি অর্জন সম্ভব। এসডিজি ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ফলে বৈষম্য হ্রাস, বিভিন্ন সেবা, বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি এবং নাগরিক অধিকার আরও উন্নত হবে। এটি লিঙ্গ ও জাতিগত বৈষম্যেরও অবসান ঘটাবে। শুধু আবাসন নিজেই কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপার্জনের সুযোগের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এক জায়গা থেকে সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সহজ হবে। পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা সহকারীরাও গ্রামীণ এলাকায় সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। স্থানীয় পর্যায়ে, নির্মাণ সামগ্রী সরাসরি গ্রামীণ বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়, যার ফলে নির্মাণ ব্যয় কম হয় এবং একই সাথে গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়। এই একটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন হবে।

লেখক : জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

# অটিজম

## সেলিনা আক্তার

অটিজম কোনো রোগ নয়। আমাদের সমাজে এটাকে অধিকাংশ মানুষ ভুল করে রোগ হিসেবে দেখে থাকে। এটি হলো নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার। শিশুর জন্মের তিন বছর বয়সের মধ্যে এটি ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। কখনো কখনো মা-বাবাদের বুঝে উঠতে আরও বেশি সময় লাগে। এ সব শিশুরা পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছুটা কম সক্ষম হয়,সামাজিক আচার-আচরণেও দুর্বল হয়। মানসিক সীমাবদ্ধতার কারণে একই কাজ বারবার করে থাকে। কারণে অকারণে মেজাজ হারিয়ে ফেলে,কিছুটা খিটখিটে মেজাজের হয়ে থাকে। তবে সবার ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রকাশভঙ্গী দেখা যায় না। আচরণগত ভিন্নতা দেখা যায়। ২০১৬ সালে দেশে মোট অটিস্টিক শিশু ছিলো ৪১ হাজারেরও বেশি। ২০২০ সালের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জরিপ অনুযায়ী এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে অটিস্টিক শিশুর তিন শতাংশ এবং ঢাকার বাইরে দশমিক সাত শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে একযুগ আগেও অটিজম শব্দটিকে এভাবে কেউ চিনত না। যিনি চিনিয়েছেন তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাতনি, প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ও বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। মানুষের জন্য কাজ করা বঙ্গবন্ধু পরিবারের স্বভাবজাত ধর্ম। পরিবারের প্রতিটি সদস্য স্ব-স্ব অবস্থান থেকে মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন-"একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি।" জাতির পিতার সুযোগ্য নাতনি সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এমন এক শ্রেণির মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছেন, যা অতীতে এমনটি দেখা যায়নি। তিনি আজ প্রতিটি অটিস্টিক শিশুদের মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

অটিস্টিক শিশুকে নিয়ে যখন পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশের সমাজে বাবা-মা অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পড়তেন, অটিস্টিক শিশুর জীবন যেখানে ছিল নরকসম তখন তাদের পক্ষে দাঁড়ান সায়মা ওয়াজেদ। অটিজম নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম কাজ করতে এগিয়ে আসেন সায়েমা ওয়াজেদ পুতুল। যিনি বাংলাদেশের মানুষকে তার কাজের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, অটিজম কোনো জিন-পরির আসর না, বা পাপের বিষয় নয়- এটি স্রেফ একটি মানসিক অবস্থা। সঠিকভাবে চিকিৎসা করলে এর প্রতিকার সম্ভব। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা বরং বিশেষভাবে সক্ষম। প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদের বিশেষ উদ্যোগে অটিস্টিক শিশুরা আজ শিক্ষিত হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

সাধারণত কাউকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, অন্ধ এবং জন্মগতভাবে অস্বাভাবিক শিশুদের নিয়ে কাজ করতে দেখা যায় না। বরং বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের সমাজের 'বোঝা' এবং

'বিরক্তকর' মনে করে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু সায়মা ওয়াজেদ পুতুল সেই অস্বাভাবিক কাজটিকেই বেছে নিয়েছেন; এবং অটিজম শিশুদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিবন্ধীদের মনে করা হতো সমাজের বোঝা। কিন্তু সমাজের এই বোঝাকে সম্পদে পরিণত করার যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন; তাদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে যে পরিশ্রম করছেন নিঃসন্দেহে তা কেবল প্রশংসার দাবিদারই নয়, অনুপ্রেরণাও। সমাজ ও দেশের অবহেলিত এক গোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতে এনে মিশিয়েছেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। সব প্রতিবন্ধকতা জয় করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আলো দেখাচ্ছেন।

অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অটিজম মোকাবিলায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দক্ষ-অভিজ্ঞ প্রশিক্ষিতদের তত্ত্বাবধান, বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, বইপড়া, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ চাহিদা পূরণ, বিকলাঙ্গ শিশুদের আর্থিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং মানসিক-শারীরিক অটিস্টিক শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অটিজম ও স্নায়ুবৈকল্য-বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটির চেয়ারম্যান সায়মা ওয়াজেদ,তার নেতৃত্বে অটিজম মোকাবিলায় প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বিশ্ব-দরবারে স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। অটিজম নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে তিনি ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'সূচনা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নামে একটি অলাভজনক ফাউন্ডেশন।

অটিজম ও মানসিক স্বাস্থ্য-সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য তার এই উদ্যোগ। সায়মা ওয়াজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, তাদের সম্পদ হিসেবে গড়ে দেশ ও দশের উন্নয়নের অংশীদার করে তোলা। এ কারণে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও কাজের সুযোগ তৈরিতে তিনি সদা তৎপর। বাংলাদেশে ২০১৩ সালে পাস হয় 'নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটি ট্রাস্ট অ্যাক্ট'। এ আইনে অটিজম সম্বন্ধে বলা আছে- যার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হবে, তারা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন, যথা- মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা ;সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাব বিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি;শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা; বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধীতা বা খিঁচুনি ; এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা; চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা ; অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা অসংগতিপূর্ণ হাসি-কান্না; অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং

একই রুটিনে চলার প্রচণ্ড প্রবণতা।' ২০১০ সালে ঢাকার মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অটিজম রিসোর্স সেন্টার এবং ২০১১ সালে অটিস্টিক স্কুল খোলা হয়েছে। ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অটিজম ইন চিল্ড্রেন' (সিএনএসি) খোলা হয়েছে। সিএনএসি এখন একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে যা পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি অ্যান্ড অটিজম ইনস্টিটিউট (IPNA) নামে পরিচিত। যা ২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি হাসপাতালগুলোতে শিশু বিকাশকেন্দ্র এবং দেশের সব জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম কর্নার খোলা হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও অটিজম রোগীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সুইড বাংলাদেশের ৪৮টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলেও অটিস্টিক শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে অটিজমসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্ন সেবা ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

এক কথায় বলা যায় যে, সায়মা ওয়াজেদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অটিজমের গুরুত্ব ও সচেতনতা জাতীয়-আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ অটিজম-সংক্রান্ত কার্যক্রম এগিয়েছে অনেক দূর। ১৪টি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত হয়েছে জাতীয় টাস্কফোর্স। ৮টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি। এর মধ্যে প্রথম সারির ৫টি হলো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অটিজম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার' বিষয়ক 'ঢাকা ঘোষণা'র মধ্য দিয়ে অটিজম ও শিশুর অন্যান্য বিকাশজনিত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি South Asian Autism Network দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া, ২০১৩ সালের ৩০ মে WHO -এর নির্বাহী পরিষদে অটিস্টিক শিশুর জন্য 'সর্বাত্মক ও সমন্বিত উদ্যোগ' নামে একটি প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও সৌদি আরবসহ ৫০টি দেশ সমর্থন দেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সায়মা ওয়াজেদ এর আন্তরিকতার কারণে অটিজম বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এমনকি কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন।

সরকার অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১.৩৩ লক্ষ অটিস্টিক শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৬ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১৫ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কোভিডকালীন

সময়ে অটিস্টিক শিশুদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের বাইরে আরও ২১১ টি কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধীতার ঝুকিতে থাকা ব্যক্তিদের ৪০ টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 'ইউনির্ভাসাল হেলথ কেয়ার কভারেজ' অর্জনের অংশ হিসেবে 'স্বাস্থ সুরক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার অটিজমসহ এনডিডি ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাধারণ বিমা করপোরেশনের সঙ্গে ট্রাস্ট যৌথভাবে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বিমা' বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও এনডিডি ব্যক্তিকে প্রতিবছর এককালীন আর্থিক চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করেছে। ২০১৭ থেকে এই ট্রাস্ট থেকে এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৭০১ জনকে ৪ কোটি ৬৯ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির গৃহভিত্তিক পরিচর্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য কোভিড পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ১৯০টি উপজেলার ৩৯০ জন পিতা-মাতা/অভিভাবকদের অনলাইন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ৬০টি জেলার ১০৫টি উপজেলার ১১৫টি বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এটি এখনো চলমান রয়েছে। এছাড়াও সরকার প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী, বিশেষ স্কুল স্থাপন ও অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান আছে।

'বলতে চাই' ও 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামক দুটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। সহায়ক প্রযুক্তি হিসেবে 'বলতে চাই' অমৌখিক যোগাযোগ সহজ করবে। শিশুর অটিজম আছে সন্দেহ হলে সহজেই 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' অ্যাপ দ্বারা ঘরে বসেই অটিজম আছে কি না তা জানা যাবে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় এ বছরই ১৪টি উপজেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে অটিজমসহ অন্যান্য এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদেরকে জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে সোশ্যাল ও মেডিকেল পদ্ধতির সমন্বয়ে ১৭ ধরনের বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হবে। এনডিডি ব্যক্তিদের জীবনচক্রব্যাপী বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৬-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে প্রথম পর্যায়ে ১৪টি অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। পরবর্তীতে এসব কেন্দ্র আরও বাড়ানো হবে। ২০ লাখ ৮ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭৫০ টাকা করে ভাতা দিয়ে যাচ্ছি। যারা শিক্ষার্থী, তাদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যারা ছাত্র-ছাত্রী তাদের ৭৫০ থেকে ১ হাজার ৩০০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা লেখা পড়া করতে

পারে। বরাবরের মতই সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন কিন্তু তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা।

অটিস্টিক শিশুকে যদি ঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তবে শিশুটি সমাজের অন্য শিশুদের মতো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে না পারলেও স্বাবলম্বী হতে পারবে। এখন প্রয়োজন অটিস্টিক শিশুদের জাতীয় মূলধারায় সম্পৃক্ত করা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভালোবাসা-সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সকলকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর তনয়া সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্বে অটিজম সচেতনতায় বাংলাদেশ রোল মডেল। এই ধারা অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

লেখক : সহকারী তথ্য অফিসার, পিআইডি।

# বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, ২০২২ (COP 27) নিয়ে প্রত্যাশা

## ড. মোঃ সাইফুর রহমান

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর ভয়ানক প্রভাব আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ আজ চরম বিপর্যয় ও হুমকির সম্মুখীন। ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (CRI) ২০২১, অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম, যদিও বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসারণে বাংলাদেশের অবদান নিতান্তই নগণ্য। জলবায়ুজনিত দুর্যোগ যেমন: তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, অসময়ে তীব্র বৃষ্টি, ঘন ঘন মৌসুমি ও আকস্মিক বন্যা, দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতা, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অণুপ্রবেশ প্রভৃতির ক্ষতিকর প্রভাব জনজীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা তথা সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত করছে।

জলবায়ুজনিত বিপর্যয় মোকাবেলায়, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সালে প্যারিস শহরে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে সমবেত হয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন চুক্তিতে সম্মত হন, যা "প্যারিস চুক্তি' নামে পরিচিত। এটি জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থাৎ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বন্ধ করা ও জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন, এবং জলবায়ুর বিপর্যয় মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য দেশগুলিকে অর্থায়ন প্রদান ইত্যাদি চুক্তিবদ্ধ বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। বিগত বিভিন্ন সম্মেলনে ঘোষিত চুক্তি, সিদ্ধান্ত এবং প্রতিশ্রুতির সমর্থন ও বাস্তবায়নে, এ বছরও, জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 27) মিশরের শারম আল-শেখ শহরে, ৬ থেকে ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সম্মেলনে অতীতের প্রতিশ্রুতিগুলির অর্থপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য দেন-দরবারের মাধ্যমে একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে মর্মে আশা করা যায়। আসন্ন COP 27-এর লক্ষ্য হলো: "ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, অভিযোজন বাড়ানো এবং ন্যায়ভিত্তিক পর্যাপ্ত অর্থ জোগানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার কাজকে ত্বরান্বিত করা। অভীষ্ট লক্ষ্য হলো পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আরব প্রজাতন্ত্র মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি COP 27 সম্বন্ধে বলেন, COP-27 অস্তিত্বের হুমকির বিরুদ্ধে ঐক্য প্রদর্শনের একটি সুযোগ যা আমরা কেবল সমন্বিত পদক্ষেপ এবং কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিক্রম করতে পারি।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আমরা ধারণা করতে পারি, বিশ্ব যখন একটি সংঘাতমূলক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বড়ো সংকট অতিক্রম করছে চলমান জলবায়ু সম্মেলন একটি বড়ো সাফল্য হতে পারে। কাজেই, চলমান দশকে আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা, সমন্বিত পদক্ষেপ এবং কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আশা করতে পারি। জলবায়ু সম্মেলন সম্বন্ধে এই আলোচনাটি বাংলাদেশসহ, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছ , বিশ্ব জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থনকে জোরালো করবে। । জলবায়ু প্রশমন বিষয়ে জরুরি হলো, শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বন্ধ করার জন্য একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নির্ধারণ করা এবং অতি দ্রুত তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, অর্থাৎ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান/প্রতিশ্রুতি যা সংক্ষেপে NDC নামে পরিচিত, এর পুনর্বিবেচনা এবং শক্তিশালীকরণ, কয়লা শক্তি পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা এবং অকার্যকর জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভর্তুকি দূর করা, মিথেনসহ অ-কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, এবং বন রক্ষায় ও ভূমি ক্ষয়রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ।

আসন্ন জলবায়ু সম্মেলনে অভিযোজন সম্পর্কে প্রত্যাশা হলো, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অভিযোজন সক্ষমতা জোরদার করা ও সহনশীলতা বাড়ানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো ইত্যাদি বিষয়ে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশের মতো বিপদাপন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে স্থানীয়ভাবে পরিচালিত, ইকোসিস্টেম ভিত্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক অভিযোজন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে আশা করা যায়। স্বল্পোন্নত দেশগুলির তাদের নিজ নিজ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এবং NDC-তে চিহ্নিত অগ্রাধিকারভুক্ত অভিযোজন কার্যক্রমের কার্যকর ও আশু বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা এবং সক্ষমতা প্রয়োজন যা অবিলম্বে প্রদানের জন্য উন্নত বিশ্বের নিকট জোর দাবি জানাবে।

অতি সম্প্রতি, বাংলাদেশ National Adaptation Plan (NAP) বা জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনায় চিহ্নিত ১১ টি জলবায়ু সংকটপূর্ণ এলাকায় ৮ টি খাতের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরসনে সর্বমোট ১১৩ টি মধ্যমেয়াদি (২০৪১) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০৫০) অভিযোজনের পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কাল ধরা হয়েছে ২৭ বছর (২০২৩-২০৫০) যা বাস্তবায়নকালে মোট ২০,০৩৭ বিলিয়ন টাকা অর্থাৎ প্রায় ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান অর্থের প্রয়োজন হবে। একটি উন্নত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রণীত আলোচ্য অভিযোজন পরিকল্পনা সরকারের মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন সম্পর্কিত নীতি উপকরণ যেমন: আর্থিক প্রয়োজনীয়তা, তথ্য ও জ্ঞান, বিধি ও ব্যবস্থাপনা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র ও চাহিদা নিরূপণ করেছে; যা অবশ্যই প্যারিস চুক্তির নীতির উপর ভিত্তি করে অধিক কার্বন নিঃসারণকারী উন্নত অর্থনীতির

দেশগুলি থেকে উপযুক্ত অর্থায়ন/প্রযুক্তি সংস্থানের জন্য উপযুক্ত নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া, অনুমান করা যায়, উন্নত দেশগুলি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং-সহ অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ প্রদানের জন্য একটি অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে দৃঢ়ভাবে কাজ করবে। অধিকন্তু, স্বল্পোন্নত দেশ এবং ছোটো দ্বীপের পক্ষগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি (লস অ্যান্ড ড্যামেজ) সম্পর্কিত ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে পূর্বের আলোচনার (যেমন: সান্টিয়াগো নেটওয়ার্ক, গাসগো) পূর্ণ বাস্তবায়নের জোর দাবি করবে।

বিপদাপন্ন উন্নয়নশীল/স্বল্পোন্নত দেশগুলি অনুমানযোগ্য, অধিগম্য এবং প্রয়োজন-ভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন, জ্ঞান হস্তান্তর, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য সক্ষমতা বাড়াতে শিল্পোন্নত দেশ থেকে ন্যায়ভিত্তিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে জোর দাবি জানাবে, যা প্যারিস চুক্তির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং বাংলাদেশের মতো দেশের জলবায়ু ঝুঁকি কমানোর জন্য খুবই জরুরি। এ বিষয়ে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র গাসগো, যুক্তরাজ্য (COP 26) সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন "সীমিত দায় এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথাপি, জলবায়ু অভিযোজন এবং প্রশমনে উন্নত দেশগুলোকেও তাদের প্রতিশ্রুত বাৎসরিক শত বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন সমভাবে (৫০:৫০) নিশ্চিত করতে হবে"। কাজেই, উন্নত দেশগুলির উচিত হবে প্রতিবছর প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার একটি সুনির্দিষ্ট বিতরণ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রদানপূর্বক স্বল্পোন্নত বিপদাপন্ন দেশগুলির আস্থা পুনরুদ্ধার করা।

স্বল্পোন্নত/উন্নয়নশীল দেশগুলি জিসিএফ, জিইএফ, এবং অভিযোজন তহবিল বোর্ডসহ বিভিন্ন বহুপাক্ষিক উৎস থেকে অতিরিক্ত অর্থায়নের দাবি করবে সংশ্লিষ্ট জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য, যা হবে সম্পূর্ণ অনুদানের ভিত্তিতে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে বিশেষ করে অভিযোজনে বাংলাদেশ স্থানীয়ভাবে যে দায়িত্ব পালন করে চলেছে তা অগ্রগণ্য ও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮ক অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে, নীতি ও পরিকল্পনা যেমন: জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা নাপা, ২০০৫; বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন নীতি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি),২০০৯; বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০; মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (এমসিপিপি) দশক, ২০৩০; জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০২১ -২০২৫; হালনাগাদকৃত জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮ ইত্যাদি দেশের জলবায়ু অভিযোজন প্রয়াসকে আরও সমৃদ্ধি করে জলবায়ু সহিষ্ণুতা অর্জনে অবদান রাখছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকার নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে এ পর্যন্ত ৮ শত টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪ শত ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশ এখন তার বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৬-৭ শতাংশ জলবায়ু অভিযোজনের জন্য ব্যয় করছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অগ্রগণ্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য গোবাল সেন্টার অন এডাপটেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যাবস্থাপনা, জলবায়ু উদ্বাস্তু জনগণের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন, জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো, উন্নত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও নগরের সহিষ্ণুতা, বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনীর উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। সুতরাং জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট তৎপর; এখন আমরা বিশেষত উন্নত বিশ্বের নিকট থেকে অধিক কার্বন নিঃসারণের জন্য ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশা করি যা ইতোমধ্যে অনেক প্রলম্বিত হয়েছে। জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় আমরা ইতোমধ্যে কতটুকু অর্জন করেছি এবং আরও কার কী করা দরকার তার পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। বড়ো দূষণকারী কোম্পানি এবং বেসরকারি খাতগুলির জলবায়ু কার্যকলাপে যথেষ্ট সম্পৃক্ততা এবং অর্থবহ অর্থায়নের পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়ে আসন্ন সংলাপে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সকল পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। আমরা অংশগ্রহণকারী বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে দেখতে চাই, সামঞ্জস্য নীতি, ক্ষমতার ভারসাম্য, আলোচনার একতান, অর্থপূর্ণ সহবস্থান, সম্মিলিত পরিকল্পনা সম্মিলিত সৃষ্টি, অভিপ্রায় বা ধারণার সংমিশ্রণ এবং সবিশেষ প্রতিশ্রুতি থেকে কার্যকর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অভীষ্ট উপকারভোগীর কাছে জলবায়ু প্রশমন ও অভিযোজনে উপযুক্ত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থ সময়মত পৌঁছে দেওয়া। আমাদের সময় অত্যন্ত সীমিত; আর নয় কোন শূন্য যোগ সমীকরণ, এখন দরকার পরিকল্পনা ও নীতির বাস্তবায়ন। আমরা চাই এই পৃথিবী নামক গ্রহ ও মানবতার কল্যাণ, একই সাথে শান্তি ও সমৃদ্ধি।

পরিশেষে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর অতি প্রাসঙ্গিক ভাবনা আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ ও অগ্রযাত্রার পাথেয়: "আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভর হওয়া, জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসই হবে আমাদের অগ্রযাত্রার দিশারী। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সহজতর করবে এবং সন্দেহাতীতভাবে তা জনদুর্ভোগ কমাতে সহায়ক হবে"।

লেখক: উপসচিব (পরিকল্পনা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

# ভিশন-২০৪১

## মোস্তফা মোর্শেদ

স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ পরপর দুইবার স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করার মাধ্যমে ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে চলছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ইতোমধ্যে ভিশন -২০৪১ ঘোষণা করেছে।

বিগত এক যুগেরও বেশি সময়ে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। যার সুফল দেশবাসী পাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হাত ধরে এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমান এগিয়ে চলছে। টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ায় মানুষের জীবন বদলে যাচ্ছে। ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নত হবার পর বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্প উন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নত হবার পথে রয়েছে। দেশের মানুষের গড় আয়ু, মাথাপিছু আয়, সাক্ষরতার হার, মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ ইত্যাদিতে লক্ষ্যণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার ২০৩১ এর মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০৪১ এর মধ্যে দারিদ্র্যকে ৩ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনে দেশকে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদায় পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

২০২২ সালের প্রথম দিকে শুরু হওয়া রাশিয়া - ইউক্রেনের মধ্যকার সংকট আমাদের দেশের জন্য অনাঙ্ক্ষিত সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ বৈশ্বিক সংকটে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের সরবরাহের সাথে সাথে মূল্যের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও সমস্যায় ফেলেছে। অতিমারির ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ আমাদের উন্নয়নের ধারাকে কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টি করেছে। সরকার ঘোষিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রধান দুইটি ভিশন হলো বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হবে, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে বর্তমান বাজারমূল্যে সাড়ে বারো হাজার মার্কিন ডলারের বেশি এবং তা ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হবে। এ লক্ষ্যে সরকার দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করে এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে

৩ মিলিয়ন অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে হলে বাংলাদেশকে চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৌসুমি বেকারত্ব রোধে ' কাজের জন্য খাদ্য' 'গ্রামীণ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসৃজন' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর আওতা সম্প্রসারণের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরবরাহের দিক থেকে দেশে নতুন শ্রমশক্তি প্রতিবছর ২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে, এটা জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১২.৩ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ শুরু করছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। বিভিন্ন রকম আর্থিক নগদ সহায়তা হস্তান্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুবিধাভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে জি টু পি পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে দরিদ্রতম ২৬২ টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্তকরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনাবাদি জমিতে ফসল চাষের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একটুকরোও জমি যাতে অনাবাদি না থাকে সে জন্য সবাইকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শহরের সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধা পর্যায়ক্রমে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি ও ফসলের জাত উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সরকার এ খাতে ভর্তুকি,প্রণোদনা ও পুনর্বাসনের সহায়তা দিচ্ছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে সরকার কৃষি যন্ত্রপাতি ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ হারে ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের প্রদান করছে। জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাছ,মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং অচিরেই দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাংসের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণীজ পণ্য রপ্তানি করে বৈদিক মুদ্রা অর্জন করছে।

সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার স্বাস্থ্যখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল জনসংখ্যা তৈরি করা। মা ও শিশুস্বাস্থ্যের

উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিশোর - কিশোরীদের সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র কিশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়ন, শিক্ষায় বৈষম্য দূরকরণসহ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য অবকাঠামো উন্নয়নসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সরকার অর্থনীতির ডিজিটালাইজেশনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে,কারণ ডিজিটালাইজেশন শুধু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং সুশাসনই নিশ্চিত করে না বরং উপকরণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। ডিজিটাল অর্থনীতিতে সকল ব্যবসায়িক কর্মকান্ড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প পাঁচটি ভাগে ভাগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো হলো সংযোগ এবং অবকাঠামো, ই- গভর্নমেন্ট,মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের প্রসার এবং আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ণ। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে কাজ করে যাচ্ছে। একটি ক্যাসবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

ভিশন ২০২১ এর অর্জিত সাফল্যের উপর ভিত্তি করে সরকার ভিশন ২০৪১ ঘোষণা করছে। ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিতকরণ,দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদের বিকাশ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি বৈষম্য দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।

লেখক : অর্থনীতিবিদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলায় ৬৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ময়মনসিংহ বিভাগ ও জেলার ৭৩টি সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ৩০টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

নির্মাণাধীন যমুনা রেলসেতু

পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে

পটুয়াখালী জেলার সড়ক

অ্যালেঙ্গা-রংপুর ১৯০ কি.মি. চারলেন প্রকল্প

মেট্রোরেলের যাত্রা শুরুর সংকেত দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ছুটে চলছে স্বপ্নের মেট্রোরেল

উদ্বোধনের অপেক্ষায় দৃষ্টিনন্দন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর করছে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরে (২৫ এপ্রিল ২০২৩)

পদ্মা রেল সেতুতে রেলের ট্রায়ালরান

নির্মাণাধীন ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক

নান্দনিক মহালছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়ক

উদ্বোধনের অপেক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

উদ্বোধনের অপেক্ষায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টর্মিনাল

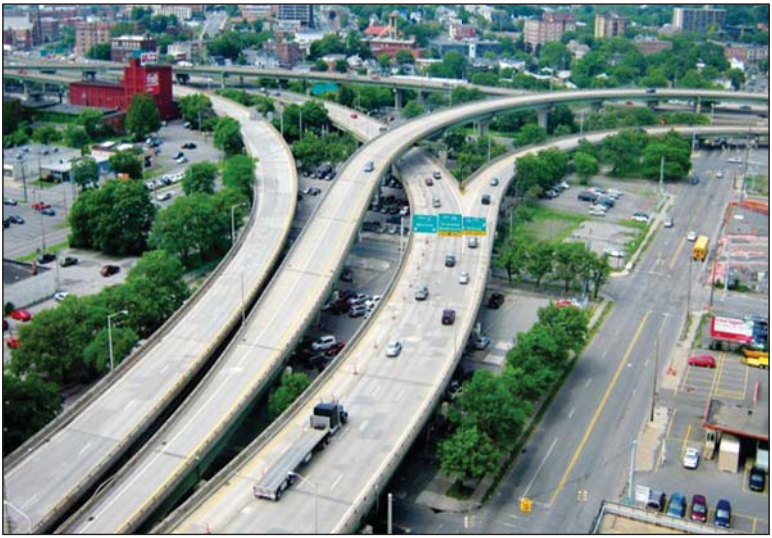

উদ্বোধনের অপেক্ষায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে